অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

পিশাচ কাহিনি

ভৌতিক হাত



পিশাচ কাহিনি
ভৌতিক হাত
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

এবারেও দুই ডজন ভৌতিক গল্পের ডালি সাজিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছেন অনীশ দাস অপু। মৌলিক পিশাচ কাহিনির ভক্তদের খুবই ভাল লাগবে 'ভৌতিক হাত'। আর অনুবাদ গল্পগুলোও যে পাঠকদের রোমাঞ্চিত করে তুলবে সে গ্যারাণ্টি স্বয়ং সম্পাদকের। তিনি বলছেন, 'আমি এ বইয়ের প্রায় প্রতিটি গল্প পড়েই চমকিত ও শিহরিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস, চমৎকার একটি পিশাচ কাহিনি সংকলন হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা পাবে "ভৌতিক হাত"।'
তবে বইয়ের ভাল-মন্দের শেষ বিচারটা আপনাদের হাতেই রইল, পাঠক!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

হরর কাহিনি

ভৌতিক হাত

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ভূমিকা

ভৌতিক হাত আমার সম্পাদিত নবম হরর সংকলন। এরকম সংকলন বের করার ব্যাপারে তেমন কোনও পূর্ব প্রস্তুতি আমার ছিল না। তবে গত বইটি (ভুতুড়ে দুর্গ) সম্পাদনার সময় বেশ কিছু পিশাচ কাহিনি পেয়ে যাই আমি। বেশিরভাগ মৌলিক এবং প্রায় সবগুলোই নবীনদের লেখা। গল্পগুলো পড়ে বেশ ভাল লাগল। চমকিত ও শিহরিত হলাম। অনুবাদগুলোও কম রোমাঞ্চকর নয়। বাছাই শেষে চূড়ান্ত নির্বাচনে টিকে গেল ২৪টি গল্প। আমার বিশ্বাস, চমৎকার একটি পিশাচ কাহিনি সংকলন হিসেবে পাঠকপ্রিয়তা পাবে 'ভৌতিক হাত'।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর একটি মাত্র হরর সংকলন করব। তবে সেটা কবে বেরুবে জানি না। এর আগেও ভেবেছিলাম এ ধরনের সংকলন করা থেকে বিরত থাকব। কিন্তু পাঠকদের অনুরোধে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছে আমাকে। তবে এবারে আর সিদ্ধান্তের নড়চড় করতে চাই না। কারণ একটি সিরিজের জনপ্রিয়তা এবং পাঠকপ্রিয়তা থাকতে থাকতেই বিদায় নেয়া ভাল। না, আমি আপনাদের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছি না। আমার নিজের লেখা হরর উপন্যাস এবং গল্প আপনারা নিয়মিতই পাবেন। কিন্তু দশ নম্বর হরর সংকলনের পরে এ ধরনের বই আর নয়। কারণ সংকলনের বইগুলো করতে গিয়ে বারবারই নিজের লেখা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তা ছাড়া ভাল গল্পও প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ওদিকে পাঠককুল আমার লেখা পড়ার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। জানতে চাইছেন কবে আমার হরর উপন্যাস পাবেন। পাঠক, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুন। এরপর

থেকে আমার লেখা হরর উপন্যাস ও হরর গল্পসংকলন নিয়মিত পেতে থাকবেন। 'ওয়েয়ার উলফ'-এর কাজ শেষ। বর্তমানে ওতে একটু ঘষামাজা চলছে। এরপরে পাবেন 'কিংবদন্তীর প্রেত'। তারপরে আসবে ভয়াল রাত...তবে সাবধান! আগামী প্রতিটি হরর উপন্যাসই কিন্তু আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে আসছে। কাজেই...

অনীশ দাস অপু

মুঠো ফোন ০১৭১২৬২৪৩৩৬

রাতের আঁধারে

এক

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। ঘাটিগঞ্জ বাজারে সবধরনের ব্যবসাই প্রায় মোটামুটি ভাল চললেও বাজারটিকে ছোটই বলা চলে। বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই গ্রামের হওয়ার কারণে এরকম সময়ের মধ্যেই বাজারে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। কেননা গ্রামের লোকজন সন্ধ্যার কিছু পরপরই যে যার বাড়ি চলে যায়। এ বাজারেই ভ্যান চালায় মুনসুর। তার গ্রাম অবশ্য ঘাটিগঞ্জ হতে এক কিলোমিটার দূরের জামতলী গ্রামে। প্রতিদিন সকাল সকাল উঠে ভ্যান নিয়ে বাজারে আসে আর সারাদিন ভ্যান চালিয়ে রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ শেষ ট্রিপ দিয়ে বাড়ি চলে যায়। অবশ্য যেদিন কামাই একটু কম হয় সেদিন একটু দেরি করেই ফেরে। রাতে তেমন ট্রিপ পাওয়া যায় না, তবে যা দু'একটা পায় তা থেকে ভাড়াটা অন্তত বেশিই আসে। কোন সময় দ্বিগুণ তিন গুণও হয় রাত বেশি হওয়ার কারণে। তাতে দিনের ঘাটতি কামাইটা কতকটা উসুল হয়। আজকেও মুনসুরের সারাদিনের কামাই একটু কমই হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই একটু রাত হলেও ভ্যান নিয়ে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে দিনের ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য। অবশ্য এরকম আরও দু'একটা ভ্যানওয়ালাও রাতে দেরি করে। কিন্তু আজ এদিকের স্ট্যান্ডে আর অন্য কোন ভ্যানওয়ালা নেই। থাকলেও হয়তো অন্য পাশের স্ট্যান্ডে আছে। তাই এ পাশে ও একা। এদিকে ভাড়া-টাড়া আসলে অবশ্য ওই পাবে যেহেতু আর কেউ নেই। কিন্তু ভাড়া কই। এতক্ষণ দেরি করেও তো

একটা লোকেরও দেখা নেই। দেরি করতে করতে একসময় ওর কিছুটা ঝিমুনি এসে গেল। কে। কিছুক্ষণ ধরে ঝিমুচ্ছে, হঠাৎ কানের কাছে বেজে উঠল 'আসসালামু আলাইকুম, ভাই।' মুনসুর আচমকা শব্দে ধড়মড় করে উঠে তাকিয়ে দেখল খুবই সুদর্শন এক লোক। পরনে সাদা শার্ট-প্যান্ট। জিজ্ঞেস করল 'শারইল যাবেন, ভাই?' মুনসুর একটু অবাকই হলো কারণ ভদ্রলোকই হোক আর চাষাই হোক ভ্যানওয়ালাকে কেউ কখনও আপনি বলে না। বলল, 'যাব, কিন্তু বিশ টাকা ভাড়া লাগবে।' ঘাটিগঞ্জ থেকে শারইল তিন কিলোমিটার। সে হিসেবে দিনের বেলা ছয় টাকা আর রাত হলে দশ টাকাই ভাড়া হয়। সেক্ষেত্রে বিশ টাকা ভাড়া অনেকটা বেশিই হয়ে যায়। কিন্তু মুনসুরকে অবাক করে দিয়ে লোকটা বলল, 'ঠিক আছে, ভাই, চলেন। আগে আমার সুটকেসটা ভ্যানে উঠান।' মুনসুর এতক্ষণ খেয়াল করেনি লোকটার সাথে একটা সুটকেসও আছে। মুনসুর ভ্যান থেকে নেমে এসে সুটকেসটা তুলে ভ্যানে রাখতে গিয়েই লক্ষ করল সুটকেসটা অনেক ভারি। ওটা ভর্তি কাপড়চোপড় থাকলেও অমন ভারি হবার কথা নয়। যাহোক, একজন ভ্যানওয়ালার অত ভেবে কী লাভ ভেবে সে সুটকেসটা উঠিয়ে দিয়ে আরোহীকে উঠতে বলে ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। প্যাডেলে চাপ দিতে যাবে এমন সময় লোকটি বলে উঠল, 'ভাই, একটা শর্ত আছে। শরাইল না পৌছা পর্যন্ত আপনি পিছনে তাকাতে পারবেন না। যদি রাজী থাকেন তা হলে আমি আপনাকে আরও বিশ টাকা বেশি দেব।' মুনসুরের প্রথমে একটু সন্দেহ জাগল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করল, সে গরীব মানুষ, অত চিন্তার কী দরকার। ভাড়াটা অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে এই-ই যথেষ্ট। এই ভেবে সে দ্রুত প্যাডেল চালাল। রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। ইতোমধ্যে মুনসুর ভ্যান নিয়ে ঘাটিগঞ্জ থেকে কিলোখানেক সরে এসেছে। আর ত্রিশ চল্লিশ গজ পরেই মোটামুটি বড়সড় একটি ব্রিজ, এটি এলাকায় বড় পুল নামে পরিচিত। মুনসুর ঢাল বেয়ে একটু টেনেটুনে ব্রিজের উপর উঠতেই ওর কানে একটা হালকা শব্দ এল। মনে হলো শব্দটা খুব কাছ থেকেই আসছে।

অনেকটা চপচপ করে খাওয়ার ও হাড় চিবানোর মত শব্দ। মুনসুর বারদুয়েক ডানে বামে তাকাল শব্দটার উৎস খুঁজতে। কিন্তু অন্ধকার রাতে ফাঁকা ব্রিজের কোথাও কিছু দেখতে পেল না।

কিন্তু ওর মনে হচ্ছে শব্দটা বেশ কাছ থেকেই আসছে। কোন কিছু না ভেবেই ঝট করে পিছন ফিরে তাকাল। কিন্তু ওর মনে ছিল না যে পিছনে তাকানো যাবে না। আর যেই না তাকাল অমনি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখল আরোহী যে সুটকেসটি নিয়ে এসেছিল সেটি খোলা, আর সে খোলামুখে পড়ে আছে একটি লাশ। আর লোকটি লাশটির গা থেকে মাংস, হাড় খুলে খুলে খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মুনসুর শুধু 'ও, মাগো' বলে একটা চিৎকার দিয়ে মূর্ছা গেল। ও অজ্ঞান হতে আরেকটু দেরি করলে আর অন্ধকারটা সামান্য একটু কম হলে ঠিকই দেখতে পেত আরোহীটা যে লাশ খাচ্ছে সেটি ওর বউয়ের লাশ।

দুই

আফজাল হোসেন। ছোটখাট ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী বলতে ডিমের ছোটখাট আড়তদার। প্রতিদিন সারাদিন ধরে ডিমওয়ালাদের কাছ থেকে ডিম নিয়ে বিকেল নাগাদ ঘাটিগঞ্জ বাজারে মহাজনের কাছে দিয়ে যায়। রোজকার মত আজকেও দুই ভ্যান ভর্তি ডিম নিয়ে মহাজনের আড়তে দিতে এসেছিল। ডিম দিয়েছে ঠিকই কিন্তু মহাজনের কাছে টাকা না থাকায় বাড়ি থেকে টাকা আনতে গেছিল মহাজন। বাড়ি থেকে টাকা এনে আফজাল হোসেনের হাতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত প্রায় দশটা ছুঁই ছুঁই। রাত দশটা বাজলেও তার টাকা ছাড়া ফেরার উপায় ছিল না, কারণ সকালে উঠে তো ডিমওয়ালারা তার কাছ থেকে টাকা নিয়েই তো ডিম কিনতে যাবে। মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আফজাল হোসেন সবে দুটি ভ্যানের একটি ভ্যানে

উঠতে যাবে তখন পিছন থেকে সেই সালাম, 'আসসালামুআলাইকুম, ভাই।' আফজাল হোসেন পিছনে ফিরে দেখে দুজন লোক। গায়ে সাদা শার্ট-প্যান্ট। দুজনের একই বেশ। আর একজনের হাতে একটা বড় সাইজের সুটকেস। আফজাল হোসেন আগে সালামের উত্তর দিল 'ওয়াআলাইকুম সালাম।'

'ভাই, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। শারইল যাব কিন্তু কোন ভ্যান পাচ্ছি না। আপনি তো বোধহয় শারইলের ওইদিকেই যাবেন। আমাদের যদি একটু শারইল নামিয়ে দেন তবে খুব উপকার হয়। অবশ্য আমরা আপনাকে উপযুক্ত ভাড়া দেব।'

আফজাল হোসেন দেখল আশেপাশে ভ্যানও নেই। তা ছাড়া দু'জন মানুষ এতরাতে বিপদে পড়েছে তার ভ্যানে নিলেই বা ক্ষতি কী। আর তা ছাড়া যদি ভাড়া হিসেবে উপরি দুটাকা পাওয়া যায় তাও ভাল। শুধু সংক্ষেপে বলল, 'ঠিক আছে, ওঠেন।'

আফজাল হোসেনের অনুমতি পেয়ে দুজনই সুটকেস নিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল। দুটো ভ্যান। সামনে একটা ভ্যান খালি যাচ্ছে আর পিছনে একটা ভ্যানে দুই আগন্তুক ও আফজাল হোসেন।

প্রথম দিকে পরস্পর কিছুটা সৌজন্য আলাপ করলেও পরে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি আর কিছুটা ঘুম ঘুম বোধ হওয়ায় চোখ বুজে মাথা হেলিয়ে ঝিমুতে লাগল আফজাল। ভ্যানগুলো বড়পুল নামের সেই ব্রিজের উপর উঠতেই আধা ঘুমন্ত আফজাল হোসেনের কানে ক্লিপ খোলার মত একটা শব্দ আসল। আফজাল হোসেন ঘুমঘুম চোখে, কতকটা সহজাত কৌতূহলের বশেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একজন আগন্তুক সুটকেসটা খুলছে। আরও একটু পর সুটকেসটা খোলা হয়ে গেলে তার ভিতর থেকে বড় পোটলার মত কী একটা জিনিস বের করে আনল। ভাল করে লক্ষ করতেই দেখল ওটা একটা মানুষের লাশ। লাশটা সুবিধামত জায়গায় রেখে একজন ওটার ডান ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিল।

যেকোন ব্যক্তি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে হয়তোবা হার্ট অ্যাটাক করে বসত। কিন্তু আফজাল হোসেন একটু কড়া ধাতুতে

গড়া। সে আড়চোখে চুপচাপ বসে থেকে দেখতে লাগল ওরা কী করে। এরপর আরেকজন আগন্তুকও ওতে ভাগ বসাল। দুজনে মিলে প্রথমে ঘাড়, তারপর হাত, পেট, ও উরুর মাংস কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। আফজাল হোসেন ভয়ে রীতিমত কাঁপছে। ওরা চোখেমুখে কামড় দেয়ার জন্য যখনই মাথাটা একটু উপরে তুলে ধরেছে তখনই লাশের মুখ দেখে আফজাল হোসেন আঁতকে উঠল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল লাশের মুখটা ওর ভাইয়ের। আফজাল হোসেন আর সহ্য করতে পারল না। 'ওমা' বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেল। তার হঠাৎ চিৎকারে ভ্যানচালক দুজনই থমকে গেল। তারা ভ্যান থামিয়ে পিছনে এসে দেখল আরোহী দু'জন উধাও, আর আফজাল হোসেন অচেতন অবস্থায় ভ্যানের উপর পড়ে আছে। ভ্যানচালক দুজন দ্রুত ভ্যান চালিয়ে আফজাল হোসেনকে বাড়ি নিয়ে আসল। সারারাত মাথায় পানি ঢালার পর সকালের দিকে তার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরে একটু ধাতস্থ হতেই বুঝতে পারল বাড়িতে শুধু তাকে নিয়েই নয় আরও একটা কিছু নিয়ে শোক আর গুঞ্জন চলছে। আসলে গুঞ্জনটা হলো ওর ভাই রাতে খুন হয়েছে। ঘাতকরা শুধু খুনই করেনি, শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে। ওর ভাই রাতে বৌকে নিয়ে ঘরের কবাটে খিল বন্ধ করে ঘুমিয়েছিল। সকালে ওর বউই প্রথম বীভৎস দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠে। আফজাল হোসেন ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠল। কাঁপা কাঁপা পায়ে ভাইয়ের লাশের কাছে গিয়ে কাফনের কাপড়টা তুলতেই দেখল, রাতে সেই পিশাচরা লাশের যে যে অংশ হতে মাংস কামড়ে খেয়েছিল ওর ভাইয়ের লাশেরও সেই সেই জায়গা থেকে মাংস খুবলে কামড়ে তুলে নেওয়ার চিহ্ন। এ দৃশ্য দেখে আফজাল হোসেন আর সহ্য করতে পারল না, আবার মূর্ছা গেল।

সি কে নাজমুল

খুনী কে?

জাফলঙ-এর সেই ঘাসঅলাই কুটি-কবিরাজের চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল। আরম্ভ এবং শেষটুকু বাদ দিলে চিঠির মূল কথা এই—সম্প্রতি আরেক মুসিবতে পতিত হইতে চলিয়াছি। জয়ন্তিয়া থানার ও.সি. ৩০২ ধারার খুনের মামলায় আমাকে ফাঁসাইয়া দিতে চাহিতেছেন। এক্ষণে আমি ফেরারী অবস্থায় পলাইয়া বেড়াইতেছি। থানায় সারেণ্ডার করিব কি না করিতে পারি নাই। ভাই তুলু, পত্রপাঠ জাফলঙস্থ আমার বাঙলোতে চলিয়া আস। আজ মঙ্গলবার, তারপরের দিন, অর্থাৎ, বুধবার নিশারাত্রতে ওয়াজিরের চায়ের স্টলের পিছনের চালা-ঘরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তখন বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থির হইবে। বিশেষ কী...'

আল্লাহই জানেন হতভাগা আবার কী কাণ্ড ঘটাতে চলেছে! তবে আমি স্থির নিশ্চিত, আরেকটি সেই 'অতীব বিচিত্র ঘটনা' অতি নিকটে। ইদানীং কুটি-কবিরাজের কথাবার্তায় অন্য একটি সুর পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুদূরের,—খুবই দূরের কী এক ডাক যেন শুনতে পেয়েছে ও। একদিন আমাকে বলল, 'তুলু, কোথাও চলে যেতে মন চাইছে, দূরে, বহুদূরে! তোমার কী হয় এরকম, এখন মাঝে মাঝে? যেন বহুদূরের এক অজানা দেশ থেকে কেউ ব্যাকুল স্বরে...'

আমি বললাম, 'কবিরাজ, তোমার কী হয়েছে?'

'এক নূতন আর অজানা অচেনা দেশ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কর্নেল। কিছুতেই তাড়াতে পারি না।' কুটি-কবিরাজ আনমনার মতন উত্তর দিল।

আমি বললাম, 'তোমাকে একটি প্রশ্ন করব কুটি, ভেবেচিন্তে

উত্তর দিয়ো।'

ও জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, 'সেই দেশ, যে দেশের ডাক তুমি শুনতে পাও, সেখান থেকে কি ফিরে আসা যায়?'

ও উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'পাগল! পাগল একটা! আমি তো মৃত্যুর কথা বলছি না। ইহলোকেরই একটি দেশ, ভীষণ শীত সে...' হঠাৎ চুপ করে গেছিল কুটি। তারপরই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমার ধন-ফকীর লেনের বাসা থেকে উঠে গেছিল জাফলঙ-এর শেষ বাসটা ধরার জন্যে। এরপর প্রায় দু'মাস ওর কোন খোঁজ-খবর পাইনি। বাইরে কোথায় নাকি গেছে—একা একা। বাইরে বলতে দেশের বাইরে না দেশের ভেতরে, সেটা বলতে পারেনি ওয়াসেক। শুধু বলেছিল কুটি-কবিরাজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে খুব তাড়াহুড়োর ভেতর সাইড-ব্যাগে কিছু কাপড়-চোপড় ভরে আর পার্স-এ হাজার দশেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কিছুই বলেনি।

চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি হতভাগা ফিরে এসেই আরেক হুজ্জতে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। শিশুমিয়াকে দিয়ে একটি ট্যাক্সি আনিয়ে তখুনি জাফলঙ-এ কুটি-কবিরাজের বাংলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। ষাটোর্ধ্ব একজন বৃদ্ধ প্রাণের ভয়ে কোথায় কোথায় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে! কুটির এই বিপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করি। 'রহমত-হত্যা'র বিষয়টি ফলাও করে পত্র-পত্রিকায় প্রচার হয়েছিল। ওই সময়ে জয়ন্তিয়া থানার ওসি কুটিকে চালান দিতে পারতেন। কিন্তু সে রকম কিছুই হয়নি। বরং তিনি পত্রিকাওলাদের হাত থেকেও কুটিকে আগলে রেখেছিলেন। আজ তা হলে কী কারণে তিনি কুটির সঙ্গে এরকম আচরণ করছেন!

আমার পা জ্বালা করতে লাগল কুটি-কবিরাজের ওপর। হতভাগাকে যদি এ মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যেত, উফ্! খাটাশ একটা!

সন্ধ্যার আগেই 'নির্জন'-এ পৌঁছে গেলাম। 'নির্জন' হচ্ছে কুটি-

কবিরাজের বাঙলোর নাম। শখ করে ও নিজ আবাসস্থলের নাম রেখেছে নির্জন। নির্জন মানে নাই জন। অর্থাৎ জনের অভাব। ওয়াসেক মিয়া তো মানুষই নয়, আর নিজেও নাকি এক বুড়ো ভল্লুক। কাজেই এমন এক বাঙলোবাড়ির নাম তার মতে 'নির্জন'ই যথার্থ। নির্জন-এ আমার নিজস্ব কামরা আছে একটা, এটাচ্ড্ বাথ। ঘরের বাইরে বেরুলেই উত্তর-পুবমুখী বারান্দা। ওখান থেকে একটু দূরে তাকালেই দেখা যায় ছায়া ছায়া কুয়াশা-ঘেরা অতিপ্রাকৃত খাসিয়াপাহাড় আকাশের দিকে উঠে গেছে, পুব আর উত্তরের আকাশকে আড়াল করে রেখেছে অসীম ক্ষমতাধর দানবের মত।

এই প্রথমবারের মত জাফলঙ-এ কুটির বাঙলোয় আমার উপস্থিতিতে কুটি-কবিরাজ অনুপস্থিত। বুকটা খচ্খচ্ করতে লাগল। ওয়াসেক মিয়া এসে বলল, 'চাচাজী, গোসল সারিয়া নেন, গরমাগরম পেঁয়াজি ভাজতেছি, আতপ-চাউলের ভাতের সাথে গরম পেঁয়াজি আর কাঁচা-মরিচ দিব, দুইটা ভাত খাইবেন। রাত্রতে আবার মুরগির ভুনা পাকাইতেছি, চিতল মাছের "কুর" দিয়া কোফ্তাও হইব, পেট ভরিয়া খাইবেন তখন।'

আমি দেখলাম মনিবের এ বিপদের দিনে এ হতভাগা মচ্ছব শুরু করে দিয়েছে, কিছুক্ষণ পর এসে বলল, 'যদি বলেন চাচাজী তা হলে দু'টা শিক-এ একটুখানি খাসির গোশতের শিক-কাবাবও করে দিতে পারি। দিব?'

প্রচণ্ড ধমক দিতে ইচ্ছে করছে হতভাগাকে, কিন্তু কিছুই বললাম না, শুধু শীতল চোখে তাকালাম তার মুখের দিকে। ওয়াসেক মিয়া চুপসে গিয়ে মাথা নিচু করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ব্যাগ থেকে তোয়ালে আর লুঙ্গি বের করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

দুই

একটা সস্‌প্যান-এ করে ক্ষীর নিয়ে এসেছে ওয়াসেক, মুরগির ভুনা আর আতপ চালের জাউভাত। কুটি-কবিরাজ আজকাল এ-ই খাচ্ছে। গলা দিয়ে নাকি নামে না, তাই নরম খাবারের মেনু। কলাবিড়ের ঝোপে, পাহাড়ের জংলা ঢালে, সেগুন বনের নিভৃতে–যেখানেই সুযোগ মেলে চারটে ভাত খেয়ে নেয় কুটি। ভাত ছাড়া তার চলেও না। ওয়াসেক মিয়া থাকে ধুরে ধুরে,* যদি সন্দেহ হয় যে পাশের ঝোপঝাড়ে, দূরের জঙ্গলে কুটি-কবিরাজ আছে, সাঁথে সাথেই ভাতের সস্‌প্যান আর ডেগ-ডেকচি নিয়ে দৌড়বে সে ওদিকে, মনিবকে দুটো ভাত খাইয়ে আসবে। এভাবে চলছে আজ বারোদিন।

আজ নিশারাত্রে ওয়াজিরের চায়ের স্টলের পেছনের চাল্যঘরে কুটির সাথে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু আমার তর সয়নি। নিশা-রাত্র আবার কী! সুযোগ যখন মিলেছে দিন-দুপুরেই তার সাথে সাক্ষাৎ করব।

বাঙলো থেকে মাইলটাক দূরে খাসিয়া পাহাড়ের নিরিবিলি ঢালে বিশাল এক সেগুনের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কুটি-কবিরাজের জন্য অপেক্ষা করছি। ওয়াসেকের হাতের ক্ষীর ঠাণ্ডা হতে চলেছে। এই জায়গাটার নাম দাওয়াঙ। নিরিবিলি এই পাহাড়ী এলাকায় লোকজনের বসত-বস্তি নেই বললেই চলে। তবু বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি ঘর-বাড়ি চোখে পড়ে, বহু দূরে দূরে। জঙ্গলে মানুষজন তো চোখেই পড়ছে না। ঘণ্টা খানেক আগে দু'জন খাসিয়া রমণী আমাদের সামনে দিয়ে 'লামা'য় নেমে গেছিল। ওয়াসেক তখন বলেছিল, 'চাচাজী, দেখলেন।'

আমি বলেছিলাম, 'কী রে, ব্যাটা?'

---

*ধুরে ধুরে–সুযোগ মত।

ও চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'কবিরাজ-চাচার কাণ্ড? খাসিয়া মেয়েমানুষ সাজিয়া আমাদের চোক্ষের সম্মুখ দিয়া উনি চলিয়া গেল, আপনে দেখলেন না? আ-শ্-চ-র্য!'

আমি কেমন হতভম্ব হয়ে গেলাম, বললাম, 'সত্য নাকি?' তারপরই ভুল ভাঙল, বললাম, 'হারামজাদা, লাগাব থাপ্পড়, জলজ্যান্ত মেয়ে-মানুষ দেখছি, খাসিয়া মেয়ে-মানুষ, বেঁটে খাটো, দাড়ি মোচ নাই! এদের মাঝে কেউ কুটি-কবিরাজ হয় কেমন করে, হেই!' তখন ওয়াসেক চুপ করে গেছিল। এর একটুক্ষণ পরই আবার ফিসফিসিয়ে উঠল, 'চাচাজী।'

'কী?'

'আপনের বায়ে নজর করিয়া দেখেন।'

আমি বাঁয়ে তাকালাম। কিছুই দেখলাম না। একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল ও, 'ভালা করি চায়া দেখেন চাচাজী, কিছু দেখা যায়? গাছগুলানের পিছাপিছি?'

বললাম, 'হুঁ, দেখা যায়। একটা ছোট ছেলে পাতা কুড়োচ্ছে। তো, কী হয়েছে?'

'ছুটো ছাইলা কী বলতেছেন চাচাজী!' ওয়াসেক প্রায় হাহাকার করে উঠল। বলল, 'আপনে চিনলেন না উনারে, ওই তো আমার কবিরাজ-চাচা, ভালা কইরা খেয়াল করি দেখেন, ছাইলা-মানষের ছদ্মবেশ নিছেন উনি!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে ছেলেটার দিকে তাকালাম।

ছোট্ট দশ বারো বছরের বালক, এত্তোটুকুন তার শরীর, কুটি-কবিরাজের বিশাল ধড় ওই শরীরের ভেতর জমা থাকবে কী করে!

বললাম, 'তুমি ভুল করছ ওয়াসেক, এ বালক কুটি-কবিরাজ হতে পারে না!'

ওয়াসেক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, 'জ্বী, উনি কবিরাজ-চাচা-ই, কোন ভুল নাই! কবিরাজ চাচা পারেন না এমন বিষয় দুনিয়াতে নাই।' তারপর ও গলার স্বর নিচু খাদে নামিয়ে ডাক দিল, 'চাচাজী, অ কবিরাজ চাচা–'

বালক পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আমি ওয়াসেক-এর মুখের দিকে তাকালাম, দেখি তার থুতনি কেমন ঝুলে পড়েছে, চোখে-মুখে অপ্রস্তুতের ভাব। ছেলেটা যখন রিনরিনে মিষ্টি স্বরে 'মামা, কুবলাই কুবলাই' বলে কাছে এসে দাঁড়াল, দেখা গেল এ এক বিশ-পঁচিশ কেজি ওজনের বাচ্চা খাসিয়া। আমি ঠাণ্ডা গলায় ওয়াসেককে বললাম, 'এখন ওয়াসেক মিয়া, প্রমাণ করো, এই বাচ্চা তোমার পঁচানব্বই কেজি ওজনের কবিরাজ-চাচা!'

ওয়াসেক চুপ। 'প্রমাণ করো!' প্রায় ধমকে উঠলাম। ওয়াসেক আমার পা চেপে ধরল, তারপর সে অবস্থাতেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'চাচাজী, মাফ করিয়া দেন, ভুল হইয়া গেছে।'

আমি বললাম, 'হারামজাদা বেকুব।'

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর উসখুস করে উঠল ওয়াসেক। বলল, 'বিষয়টা বুঝা যাইতেছে না, কই গেল কবিরাজ চাচা?'

আমি বললাম, 'তোমার খবরটা সঠিক ছিল তো, ভেবে দেখো?'

ওয়াসেক হাসল, বলল, 'পাক্কা খবর চাচাজী, উনি গত রাইত দাংরির এক গিরস্ত-বাড়িতে বিশ্রাম নিছেন। ভোরে উঠিয়া এই দাওয়াঙ-এ চলিয়া আসছেন। চলেন যাই, একটু ঘোরাঘুরি করিয়া দেখি, কোন গাছগাছালিতে চড়িয়া বসছেন কী না কে জানে–'

ওয়াসেকের কথায় প্রত্যেকটা ঝাপড়া গাছ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে এগোলাম।

পাহাড়ের ঢালে জংলী আলু হয়, লতানো গাছ। মাটির অনেক গভীরে চলে যায় তার শেকড়। সেই জংলী আলুর শেকড় তুলে আনতে হলে বিশাল গর্ত খুঁড়তে হয়। আলু তুলে নিয়ে যাবার পর গর্তটা 'বট' পড়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে গর্তে আস্তে আস্তে ঘাস জন্মায়, আগাছা জন্মায়। বসন্তের শুরুতে দু'একটি ঝড়-বাদলা শেষে পাহাড়ের ঢালু জমি ঝক্‌মক্‌ করে, নরম চারা ঘাসে কোমল হয়ে ওঠে চারদিক। পাহাড়ি ঢালানে যে সব মরা ঘাস লতাপাতা জমা হয়ে থাকে তা ঝড়-তুফানে আর বৃষ্টির জলে গড়াতে গড়াতে সেই 'বট' আলুগর্তে এসে ঠাঁই নেয়। কুটি-কবিরাজের খোঁজ মিলল এমনি এক

আলুগর্তের ভেতর। মরা ঘাস আর সেগুনের পাতায় গর্তটা নরম আর ওম্ ওম্ হয়ে ছিল। ও জোগাড়যন্তর করে ভল্লুকের চামড়ার গ্রেট কোটটা সেই গর্তে বিছিয়ে জুত হয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোনোর আগে বুদ্ধি করে বেশ খানিকটা শণ আর মরা ঘাস নিজের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে যায়। পুলিশকে সব সময়ই ভীষণ ভয় পায় হতভাগা। বাচ্চা ছেলেদের ধাত। ওরাও পুলিশকে বড় ভয় খায়।

চোখ-কান সজাগ রেখে আস্তে আস্তে হাঁটছি। ওয়াসেকের হাতে আর কাঁধে ডেগ-ডেকচির বোঝা। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পায়ের কাছে কেমন এক ফরফর আওয়াজ শুনে থমকে যাই। ওয়াসেককে বললাম, 'আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে খেয়াল কর তো।' ওয়াসেক তীক্ষ্ণ চোখে পায়ের কাছের গর্তটার দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বলল, 'চাচাজী, বুঝতে পারতেছেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কী?'

'আমাদের কবিরাজ-চাচা। আরামে ঘুমাইতেছেন!' আরেক গাল হেসে জানাল ওয়াসেক।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'কী যে বলিস, হতভাগা!'

ওয়াসেক বলল, 'সত্য চাচাজী, দেখবেন?'

'ও ডেগ আর ক্ষীরের সস্প্যান ঘাসের ওপর রেখে গর্তটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, তারপর সন্তর্পণে ঘাসপাতা সরাতে শুরু করল। ফর্ফর্ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটুক্ষণ পর "বাপ" বলে লাফ দিল ওয়াসেক—কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা উস্কোখুস্কো চুলের বিশাল এক মাথা উঁকি দিয়েছে সেই গর্ত থেকে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওয়াসেক ততক্ষণে সামলে নিয়েছে, নাচতে নাচতে বলছে, 'দেখলেন, দেখলেন চাচাজী, আমার কথা সত্য কী না—'

সেই জঙ্গুলে মাথা আর মুখ কুটি-কবিরাজেরই বটে। গর্ত থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল কুটি। গাঢ় গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'তুলু, এসে গেছ! বড় মুসিবতের ভিতর আছি, তুলু, বড়ই মুসিবত—'

তিন

'এক্ষণে তোমার জন্যে তিনটে পথ খোলা আছে, কবিরাজ। এক, পালিয়ে যাওয়া। এ মুল্লুক ছেড়ে বিদেশ বা কোথাও। দুই, থানায় সারেণ্ডার করা, চার্জশীট না দেয়া পর্যন্ত হাজতবাস, বেল-জামিন ইত্যাদি। তিন, প্রমাণ করা, যে, তুমি খুনী নও, এবং খুনীকে পাকড়াও করে দেয়া। তোমার জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই তিন নম্বরটি!'

নির্জন-এর ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে বসে কথা হচ্ছে কুটি-কবিরাজের সাথে। ঘণ্টাখানেক হলো আমরা দাওয়াং থেকে ফিরে এসেছি। কুটিকেও ধরে নিয়ে এসেছি। হতভাগা ভাগতে চাইছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলি তাকে, তারপর কোটের একটা কিনারা খামচে ধরে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছি। পথে আসতে আসতে অভয় দিয়েছি, 'ওসি ইমদাদ সাহেবের সাথে আমি নিজে কথা বলব। কোনরকম ক্ষতি যাতে না হয় সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেব।'

বাঙলোয় ফিরেই বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছিল কুটি। শেভ-টেভ-এর পর গোসল সেরে ঝরঝরে শরীরে একখানা সাদা-কালো চেক-এর ধোয়া নরম লুঙ্গি আর ভুসকির পাঞ্জাবী পড়ে পায়ে সাদা ছাগলের চামড়ার নরম চপ্পল লাগিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসেছে। আমি আগেই সেখানে বসেছিলাম। এ সময় ওয়াসেক মিয়া কুটির জন্য একটা বাটিতে করে কাঁচকলা আর পেঁপে-সেদ্ধ নিয়ে এল। জিনিসটার ওপর লবণ জিরা গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ধোঁয়া উড়ছে। দেখে আমারও খেতে ইচ্ছে করতে লাগল। ওয়াসেককে বললাম, 'আমার জন্যও এক বাটি নিয়ে আয়!' কিন্তু মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেললাম। এমন বদ জিনিস কুটি খায় কেমন করে!

দাওয়াঙ থেকে ফিরে আসার পথে কুটি-কবিরাজের মুখে যা শুনলাম তা এই–গত প্রায় তিন মাসে শোহানী আর ঝাউবাসায় দু'টি খুনের ঘটনা ঘটে গেছে। যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁরা দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ নিজ এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রথমে খুন হন বদরুল আলম চৌধুরী। ঝাউবাসার বাসিন্দা, সিলেট শহরে রড-সিমেন্টের দোকান আছে তাঁর, পাথরের ব্যবসা। মাস চারেক আগে গভীর রাতে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যান ভদ্রলোক। পৌষের শেষাশেষি শীতের ঘোর অমাবস্যার রাত সেদিন। ওইদিন দুপুরের দিকে কুটি-কবিরাজ জয়ন্তিয়া থানায় হাজির হয়ে ওসি ইমদাদকে বলেছিল, 'ওসি সাব, আপনার সিপাই-সান্ত্রীদের বলে দেন, যেন আজকের রাত্রটা একটু চোখ কান খোলা রেখে সবদিকে টহল দেয়। আজ রাত্রতে খুব একটা অমঙ্গলের আশা করছি আমি, এই এলাকায়!' ইমদাদ সাহেব কুটিকে বিশেষ খাতির করলেও তার ওইদিনের কথায় তেমন গুরুত্ব দেননি। পরদিনই শোনা গেল রাতে বদরুল আলম খুন হয়ে গেছেন। কে বা কারা গভীর রাতে বদরুল আলমের শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর গলা দুফাঁক করে রেখে গেছে। সেকেণ্ড অফিসারকে এফ.আই.আর. এর জন্য পাঠিয়ে ইমদাদুল হক নিজে তড়িঘড়ি কুটির বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুটিকে খুনের ব্যাপারে সবিশেষ অবগত করিয়ে বলেছিলেন, 'এবার বলেন কবিরাজ সাহেব, এ বিষয়ে আপনি কতটুকু জানেন?'

ও আসমান থেকে পড়ে বলেছিল, 'খুনের ব্যাপারে আমি কী জানব ওসি সাহেব, বড়ই অসম্ভবের কথা বললেন আপনি। আমি কালকে আপনাকে সাবধান করে দিতে গেছিলাম শুধুই একটা অনুমানের ওপর। শুধুই অনুমান।'

ওসি বলেছিলেন, 'সেই অনুমানটা কী, বলেন তো।'

কুটি মাথা হেলিয়ে অসহায়ের মত বলেছিল, 'কিছুই করতে পারছি না।'

ইমদাদ সাহেব শান্ত ভাবে আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কবিরাজ সাহেব, গতদিন আপনি বলেছিলেন, কী এক অমঙ্গলের

আশা করছেন। মানুষ অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, আর আপনি অমঙ্গলের "আশা" করলেন। এই "আশা"র গূঢ় অর্থ কী?'

কুটি আবারও অসহায়ের মত মাথা হেলিয়েছিল। ইমদাদ সাহেব তখন খেপে গিয়ে উঠে গেছিলেন সোফা ছেড়ে। যেতে যেতে বলেছিলেন, 'আপনার সাথে শিগগিরই আবার দেখা করতে আসব।'

তখনই কুটি অনুমান করেছিল বিপদ আসছে। সামনেই মহা মুসিবত। পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব করা যে উচিত হয়নি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। পরের মাসেই শোহানীর মনিরুল ইসলাম খুন হয়ে গেলেন। সেই একই কায়দায় খুন, গলা কেটে দ'ফাঁক করে রেখে গেছে খুনী। মনিরুল হক ছিলেন বদরুলের বাল্যবন্ধু, দু'জনে জয়ন্তিয়ার সরকারী পাইলট হাই স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছেন। এঁর খুন হওয়াটা আরও গোলমেলে। যে ঘরে মনিরুল ইসলাম খুন হন সেই ঘরে একটি মাত্র দরজা; এটাচ্ড্ বাথরুমেরও অন্য কোন দরজা নেই, শুধু শোবার ঘরের সাথে সংযোগ-রক্ষাকারী দরজা ছাড়া। সকাল দশটায় দরজা ভেঙে মনির সাহেবের রুমে ঢোকে পুলিশ। হত্যাকারী কোন্ পথে বেরিয়ে গেল ভেবে ওরা বেকুব বনে যায়। অথচ পরিষ্কার খুন এটা। আত্মহত্যার কোন আলামতই মিলছে না। ওইদিনই ইমদাদ সাহেব কুটি-কবিরাজের নামে হুলিয়া জারি করেন। বিষয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল কুটি, সাথে সাথে নির্জনের পেছনের দরজা দিয়ে পড়ে হাওয়া! দিন কতক গড়দুয়ার আর আগে-চলায় গা ঢাকা দিয়ে থেকে এই, মাত্র ক'দিন হয় জাফলঙ-এর কাছাকাছি একটা জায়গায় ফিরে এসেছিল। আমি কুটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম খুনের ব্যাপারে সে কতটুকু জানে। কুটি আমাকে বলল, শুধু অনুমান করতে পারছে সে, আসল খুনী কে। কিন্তু তার সন্দেহের কথা কাউকে বলতে পারছে না, কেউ যেন বাধা প্রদান করছে। যখনি সে তার সন্দেহের কথা কাউকে বলতে গেছে, আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করেছে কেউ যেন সে মুহূর্তে তার স্মৃতি-শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে। সব কিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে যায়। কিছুই মনে থাকে না! এই যেমন, এখন সে আমাকে খুনীর বিষয়ে

বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কিছুই সে বলতে পারছে না! একটুক্ষণ পর মাথা হেলিয়ে আবার বলেছিল কুটি, 'সময় হয় নাই, কর্নেল, সময়ে আবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তখন সবই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

কুটিকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, খুবই রহস্যময় এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে ও। আমি স্থির নিশ্চত এ সমস্যা ও খুব শিগগিরই কাটিয়ে উঠবে। এবং একই সাথে আমাদেরকে আরও 'অতীব বিচিত্র ঘটনা' প্রত্যক্ষ করানোর কৃতিত্ব লাভ করবে। আমি অনেকদিন পর আবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

পেঁপে আর কাঁচকলা-সেদ্ধ শেষ করে এক গ্লাস পানি খেল কুটি। তারপর পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'তোমাকে বলে রাখি তুলু, শীঘ্রই এই এলাকায় তিন নম্বর খুনের ঘটনা ঘটে যেতে চলেছে, খুবই নজ্‌দিক!' তারপর ওয়াসেককে ডেকে বলল, 'বাংলা সোলেমানী পঞ্জিকাটা নিয়ে আয়তো রে, বাবা!'

পঞ্জিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল ও। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আজ অমাবস্যা, তুলু! ঘোর বিপদ! আজ রাত্রেতেই হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হবে!'

আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে বললাম, 'কাকে হত্যা করা হবে, কবিরাজ? তুমি জানো, কে সে? হতাকারীই বা কে?

কুটি-কবিরাজ কোন কথা না বলে দূরের খাসিয়াপাহাড়ের দিকে তাকাল।

চার

কুটি-কবিরাজের কী হয়েছে!

রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছিল, সেই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনবার শুনল ও, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উদাস হাসি হেসে বলল,

'তুলু, এই গানটা একটু শুনবে তুমি?'

ও ডিস্কটা উল্টে দিয়ে প্লেয়ার চালু করে দিল। নতুন যুগের নতুন শিল্পী, সাগর সেন নাম। খেয়াল করে শুনি আশ্চর্য ভরাট কণ্ঠস্বরে গাইছেন–

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো
পথটি ছিল কুসুম কীর্ণ,
বসন্ত যে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ;
সেদিন খবর মিলল না যে
রইনু বসে ঘরের মাঝে
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ।

সুরের মূর্ছনায় ওর নিস্তব্ধ বাঙলো ভরে উঠেছে। বাইরে হু হু হাওয়ার দুপুর। নীল আকাশ থেকে শোনা গলে পড়ছে–আমি তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম, কুটি বলল, 'আজও তো তুলু, এ ধরায় বসন্ত কাল, চারদিকে কী এক উৎসবের সানাই বাজছে, অথচ আমাদের জীর্ণ জীবনে দেখতে দেখতে কত শুকনো পাতা জমা হয়ে গেল, তাই না?' ও উদাস হেসে জানালার দিকে তাকাল।

আমি ব্যাকুল স্বরে বললাম, 'কুটি, তুমি অমন করছ কেন! তুমি কি অন্য কিছু আঁচ করছ?'

কুটি ক্ষীণ হেসে আমার দিকে তাকাল। বলল, '"অন্য কিছু আঁচ করা" বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ, তুলু?'

'মৃত্যু! তোমার হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা উপস্থিত হয়েছে!'

ও হেসে বলল, 'স্বীকার করছি এ চিন্তা এখন অহরহ আমার করোটির ভিতর ঘুরপাক খায়। কিন্তু তুলু, আমি একই সাথে আরও একটি সম্ভাবনার বিষয়ে ইদানীং মাথা ঘামাচ্ছি।'

কুটির নতুন ধরনের এ কথায় আমি উৎকর্ণ হলাম।

এ কথা এখন বলে নেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, গত হপ্তা তিনেক

আগে এই এলাকায় আরজু শিকদার নামে আরেকজন ব্যবসায়ী খুন হয়ে গেছেন। সেই একই কায়দায় খুন। এঁকে নিয়ে খুনের সংখ্যা তিন-এ দাঁড়িয়েছে। যে রাতে আরজু শিকদার খুন হন, তার পরদিনই কুটিকে নিয়ে আমি জয়ন্তিয়া থানায় গিয়ে হাজির হই। ইমদাদ সাহেবের সাথে আগের দিন বিকালে আমার কথা হয়েছিল, সেই সুবাদে কুটি-কবিরাজের থানায় গমন। ইমদাদ ওসি কুটিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তাঁকে অভয় দিয়ে এসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতাও প্রার্থনা করেন। খুনের ব্যাপারে এতদিনেও কোন সুরাহা না হওয়ায় খুব নাকি বদনাম হয়ে গেছে তাদের। কুটি-কবিরাজের আগ্রহে ওইদিনই আবার মৃত আরজু শিকদারের বাসায় যেতে হয় আমাদের। ডেড-বডি ততক্ষণে পোস্ট মর্টেমের জন্য সিলেট শহরের মর্গে নিয়ে গেছে। খালি ঘরে বেশ অনেকক্ষণ আমরা ঘুরে কাটাই। আরজু শিকদার যে রুমে খুন হন সেই রুমটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কুটি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী দেখছ, কুটি?'

ও গম্ভীর-স্বরে জবাব দিয়েছিল, 'কাজের সময় কথা বলে বিরক্ত কোরো না, কর্নেল।' আমি চুপ করে গেছিলাম।

রুমের একটা মাত্র দরজা। লোহার শক্ত গ্রীল লাগানো দুটো জানালা আর এটাচড্ বাথ। এ রুমে দ্বিতীয় দরজা বা এমন কোন গোপন পথ নেই যে খুন করার পর প্রথম দরজা বন্ধ রেখে সেই গোপন পথ দিয়ে খুনী পালিয়ে যায়। অথচ বাস্তবে ঘটনা ঘটেছে তাই। খুন হওয়ার পর দেখা গেল মনিরুল ইসলামের মত আরজু শিকদারের বেড-রুমও ভেতর থেকে বন্ধ। খুনীর পালানোর কোনোই পথ খোলা নেই। তবু খুনী পালিয়েছে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

সেগুন কাঠের খাট, খাটের ওপরে পুরু জাজিমঅলা বিছানা। বেড-সাইড টেবিলে বেশ কিছু দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিন সযত্নে রক্ষিত। সবুজ রঙের পুরু কার্পেটে সারা মেঝে ঢাকা। পুব আর উত্তরের দেয়াল ঘেঁসে সোফা সেট। বেশ বড় একটা বুক শেল্ফ্। আরজু শিকদারের বই-এর কালেকশানটা ভালই ছিল।

দক্ষিণের কোণে ছোট্ট শো-কেস। কিছু দামি কিউরিও-র কালেকশান সেখানে। অতিরিক্ত কিছু খেলনা বন্দুক আর মেশিনগান, রাবারের সিংহ আর বাঘ, জাপানি ডল পুতুল, খেলনা ঘরবাড়ি। পশ্চিমের দেয়ালে র‍্যাংস্ কোম্পানীর ঢাউস ক্যালেন্ডার। বিপরীত দিকের দেয়ালে গোল টেবিল ঘড়ি। শো-কেসের ওপরে সাদা কাঁচের ফুলদানিতে একগুচ্ছ সিন্থেটিক গেলাপ, পাতাসহ। ঘুরে ঘুরে সারা ঘরটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল ও। দেখা শেষ করে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'চলো, তুলু, যাওয়া যাক।' তারপর ইমদাদ সাহেবকে বলেছিল, 'ওসি সাব, ভবিষ্যতে এই রুমটার প্রয়োজন পড়বে, এখানে যেন কেউ ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। রুমটা বরং আপনি "সিল্"ই করে দিন।' ওসি সাহেব সেমত ব্যবস্থা করেছিলেন।

আরজু শিকদারের ফ্যামিলি এখানে থাকেন না। তাঁরা থাকেন দেশের বাড়ি কুমিল্লায়। খুনের খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী আর একমাত্র ছেলে পরদিন ভোরেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুই বের করা যায়নি। চাকর-বাকরদেরও প্রচুর জেরা করা হয়েছে, দু'জনকে ধরে এনে হাজতে ঢোকানো হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। থানা কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই যে আঁধারে ছিল সেই আঁধারেই থেকে গেছে।

আরজু শিকদারের বাসা থেকে ফেরার পথে ইমদাদ সাহেব বলেছিলেন, 'কিছু বুঝতে পারছেন, কবিরাজ সাহেব?'

আমি ব্যথিত হচ্ছিলাম ইমদাদ ওসির কাণ্ডকারখানায়—অশিক্ষিত মুমূর্ষু রোগী শেষ চিকিৎসা হিসেবে জড়িবুটি, পীর-ফকিরের শরণাপন্ন হয়, ইমদাদ ওসির অবস্থাও এক্ষণে সেই রকম। কুটিকে কি উনি পীর মুর্শিদ ধরে বসেছেন?

কুটি বলেছিল, 'ওসি সাব নিশ্চিত জানবেন, আজ থেকে ঠিক সাতাশ দিন পর আগামী অমাবস্যা রাতের মধ্য প্রহরে এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হবে। কাজটা হবে খুবই বিপজ্জনক। অই রাত্রের জন্য আমার একজন সাহসী লোক দরকার।'

'লোক' বলতে কেমন লোক বোঝাতে চাইছে ও, জানতে চাইলেন ইমদাদ ওসি।

'শিক্ষিত, শক্তিশালী আর সাহসী লোক। পুলিশের কেউ হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। ইন্‌স্পেক্টর, বা সাব-ইনস্পেক্টর–এ রকমের। কাজটা কিন্তু বিপজ্জনক। অপারেশনের সময় খুন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।' ইমদাদ সাহেব বললেন, 'আমাকে নিলে চলবে?'

কুটি-কবিরাজ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে গভীর একটা শ্বাস ফেলে ইতস্তত করে বলেছিল, 'এ কাজের জন্য আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক!'

ইমদাদ ওসি কঠিন হাসি হেসে বলেছিলেন, 'কবিরাজ সাহেব, আমার তিন তিনটে আপনার জন্য খুন হয়ে গেল, তাদের খুনীকে ধরার জন্য জীবনের ঝুঁকি খানিকটা নেয় যায়। যায় না?'

বিড়বিড় করে কী বলল কুটি, বোঝা গেল না। আমার মনে হলো অস্ফুট স্বরে সে এ রকমের একটি বাক্য আওড়াল–'নিয়তি কেন বাধ্যতে।' প্রসঙ্গত বলে নিই, এই তিনজন খুন-হয়ে-যাওয়া ব্যক্তির সাথে ওসি ইমদাদুল হকের অনেকদিন ধরেই সখ্যতা ছিল।

রেকর্ড-প্লেয়ারে নতুন আরেকটি ডিস্ক চড়িয়ে দিয়ে কুটি-কবিরাজ বলল, 'তোমাকে এখন একটি জিনিস দেখাব, তুলু। দেখো তো কিছু অনুমান করতে পারো কি না।'

চেস্ট অভ ড্রয়ার খুলে হাতের মুঠোর ভেতর একটি ছোট্ট বস্তু উঠিয়ে নিল ও। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে আমার সামনে এসে মুঠোটা মেলে ধরল। তার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার শরীর কেমন শিরশির করে উঠল। ওখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সাইজে তারচেয়ে অন্তত পঁচিশগুণ বড় সেই একই জিনিস কিছুদিন আগে আরও কোথায় দেখেছি। কোথায়?

এক অমঙ্গলের ছায়া আমাকে তাড়া করতে লাগল। ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'কুটি, এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?'

পাঁচ

নির্জন। ২২ নভেম্বর, ১৯...

"ভোর রাত্রতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম হইতে জাগরিত হইলাম। স্বপ্নের বিষয়বস্তু বড়ই বিচিত্র! মাধো-সর্দার কে? আর ধাবুই বা কী?

কালো লম্বা আধ-বয়েসী এক হিল্‌হিলে লোক আমার নিকটবর্তী হইয়া হিস্‌ফিসে সুরে শুধু এরূপ একটি বাক্য উচ্চরণ করিল—'মাধো-সর্দার ধাবুতে আছেন।' আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, 'মাধো'-সর্দার কে? আর, সে ধাবুতে থাকিল তো কী হইল!'

এমত কথা শুনিয়া লোকটি তীব্র চোখে আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া অদৃশ্য হইল। আমি বড়ই তাজ্জব হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'বিষয়টা কী!'

নির্জন। ২৩ নভেম্বর, ১৯...

'আজ রাত্রতে কোনরূপ স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু ঘুমের ঘোরে একটি অস্পষ্ট স্বর শুনিতে পাইয়াছি। রহস্যময় সেই কণ্ঠস্বরটি কল্যকার রাত্রতে স্বপ্নে দেখা কালো লম্বা লোকটি বলিয়াই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। কণ্ঠস্বরের মালিক ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া উচ্চারণ করিল, "ডাক শুনিতে পাও না? তোমায় ডাকিতেছেন, শুনিতে পাও না? ঘুম ভাঙিয়া গেল।" '

ধাবু। ১ ডিসেম্বর, ১৯...

'ধাবু হইল হিমালয়ের উত্তরে নেপালের শেষ সীমানায় তিব্বতের গা ঘেঁসা ক্ষুদ্র একখানি গাঁও। গাঁয়ের উপান্তে পাহাড়ী ঢালে যে গুম্ফাটি অবস্থিত সেই গুম্ফার একজন লামা এক্ষণে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। অনিত্যজগৎ-সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটিয়া চলিয়াছে। অপ্রোদৃশ্যমান এক অপরিচিত অদেখা রহস্যময় পুরুষ জগতের একটি

কোণে বাসিয়া কী যে এক দর্জ্জেয় রহস্যের আবহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন তাহা আমাদের মত অতি নগণ্য মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করাও বাতুলতা। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য, যে, মাধো-সর্দারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

ছোটখাট এ মানুষটি গুম্ফার লামার সহায়তায় আঠারো মাস ধরিয়া অসীম ধৈর্য সহকারে এক অত্যাশ্চর্য্য তন্ত্র-সাধনায় নিমগ্ন। আজিকার নিশাবসানে সেই সাধনার শেষ লগ্ন উপস্থিত হইবে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার একজন অতিন্দ্রীয় যুক্ত পুরুষমানুষের দরকার হইবে। যোগ-গণনায় ধরা পড়িয়াছে পৃথিবীর একশত অতিন্দ্রীয়যুক্ত মানুষের মধ্যে আমিও একজন। এক্ষণে মাধো-সর্দারের দরকার হওয়ায় স্বপ্নযোগে শিষ্য দ্বারা বশীভূত করিয়া আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। নিজ ষৌড়শী কন্যাকে সিলেটের উত্তরাঞ্চলের তিনজন প্রভাবশালী লোক অত্যন্ত নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করায় মনোকষ্টে প্রায় উন্মাদ মাধো-সর্দার এক্ষণে তন্ত্রমতে ইহাদের শাস্তি বিধানে উদ্যত। আমি বলিয়াছিলাম, থানা পুলিশ ছিল, কোর্ট-কাছারি ছিল, আপনি কেন প্রচলিত আইনের আশ্রয় না নিয়া এই দুরূহ আর বেআইনী কাজে অবতীর্ণ হইলেন! জবাবে ম্লান হাস্যসহকারে মাধো-সর্দার যাহা বলিলেন তাহার নির্গলিতার্থ এই–জয়ন্তিয়া থানার ওসি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ নেন নাই। শহরের অপরাপর প্রভাবশালী লোকের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়াও কোনরূপ ফল লাভ না হওয়ায় তিনি তন্ত্রগুরুর সহায়তা চান। তন্ত্রগুরু তাহাকে ফিরাইয়া দেন নাই।'

কাঠমণ্ডু, নেপাল। ৪ ডিসেম্বর, ১৯..
যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি প্রতিশোধ গ্রহণে ইহার ভূমিকা কী? অসম্ভব এক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আমার গায়ের রোম খাড়া হইয়া উঠিতেছে! এই সম্ভাবনার কথা কাহাকেও বলা যাইবে না, কেহ বিশ্বাসও করিবে না! কিন্তু, যদি তাহাই হয়? উফ্!'

নির্জন। ১২ ডিসেম্বর, ১৯...
'ভাবিতেই শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। হাজার মাইল দূরে বসিয়া এমন নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের কথা কদাপি কেহ শুনিয়াছে? ধন্য মাধো-সর্দার! ঘটনা সংঘটিত হইবার দুই-তিন দিবস পূর্ব হইতেই আমার হৃদয়ে এক ধরনের অপরাধবোধ জাগরিত হইতে থাকে—ইহা কি উচিত হইতেছে? তিন-চারটি হত্যাকাণ্ডের সহিত আমারও ক্ষীণ যোগসূত্র থাকিয়া যাইবে! মাঝেমধ্যে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়াছি এই বলিয়া যে, ইহাই উচিত। পৃথিবীর বুকে এত বড় অধর্ম হইয়া গেল আর তাহার কোনরূপ বিচার প্রতিবিধান হইল না—মনুষ্য সমাজে বসবাস করিয়া এইরূপ অন্যায় অবিচার মানিয়া লওয়া যায় না। কন্যা-শোকগ্রস্থ মাধো-সর্দার যদি ইহার চাইতে আরও অধিক নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহেন এবং সেই ব্যাপারে আমার সহায়তা প্রত্যাশ্যা করেন, আমি তাঁহাকে সাহায্য করিব। বুকটা শুধু খচ্ খচ্ করিতে লাগিল এই বিষয়ে তুলুর সহিত কোনরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া।'

নির্জন। ১২ জানুয়ারি, ১৯...
'মনটা বিষাদিত হইয়া উঠিয়াছে। কী করি, এখন আমি কী করি! দৃষ্টির সম্মুখে এইরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে থাকিলে তো পাগল হইয়া যাইব! ধাবুতে চলিয়া যাইব কী? যদি সেখানে গিয়া মাধো-সর্দারকে বলিয়া-কহিয়া পরবর্তী হত্যাকাণ্ডগুলো রহিত করা যায়!...'

নির্জন। ১৭ জানুয়ারি, ১৯...
'ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আফলঙ ফিরিয়া আসিয়াছি। মাধো-সর্দার রাজি হইলেন না।...'

ডায়েরী ফিরিয়ে দিতে দিতে কুটি-কবিরাজের মুখের দিকে তাকালাম। দেখি তার কপালে অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠেছে। দূরের খাসিয়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৃদু স্বরে বলল,

'আর মাত্র এক হপ্তা, তুলু। আগামী অমাবস্যার রাত্রতে আততায়ীর শেষ হত্যাপ্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়ে হত্যাকারীকে হাতে নাতে ধরে ফেলতে পারব আশা করি। ওই রাত্রতে সাক্ষী হিসাবে পুলিশ-সুপার এবং ডিসি সাহেবকেও এখানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ঘড়েল সাক্ষী-সাবুদের অনুপস্থিতিতে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। থানার সেকেন্ড অফিসার আর ডিএসপি সাহেবও যাতে অপারেশনে থাকেন সে মত ব্যবস্থা দেখতে হবে।'

আমি দেখলাম কুটি-কবিরাজ ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান-প্রোগাম শানিয়ে নিতে পারছে। আগামী অবমাবস্যায় যে বিচিত্র কাণ্ড সংঘটিত হতে চলেছে তাতে চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হলে সবারই সমূহ বিপদ।

'গতকাল দুপুরবেলা কুটির হাতে এক অদ্ভুত জিনিস দেখে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই জিনিসটি সে কোথায় পেয়েছে। আমার প্রশ্নের উত্তরের ধার কাছ দিয়ে না গিয়ে কুটি ওই সময় একই প্রসঙ্গে এমন এক সম্ভাবনা কিংবা সন্দেহের কথা আমাকে শুনিয়েছিল যে আমি রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। কুটিকে বলেছিলাম, 'তোমার সংস্পর্শে এসে কুটি আমার অনতিদীর্ঘ জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না প্রত্যক্ষ করেছি। ওইসব ঘটনা প্রতিটিরই একেকটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়, কিন্তু আজ যে সম্ভাবনার বিষয়টি বললে এর কোন সার্থক ব্যাখ্যাই তো খুঁজে পাচ্ছি না! আমি এখনও তোমার ঘোর লাগানো কথায় একটা ঘোরের ভেতর আছি। এ অসম্ভব। অসম্ভব–'

কুটি তখন নিশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তার বেড-সাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিয়ে একখানা ডায়েরী আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। দিয়ে বলেছিল, 'আমি চাই, তুলু, তুমি এ ডায়েরীর মাঝামাঝি ক'খানা পাতা পড়বে। পড়ে আমাকে বলো, এ'রূপ এক সন্দেহ কী এতই অমূলক।'

ছয়

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে গতরাত একটা পঁয়ত্রিশে আমাদের উপস্থিতিতে আমাদেরই চোখের সামনে ওসি ইমদাদুল হক সাহেব খুন হয়ে গেছেন, আর, এই খুনের মধ্য দিয়ে, বলা যায়, আগের তিনটি খুনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু হত্যা রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পরও সবকিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ফলাফল বিরাট এক 'প্রশ্নবোধক চিহ্ন' ছাড়া কিছু নয়। বিস্ময়কর এসব হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর ডিসি আশরাফ আলী আর এস.পি. রশীদ খন্দকারের অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত দু'জনেরই ঘোরের ভাব কাটেনি। শেষে যখন বাক-স্ফূরণ হলো,–ডিসি আশরাফ আলী শুধু এটুকু বাক্য উচ্চারণ করে চুপ করে গেছিলেন, 'খন্দকার সাব, অসম্ভবেরও তো একটা সীমা আছে–'

বিষাদ ক্লিষ্ট মন নিয়ে লিখতে বসেছি। গুছিয়ে লেখার মত মন-মানসিকতা নেই, তবু লিখতে হচ্ছে। রোমাঞ্চ এবং বিষাদের যুগপৎ উপস্থিত পূর্বে এভাবে আমার মনকে আর নাড়া দেয়নি। ইমদাদ সাহেবের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই বুকের ভেতর কেমন খাঁ খাঁ করে উঠছে। সবচেয়ে বেশি মুষড়ে পড়েছে কুটি-কবিরাজ।

গতকাল রাত দশটার দিকে যখন কুটি-কবিরাজ আর আমি নির্জন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি সে সময় ওয়াসেক মিয়া বলে উঠেছিল, 'চাচাজী, আইজকার এই আমাবইস্যার রাত্রতে বাইরে না বারানোই মঙ্গল। চেষ্টা করিয়া দেখেন যদি না বারান যায়।'

কুটি-কবিরাজ থম্‌থমে গলায় বলে উঠেছিল, 'হতভাগা, কু-সিদ্ধি লাগিয়ে দিলি তো, ওউফ! তুলু, এ হতভাগাকে নিয়ে তো দেখছি আর পারা গেল না–'

আমি কুটিকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম, 'তোমার যত কুসংস্কার

কবিরাজ, বাইরে যেতে মানা করছে, সে কি তোমার অমঙ্গলের জন্য?'

কুটি—'ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাও আহু আরহামার রাহিমিন' বলে ঘরের বইরে পা রেখেছিল। তার পেছনে আমিও।

জয়ন্তিয়া থানায় পৌছে দেখি ডিসি আশরাফ আলী এবং এসপি রশীদ খন্দকার আগেই এসে পৌছে গেছেন। ইমদাদ ওসি শশব্যস্ত হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর আমাদের সবাইকে করণীয় বিষয়াদি বুঝিয়ে দিল কুটি-কবিরাজ। হতভাগার চিন্তা-ভাবনা এক্ষণে একজন ঝানু গোয়েন্দার চিন্তাভাবনাকেও টেক্কা দিচ্ছে দেখা গেল।

মৃত আরজু শিকদারের বিছানায় শোবার তালিম দেয়ার সময় কুটি-কবিরাজ ওসি ইমদাদ সাহেবকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে, 'ওসি সাহেব, এ আপনার জীবন মরণের প্রশ্ন, এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমানো চলবে না, একটু ঢুলুনি বা তন্দ্রার ভাব এলেও সর্বনাশ হয়ে যাবে। মনে সাহস রাখবেন, বিপদে সাহস হারালেই সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আরেকটা কথা, কোন ব্যাপারেই অবাক হবেন না। অবাক হওয়ার সুযোগটাও হত্যাকারী নিতে পারে।'

রশীদ খন্দকার তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অবাক হওয়া মানে কী কবিরাজ সাহেব?'

কুটি দুর্বোধ্য হাসি হেসে বলেছিল, 'সময়ে সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে এসপি সাহেব, আর মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের তো ব্যাপার।'

নিহত আরজু শিকদারের বাস ভবনে পৌছানোর পরই কুটির পূর্ব নির্দেশ মত আমি আর আশরাফ আলী সাহেব শিকদারের বেডরুমের বাইরের দিকের একটি জানালার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জানালার ঘষা কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও কম। এরই মধ্যে মশার কামড় শুরু হয়ে গেছে। কুটি-কবিরাজ আর রশীদ খন্দকার অন্য একটি জানালার কাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছেন, জানালার পাল্লাদুটো একটু ফাঁক করা। ঘরের ভেতরটা এখনও অন্ধকার। আরজু শিকদারের বেডরুমে ঢোকার পর ইমদাদ সাহেব হালকা পাওয়ারের একটি বালব জ্বালিয়ে দেবেন,

কুটি-কবিরাজ সে মতই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। রুম অন্ধকার। তার মানে, এখনও ইমদাদ সহেব ভেতরে ঢোকেননি। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটুক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠল। আমাদের জানালার ঘষা কাঁচগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি আস্তে আস্তে জানালার একটি পাল্লা একটু ফাঁক করে ফেললাম। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি ইমদাদ সাহেব সেই প্যান্ট, শার্ট পরা অবস্থাতেই আরজু শিকদারের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। হাতে একখানা ইংরাজি ম্যাগাজিন। রাত্রি তখন সোয়া বারো।

আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা শুরু হয় এর পর থেকেই। প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর আমরা ঘড়ি দেখতে থাকি। সময় যেন ফুরাতে চায় না। চারদিক অস্বাভাবিক সুন্‌সান্‌, নিঝঝুম। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু আরজু শিকদারের রুমের ভেতর থেকে ওয়ালঘড়ির ক্ষীণ টিক্‌টিক্‌ শব্দ ভেসে আসে। নিস্তব্ধ ঘরবাড়ি, মূক-বোবা গাছগাছালি আর নিকষ কালো আসমানে অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজি—সবই এক ভয়াবহ অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে আছে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে, টের পাই, অসংখ্য অপ্রাকৃত পিঁপড়া ক্ষীণ, ধীর লয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, আবার নীচে নামতে থাকে। নিদারুণ আতঙ্কে আমি ঘামতে থাকি, অথচ আশ্চর্য, কোথাও কিছুই হয়নি! ওই তো, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওসি ইমদাদ সাহেব ম্যাগাজিন পড়ছেন, মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, তারপরই তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের আশপাশে দরজা জানালার দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। ইমদাদ সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করে আছেন।

আমাদের জানালা থেকে হাত দশেক দূরে দ্বিতীয় জানালার কাছে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছেন এসপি রশীদ খন্দকার, তাঁর পেছনে কুটি-কবিরাজ। কোথাও কোন ভয়ের আলামত নেই। সবই ঠিক আছে। তবু, ক্ষীণ, খুবই ক্ষীণ, অনতিস্পষ্ট এক অনুভূতি আমাকে জানান দিতে থাকে বিপদ আসছে, ভয়ানক বিপদ—

সময় বয়ে যায়। জানালার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে আমরা বেড-রুমের ভেতরের পানে তাকিয়ে থাকি। ওসি ইমদাদ সাহেব কেমন উস্‌খুস্‌ করতে থাকেন।

মৃদু টক্ টক্ শব্দ হলো কোথাও। ইমদাদ সাহেব বিছানায় মড়ার মত স্থির হয়ে গিয়ে কোন কিছুর অপেক্ষা করতে থাকেন। বাইরে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়, শব্দটা আসছে–শো-কেস-এর ভেতর থেকে।

আমাদের পা যেন কেউ মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে, গলা দিয়ে একটুও আাওয়াজ বেরচ্ছে না। বিস্ফারিত চোখের সামনে শো-কেস-এর পাল্লাদুটো খুলে গেল, আর ওই শো-কেস-এর দ্বিতীয় তাক থেকে টলমল পায়ে লাফ দিয়ে নীচে নেমে এল ফুটখানেক লম্বা এক জাপানী ডলপুতুল। নিস্পাপ ছলছল চোখে এদিক-ওদিক তাকাল।

এ পুতুলটিকে কিছুদিন আগেই আমরা এ শো-কেস-এর ভেতর দেখে গেছি। হঠাৎ আমার আরেকটি কথা মনে পড়ে যায়, কুটি-কবিরাজের হাতে এই পুতুলেরই একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখেছিলাম, নির্জনে, কুটির বাঙলোয়। মাধো-সর্দার তাকে উপহার দিয়েছিলেন পুতুলটি। কী অদ্ভুত যোগাযোগ!

খানিক দ্বিধা, কী করবে বুঝতে পারছে না–এরকম মুখের ভাব, পরক্ষণে ইমদাদ সাহেবের দিকে তাকাল পুতুল। স্পষ্ট দেখলাম, তার ছলছল চোখে হঠাৎ ফুটে উঠল অপরিসীম ঘৃণা। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল ওসি-সাহেবের দিকে।

'বিপদ াসছে, ইমদাদ সাহেব, বিপদ! সাবধান!'–আমি ফিসফিসিয়ে ওসি সাহেবকে সাবধান করে দিতে চাইলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর বেরল না। পা অবশ। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। পরে জেনেছিলাম, সেই একই অবস্থা হয়েছিল আশরাফ সাহেব আর কুটি-কবিরাজেরও। কুটি পরে বলেছিল, পুতুলটি মিনিট পাঁচেকের জন্য আমাদের সবাইকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। আমাদের কিছুই করার ছিল না তখন।

আশ্চর্য মায়াময় জাপানী ডল-পুতুলটির দিকে ইমদাদ ও.সি. অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন, তাঁর গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরচ্ছে না, হাত-পা নিথর। সেই চরম মুহূর্তেও আমার মাথায় এক অস্বাভাবিক চিন্তার উদয় হলো–এক্ষণে ইমদাদ ওসি কী ভাবছেন? মাধো-সর্দারের ষোড়শী কন্যার সাথে এই পুতুলের চেহারায় কোন মিল আছে? একদা

তিনি মাধো-সর্দারের কন্যার হত্যাকারীদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, তবু শেষ রক্ষা হয়নি, সেই হত্যাকরীদের কেউ আজ বেঁচে নেই। এবার এমদাদ সাহেবের পালা। তা হলে আজ,–আজই কি সেই দিন!

একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়, হঠাৎ কানে ভেসে এল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! আমাদের রুদ্ধবাক আতঙ্কিত চোখের সামনে দেখতে পেলাম ধবধবে সাদা বিছানায় এক্ষণে টকটকে লাল রঙের রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে, ইমদাদুল হক মুমূর্ষু অবস্থায় সেই রক্তাক্ত বিছানায় ছটফট করছেন। তাঁর গলার বামদিকে ইঞ্চিচারেক লম্বা গভীর ক্ষত থেকে কলকলিয়ে রক্ত ছুটছে।

জাপানী ঘাতক-পুতুলটি একটুক্ষণ আগে বেডসাইড টেবিলে লাফিয়ে উঠে তার মাথার খোঁপা থেকে একগাছি সূক্ষ্ম ধারাল চুল ছিঁড়ে নিয়েই সম্মোহিত ইমদাদ সাহেবের গলায় সেই চুলের এক অমোঘ, অনিবার্য, এবং, সুতীব্র পোঁচ চালিয়ে দিয়েছে। নিমেষেই ওসি সাহেবের গলা দু'ফাঁক হয়ে গেছে!

কী ঘটল কিছু বোঝার আগেই মিষ্টি সেই পুতুল গুটি গুটি পায়ে হেঁটে শো-কেস-এর তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে ফিরে গেছে।

সংবিৎ ফিরতে ফিরতেই আমরা দৌড়ালাম আজরু শিকদারের বেড-রূমের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। রক্তাক্ত বিছানায় চুপ্চাপ শুয়ে আছেন ইমদাদ সাহেব, তাঁর বিস্ময়মাখা চোখ দু'টি অর্ধেক খোলা, নিষ্পলক।

বোধের অতীত কী এক বুক হু-হু করা শূন্যতায় আমাদের চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে!

ডিসি আশরাফ আলী শো-কেস-এর পাল্লা দু'টি আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে পুতুলটিকে নিয়ে বাল্বের আলোয় উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। আমরাও তাকালাম। মায়াবী চোখ আর মিষ্টি চেহারার এই জপানী পুতুলের মধ্যে কোনই দুর্বোধ্যতা নেই। প্লাস্টিক আর রাবারে তৈরি নেহায়েত সাধারণ এক পুতুল!

কুটি-কবিরাজ অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, 'ইয়া কাহ্‌হারু!'

আবদুল হাই মিনার

ওপারের মেয়ে

মেয়েটি পরপর তিনদিন এল বাংলোয়। মিষ্টি চেহারা। মাথা ভর্তি রেশমের মত চুল। বয়স দশ এগারো হবে। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বলেই মনে হয়। মেয়েটিকে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছে আমারও। নতুন বদলী হয়ে আসায় এদিকের কিছুই চিনি না। আমার স্বামী সরকারী চাকরি করে। ফলে নতুন নতুন জায়গায় আমাদের ঘুরতে হয়। নতুন কোথাও গেলে আশেপাশের লোকজনের উৎপাতটা নীরবেই হজম করতে হয়। বদলীর খবর শুনে চমকে উঠেছিলাম। আর জায়গার নাম শুনে তো ভিরমি খাবার যোগাড়। ধবলপুর! এ নামে যে কোন এলাকা আছে জানা ছিল না। নাম শুনে নাক সিটকেছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পর দুঃখ কিছুটা হলেও কমেছে। এখানকার প্রকৃতি অসম্ভব সুন্দর। এদেশে জাফলং ছাড়া এত সুন্দর জায়গা আছে, এখানে না এলে কোনদিনই জানা হত না। তিন রুমের ছোট্ট বাংলো। ওপরের তলায় দুটো রুম। বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে অবারিত সবুজের সমারোহ। তারপরেই একটি নদী এঁকেবেঁকে গেছে বহুদূর। আগস্টের এই উষ্ণ দিনেও ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বুকে কাঁপন ধরায়। বাংলোর লনে ফুটে রয়েছে জানা-অজানা অসংখ্য ফুল। ওখানে সারাদিনই প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়।

বাংলোটা অনেক পুরানো। রঙ আর বার্নিশ দিয়ে তার বার্ধক্য ঢেকে রাখা হয়েছে। এলাকাটা সৌন্দর্যের লীলাভূমি হলেও শহর থেকে অনেক দূরে। এখানে লোকজনের আনাগোনা খুব কম। অন্য কেউ হলে দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু আমি একা থাকতেই পছন্দ করি। শুধু রাতে কেমন ভয় ভয় করে। গতরাতে বুবুর কাছে চিঠি লিখেছি গল্পের বই চেয়ে। তাড়াহুড়ো করে আসায় আমার শখের জিনিসগুলোই

আনা হয়নি। চিঠিটা পোস্ট করা হয়নি এখনও। আমার স্বামী গত সপ্তাহে শহরে গেছে গাড়ি নিয়ে। এখনও ফেরেনি। এখানে এই গাড়িটাই হচ্ছে আমাদের শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এখন পর্যন্ত অন্য কোন ব্যবস্থা নজরে পড়েনি। এমনকী নদীতে একটা নৌকোও নয়। কী জানি, এখানকার মানুষ হয়তো পায়ে হেঁটেই শহরে যায়। বাংলোয় এখন আমি, আমার মেয়ে মিতুল আর কাজের মেয়ে। বাংলোর পেছনে একটি শান বাঁধানো পুকুর। পুকুরের ধারে দুটো ছাপড়া নিয়ে থাকে বাংলোর কেয়ার-টেকার। তা যে কেয়ার সে নিচ্ছে তা বলার নয়। বাংলোর রুমগুলোকে বাসোপযোগী করতে পুরো দু'দিন লেগেছে আমার।

প্রথমদিকে মিতুলের কথা ভেবে একুট নিরাশ হয়েছিলাম। আমার মত হয়নি ও। হয়েছে ওর বাবার মত। গতমাসেই সাতে পা দিল। এত চঞ্চল! একটুও শান্ত থাকতে পারে না। তাই ভাবছিলাম মেয়েটা না আবার নিঃসঙ্গ বোধ করে। কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই। আজ বিকেলেও সেই মেয়েটা এসে মিতুলের সঙ্গে অনেকক্ষণ খেলেছে। মেয়েটি প্রথম আসে গত পরশু। ওর দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। একটি ফুটফুটে চেহারার মেয়ে সারা লনময় ছুটোছুটি করছে। সঙ্গে আমার মেয়ে। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। এই সুযোগে মেয়েটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে খেলতে বেরিয়েছে। আমাকে দেখে মেয়েটি থমকে গেল, আর মিতুল ধরা পড়ে হাসতে লাগল। আমিও হেসে ফেললাম। আমার এই এক দোষ। মেয়েকে হাসতে দেখলে শত রাগের মাঝেও হাসি চেপে রাখতে পারি না। লনে রাখা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। মেয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা, জানো, এই মেয়েটা না আমার বন্ধু।'

মেয়েটিকে কাছে ডাকলাম। ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। পাশে রাখা বেতের চেয়ারে তাকে বসতে বললাম। মেয়েটি দাঁড়িয়েই রইল। খেয়াল করলাম তার চোখের মণি কটা কটা। ফর্সা গায়ে সবুজ ফ্রকে তাকে একদম পরীর মত লাগছে। শুধু ডানার অভাব। গলায় ঝুলছে একটি চেন, তাতে 'এ' অক্ষরের লকেট। মেয়েটির ওপর আমার রাগ

হলো। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনও বাইরে কেন? অন্ধকারে ফিরবে কেমন করে? তাই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'ওপারে,' শান্ত জবাব মেয়েটির।

'নদীর ওপারে! সে তো অনেক দূর। তাও আবার নদী পেরোতে হবে। তুমি একাকী যাবে কী করে?'

'সাঁকো আছে।' মেয়েটি আমার দিকে তাকায়। অমনি চমকে উঠি। তার চোখে কি কিছু দেখলাম? গা ছমছম করে ওঠে। সেটা এই পরিবেশের কল্যাণেও হতে পারে। মেয়েটি চলে যাচ্ছে দেখে ডাক দিই, 'একটু দাঁড়াও, সাথে লোক আর আলো দিই, যেতে যেতে সূর্য ডুবে যাবে।'

'লাগবে না,' অস্ফুটে বলে মেয়েটি চলে যায়।

মেয়েটিকে দেখে প্রথম দিন ভয় পেয়েছিলাম—ভাবতেই এখন হাসি পায়। তবে আশ্চর্য লাগে মেয়েটির নাম এখনও জানি না। অথচ সে তিনদিন এখানে এসেছে। সে এলেই কিছু জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই। কাল শুনি অদ্ভুত সুরে মেয়েটি গান গাইছে আর মিতুলের দোলনায় দোল দিচ্ছে। কাছে গিয়ে বললাম, 'তুমি এ গান কোথায় শিখেছ?'

'ওপারে।'

'ওপারটা খুব সুন্দর, না?' মনে মনে ঠিক করলাম আর দেরি নয়। ও ফিরলেই ওপারে যাব।

'হ্যাঁ, সুন্দর আর ঠাণ্ডা।' বলে মেয়েটি আবার সুর ভাঁজতে থাকে।

'ঠাণ্ডা বলছ কেন? বলো শান্ত।'

'না, ঠাণ্ডাই,' নির্লিপ্ত জবাব মেয়েটির।

'কেমন ঠাণ্ডা দেখতে হয়!' ওর কথায় মজা পাই আমি।

নীচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। নিশ্চয়ই মিতুলের বাবা জাহিদ ফিরেছে। গিয়ে দেখি ধুলোয় একেবারে ফর্সা হয়ে গেছে। কাঁচা রাস্তা। কাজেই এ অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। কেমন যেন বিমর্ষ মনে হচ্ছে ওকে। অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল মন। বললাম, 'কিছু হয়েছে নাকি?'

'না,' কাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢোকে জাহিদ। গোসল সেরে ফ্রেশ

হয়ে খেতে বসল ও। সঙ্গে আমি আর মিতুলও বসে গেলাম। মিতুলই প্রথম ফাঁস করল ব্যাপারটা।

'বাবা, আমার না একটা বন্ধু হয়েছে।'

'বন্ধু? কী রকম?' অবাক হলো ও।

এবার আমাকেই মুখ খুলতে হলো, 'আর বোলো না, তুমি যাওয়ার পর একটি মেয়ে এসে তোমার মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

'মেয়েটি কে?'

'তা কি আর আমি জানি? বলল ওপারে থাকে। আর জানো মেয়েটি খুব সুন্দর। চোখ দুটো কটা-কটা।'

'এ জায়গাটা ভাল না,' এতই আস্তে জাহিদ বলল যে শোনা গেল কি গেল না।

'কী বললে?'

'না বলছিলাম, এখান থেকে শিগগির অন্য কোথাও গিয়ে উঠব।'

'কেন?'

'শহরে গিয়ে শুনলাম, এ জায়গাটা নাকি...মানে দেখলে তো কী অবস্থায় ফিরলাম। এভাবে থাকা সম্ভব?'

'জাহিদ! তুমি এসব কী বলছ?'

সুন্দর পরিবেশটা নিমেষেই অন্যরকম হয়ে গেল। আমি মিতুলকে কাজের মেয়ের সঙ্গে বারান্দায় পাঠিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জাহিদের কাঁধে হাত রাখলাম। আমার হাত ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও। কী যেন বলতে চায়, কিন্তু পারছে না। ওর কষ্ট দেখে আমার যন্ত্রণা বাড়ে। হঠাৎ ফস্ করে বলে ওঠে, 'আমি আমার মেয়েকে হারাতে পারব না। ওকে ছাড়া আমি কী নিয়ে বাঁচব, বলো?'

এত অসহায় ওকে কখনও দেখিনি। নিজের অজান্তেই টপ্ টপ্ করে পানি ঝরতে থাকে চোখ থেকে। ওর কথা ভেবে নিজেকে সামলে নিই।

'তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? কে কী বলল তাই বিশ্বাস করতে হবে নাকি?'

'এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, কেয়া। তোমার বর্ণনা শুনেই বুঝেছি আশরাফ সাহেবের কথাই ঠিক।'

'কী বলেছেন আশরাফ সাহেব?'

আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় জাহিদ, 'তুমি জানো, নদীর ওপারে কোন বসতি নেই?'

'না তো!'

'বছর বিশেক আগের ঘটনা। জাফর আলী খান নামে এক বিরাট ব্যবসায়ী এখানে বেড়াতে আসেন। সপরিবারে। এই বাংলোতেই ওঠেন তাঁরা। প্রাণ ভরে উপভোগ করতে থাকেন প্রকৃতিকে। বেশ সুখেই কাটছিল তাঁদের অবসর মুহূর্তগুলো। অকস্মাৎ ঘটে গেল অঘটন। তাঁদের একমাত্র মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সমস্ত এলাকা চষে ফেলা হলো। মেয়েটির কোন খোঁজ মিলল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। শেষমেশ পাওয়া গেল তাকে। মৃত। নদীতে ভাসছে। চোখ দুটো গলা, সুন্দর মুখখানা খুবলানো, চেনা যায় না। সে এক বীভৎস দৃশ্য! মেয়েটির বাবা-মা তাকে চিনেছিল পোশাক আর গলার চেন দেখে। মেয়েটির পরনে ছিল সবুজ রঙের ফ্রক। একমাত্র মেয়ের করুণ পরিণতি সহ্য করতে পারলেন না জাফর সাহেব। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। আর মিসেস জাফর পর পর দুটো শোকে বোধশক্তি হারিয়ে ফেললেন। মেয়েটির নাম ছিল এষা। তারপর একদিন হঠাৎ ফিরে এল মেয়েটি। তাকে দেখা গেল নদীর তীরে, বাংলোর লনে। মেয়েটিকে দেখা যাওয়ার কিছুদিন পর একটি অঘটন ঘটল বাংলোয়। তখন শহীদুল্লাহ নামে এক অফিসার থাকতেন এই বাংলোয়। একদিন দেখা গেল তাঁর আট বছরের মেয়েটি বাংলোর বাথটাবে ভাসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির মুখ ছিল খুবলানো। নির্জন হলেও এ এলাকায় হিংস্র কোন জন্তু নেই। ওই ঘটনার পর ভয়ে বাংলোয় থাকা বন্ধ করে দেন অফিসাররা।'

বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হঠাৎ মেয়েটির কথা মনে পড়ে। সুন্দর আর ঠাণ্ডা!

পরদিন সকালেই গেলাম নদীর তীরে। কোন সাঁকোর নাম গন্ধও নেই। নদীর ওপারে ঘনবন।

স্বপ্না আহমেদ

পিশাচ

বিকাল বেলা বই পড়ছি। এমন সময় অর্পিতা এসে হাজির। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই মনে হলো, কেমন যেন হয়ে গেছে মেয়েটা। চেহারাটা ম্লান। চোখ দুটো তলিয়ে গেছে। মুখ শুকনো। দেখে বোঝা যায় মেয়েটা কোন টেনশনে ভুগছে।

অর্পিতা, আমি, এবং সিজান বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে খুব ভাল বন্ধু ছিলাম। আমাদের ছিল দহরম মহরম সম্পর্ক।

রংপুরে আমার জন্ম। অর্পিতা দিনাজপুরের এবং সিজান বগুড়ার। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে সিজান আর অর্পিতার মধ্যে কখন যে অন্যরকম একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল বুঝতেই পারিনি। বুঝলাম দু'বছর আগে। যখন ওদের বিয়েটা সুসম্পন্ন হলো। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সিজান আর অর্পিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। তেমন বেশি দেখাও হতো না। ঢাকায় থাকে ওরা। আমিও ঢাকায় আছি অনেকদিন। ঢাকায় যেখানে থাকি তার অল্প দূরেই ওরা থাকে। আমার কাছাকাছি যে ওরা থাকে তা জানতামও না। যখন জানলাম তখন থেকে মোটামুটি আবার যোগাযোগ আমাদের। গত একমাসে আমি ওদের ওখানে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু ওরা আসেনি।

এখন অর্পিতাকে এমন চেহারায় দেখে চমকে ওঠার কথা আমার। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম না। বরং ওর মলিন চেহারা বিচ্ছিন্ন ভাবনা দোলা দিচ্ছে মনে। কি হয়েছে ওর?

'অর্পিতা, তুমি! হঠাৎ কি মনে করে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

অর্পিতা ব্যস্ত গলায় শুরু করল, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। খুব জরুরী...'

'বসো।'

'উঁহু, বসব না।' মাথা নাড়ল ও।

'তাহলে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে?'

অর্পিতা কিছু বলল না। চেয়ার টেনে বসে পড়ল আমার পাশে। মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে ঠিক করতে করতে বলল, 'খুব টেনশনে আছি, দীপক।' এটুকু বলে থেমে গেল অর্পিতা। খানিক পর আবার বলল, 'দীপক...' কথা শেষ না করে আবার থেমে গেল।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছি আমি। বললাম, 'তুমি যে টেনশনে আছো, তা তোমার চেহারা দেখে বোঝা যায়। কি জন্যে টেনশনে আছো তা বলতেই বা এত টেনশন করছো কেন? ঘটনা কি তা বলো।'

'ব্যাপারটা প্রায় তিন মাস ধরে ঘটছে। সিজানকে বলেও বিশ্বাস করাতে পারিনি।'

'কি ঘটনা?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম আমি।

'বললে হয়তো তুমিও বিশ্বাস করবে না। তবুও তোমাকে বলব।' অর্পিতা নড়েচড়ে বসল 'বন্ধুকে বলে একটু হালকা হতে চাই। তাই তোমার কাছে ছুটে আসা।'

'কেন বিশ্বাস করব না। আমাকে মিথ্যে বলে তোমার কী লাভ? আর তোমার কথা অবিশ্বাস করেই বা আমার কী লাভ।'

আমার কথায় অর্পিতা বোধহয় কিছুটা স্বস্তি পেল। ওর চেহারা তাই বলছে। ও ওর কাহিনী বলতে শুরু করল।

'তিন মাস হলো রাতে ভাল ঘুম হয় না আমার। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। আর...' অর্পিতা থেমে একটু বিরতি নিল। 'ঘুম ভাঙতেই কানে খট্ খট্ খট্ খট্ জুতোর শব্দ পাই। মনে হয় কেউ পায়চারি করছে অনবরত। কয়েকদিন বিছানা থেকে উঠে জানালা-দরজা খুলে দেখেছি। যখনই দরজা কিংবা জানালা খুলি সঙ্গে সঙ্গে খট্ খট্ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে দেখতে পাই না। কাউকে না দেখে ফিরে এসে আবার যেই বিছানায় যাই, খট্ খট্ খট্ আবার শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে জানালা খোলা রাখলে পর্দায় ছায়াও

পড়ে। পর্দায় লক্ষ করলে স্পষ্ট দেখা যায় কেউ একজন পায়চারি করছে। একবার এপাশে আর একবার ওপাশে। কানে জোরালো ভাবে খট্ খট্ খট্ খট্ আওয়াজ ধাক্কা দেয়। ভয়ে আর ঘুমুতে পারি না আমি।' অর্পিতা এ পর্যন্ত বলে থেমে যায়। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো মুছে নেয়।

'তোমরা কতদিন হলো ও বাসায় আছো?'

'এক বছর তো হবেই। এক বছরের বেশিও হতে পারে।'

'এর আগে ওরকম কিছু ঘটেনি?'

'নাহ্। গত তিন মাস থেকে এরকম ঘটছে। সিজানকেও বলেছি বেশ কয়েকবার। ও বিশ্বাস করতে চায় না। আমার...আমি কোনভাবে বিশ্বাস করাতে পারিনি সিজানকে। তুমিও কি বিশ্বাস...'

'অবিশ্বাস করছি না। আমি এরমধ্যে তোমার বাসায় যাব একবার।'

'আসো না একদিন। কতদিন আমরা তিনজন একসঙ্গে হই না। সিজান তোমাকে দেখলে খুশিই হবে। চুটিয়ে আড্ডাও দেয়া যাবে।'

'আড্ডা! হাঃ হাঃ হাঃ।'

আড্ডার কথা মনে হতেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে আয়নার মত। ক্লাস শেষে প্রতিদিন চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি তিনজনই। অবশ্যই তা ছিল ক্যাম্পাস কেন্দ্রীক। এমন তুমুল আড্ডা চলত যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখন কেটে গেছে টের পেতাম না আড্ডার মুহূর্তটুকুতে সময়জ্ঞান সম্পর্কে কারোই ধারণা থাকত না। আড্ডাটা মরে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পরে।

আমার হাসি দেখে অর্পিতার চেহারায় ম্লান ভাবটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ও বলে, 'তোমার খবর বলো তো শুনি। আর কতোকাল একা একা থাকবে। এবার সঙ্গী-টঙ্গী জোটাও। একাকী জীবন কোন জীবন হলো?'

'কেন একাকী জীবন জীবন নয়? তাহলে কি মরণ!'

'তুমি না! সেই আগের মতই রয়ে গেলে। জীবনটা এবার সিরিয়াস ভাবে নাও। ঠাট্টা দিয়ে কি চলে! আচ্ছা তোমার সেই

মেয়েটির খবর কি?'

'কোন মেয়েটি?'

'ভার্সিটি জীবনের আড্ডায় যার কথা তুমি প্রায়ই বলতে। অথচ শত চেষ্টাতেও আমরা তার নাম জানতে পারিনি তোমার কাছে?'

অর্পিতার কথায় রুবিনাকে মনে পড়ে গেল। আমাদের পাশের বাসায় থাকত। খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। সেই কলেজ জীবনে। ওকে আমি প্রচণ্ড ভালবাসতাম। কিন্তু আজও 'ভালবাসি' কথাটা তাকে বলা হয়নি। বলার প্রয়োজনও হয়নি। কেননা তার আগেই আমি জেনে গেছি যে এটা কোনদিনও সম্ভব নয়। রুবিনারা ছিল কোটিপতি। ভালবাসার কথাটা বলা হয়নি মূলত এই জন্যেই।

'কী হলো, দীপক, তোমার মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

অতীতের কথা ভাবতেই মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। অর্পিতার কথায় চমকে উঠলাম। জবাব দিলাম, 'না তো।'

'বললে না যে সেই মেয়েটির খবর কি!'

'বলার মত কিছু নেই তো।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল অর্পিতা।

'কি বলব। সত্যি কথা বলতে কি ওকে নিয়ে বলার মত কোন কিছুই নেই আমার।'

রুবিনা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। আসলে রুবিনাকে কি আমি ভুলে গেছি? উঁহুঁ, ভুলিনি। রুবিনা আমার দু'নয়নে আজীবন জমে থাকা লুকায়িত জল। যা চিরদিন জমে আছে। ঝরেও পড়ে না, শুকিয়েও যায় না। তাই হয়তো রুবিনাকে কোনদিন ভুলতে পারব না আমি।

অর্পিতা চলে যাওয়ার দুদিন পরই আমি ওদের বাসায় গিয়ে হাজির। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব কিছুই। রহস্যের কিছু আছে বলে মনে হলো না। তবে একটা জিনিস খুব নজর কেড়েছে আমার। চোখ নামাতেই পারিনি। সেটা হচ্ছে ছবি রাখার একটা ফ্রেম। গোল ফ্রেমটা এতো সুন্দর যে কারও চোখে পড়লেই নজর কাড়বে। তবে ফ্রেমটাতে কোন

ছবি নেই। সিজানকে জিজ্ঞেস করতেই জানাল, 'ওটা অর্পিতা পছন্দ করে কিনেছে। আমাদের বিয়ের ছবিটা নাকি বড় করে ওই ফ্রেমে লাগাবে। এজন্য এখনও ওটা ফাঁকা আছে। একটা ব্যাপার কি জানিস...'

'সিজান।' পাশের ঘর থেকে চিৎকার দিল অর্পিতা। 'দীপককে যেতে দিয়ো না। আমি চা নিয়ে আসছি।'

'ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলাম আমি।

'সেদিন মার্কেটে গিয়েছিলাম আর কি। সব কিনে ফেরার পথে চোখে পড়ল ফ্রেমটা। আমার নয় অর্পিতার। অর্পিতা জেদ ধরল ওটা নিবেই। দোকানে গিয়ে মজার ব্যাপার। দোকানি ওটা বিক্রি করবে না। কিন্তু অর্পিতা ওটা কিনবেই। অনেক করে বলার পর ওটা বিক্রি করতে রাজি হলো দোকানদার। তবে চড়া দামে। ফ্রেমটার দাম...'

'ফ্রেমটার কথা বলছো? খুব ভাল কথা।' দামের কথা জানার আগেই অর্পিতা এসে মুখের কথা কেড়ে নিল। 'জানো, দীপক, এই ফ্রেমটা যেদিন নিয়ে এলাম সেদিনই প্রথম মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আমার। কী যে ভয় করছিল! সিজানকে ডাকি, ও শোনে না।'

'কিসের মাঝে কি বলতে শুরু করলে।' বিরক্ত হলো সিজান।

সিজানের কথায় বুঝলাম ও সত্যি সত্যি ওসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি যে মূলত ও জন্যেই এসেছি তা মনে হয় সিজান জানে না।

সিজান বলল, 'দীপক, অর্পিতার মনে হয় মাথায় একটু গণ্ডগোল হয়েছে। প্রায়ই কিসব আজব ঘটনার কথা বলে।'

অর্পিতা সিজানের কথায় কোন মন্তব্য না করে চায়ের কাপ তুলে দিল আমাদের দুজনের হাতে।

অর্পিতা বলল, 'তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে।'

আমি খেয়েই বাসায় ফিরলাম। বাসায় এসে অনেকক্ষণ ভেবেছি অর্পিতার বিভ্রমটা নিয়ে। দারুণ একটা তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। আমার মনে হয় সব কিছুর জন্য ফ্রেমটাই দায়ী। তবে এ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল অর্পিতাকে। যেহেতু অর্পিতা ওটা পছন্দ করে কিনেছে।

তবে ফ্রেমটাই যে দায়ী সেরকম কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। বাড়িটাও তো হতে পারে।

এরপর আর আমি সিজানদের বাসায় যাইনি। নতুন কিছু ঘটছে কিনা তাও জানি না। অর্পিতাও আমার এখানে আসেনি।

দু'সপ্তাহ পর এক বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি সিজান বসে আছে। একটা ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে। আমি নিঃশব্দে পাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখে চমকে গেল। বলল, 'কখন এলি?'

'এইতো কিছুক্ষণ আগে। তা তুই কখন এসেছিস?'

'মিনিট পনেরো হবে।'

'অর্পিতা ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ ও ভাল আছে। এখন আমিই খারাপ আছি।'

সিজানের কথা শুনে মনে হলো অর্পিতা এখন ওসব কিছু দেখে না। কিন্তু সিজানের কি হলো?

'খারাপ আছিস কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অর্পিতা বলল তুই নাকি সব শুনেছিস। তাই তোকেই প্রথম জানাতে এলাম।'

'কোন বিষয়ে, ওই যে মাঝরাতে পায়চারি, খট্ খট্ খট্।'

'হ্যাঁ। অর্পিতা বলল ওসব এখন আর দেখে না ও। কারণ প্রতিরাতে নাকি ঘুমের পিল খেয়ে শুতে যায়। এখন দেখছি আমি। এ পর্যন্ত দু'দিন দেখলাম।' থেমে গেল সিজান। সিজানের চেহারা বলছে আরও কিছু বাকি আছে বলার। কাজেই কোন কথা বললাম না আমি। নীরব থাকলাম। সিজান আবার বলতে শুরু করল। 'অর্পিতার কথা কোনদিন বিশ্বাস করিনি আমি। অথচ ও অনেকদিন বলেছে আমাকে। ভেবেছিলাম ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে।'

আমি বললাম, 'তুই কি দেখেছিস?'

'প্রথম রাতে যা দেখলাম দ্বিতীয় রাতেও তাই। প্রথমে অদ্ভুত এক আলোয় ঘুম ভেঙে গেল আমার। চোখ খুলতেই ছবি রাখার সেই ফ্রেমটার দিকে নজর গেল। ওখান থেকেই রঙীন আলো বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর যা দেখলাম, তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। এমন

অবস্থা হলো, যেন আমি আর এ পৃথিবীতে নেই।' একটু বিরতি নিল সিজান। 'দেখলাম ছবি রাখার সেই ফ্রেমটা থেকে ছোট্ট এক মানুষ বেরিয়ে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে ঘুমের ভাব করে আলতো ভাবে চোখ খুলে সবকিছু দেখতে লাগলাম। মানুষটা লম্বায় সাত-আট ইঞ্চির বেশি হবে না। তবে ধীরে ধীরে ওটা বড় হতে শুরু করল। এরপর আপনাআপনি ঘরের দরজা খুলে গেল। অদ্ভুত মানুষটিও বের হয়ে গেল। যেভাবে দরজা খুলে গেল ঠিক সেভাবেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এরপর বাইরে গিয়ে লোকটা সম্ভবত পায়চারি করতে শুরু করল। কেননা খট্ খট্ খট্ আওয়াজ স্পষ্ট হতে লাগল। তারপর কী হয়েছে জানি না। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি টের পাইনি।' সিজান ওর কথা শেষ করল।

আমি বললাম, 'যা ভেবেছি তাই ঠিক হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম এটার পিছনে ফ্রেমটার একটা ভূমিকা আছে। অর্পিতার পছন্দের জিনিস বলে কিছু বলতে সাহস পাইনি।'

'আমার এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয় সেই দোকানদার কিছু জানে। নইলে সেদিন ফ্রেমটা বিক্রি করতে চাচ্ছিল না কেন। যখন বিক্রি করতে রাজি হলো, দোকানদার কি বলেছিল জানিস?'

'নাহ্।'

'বলেছিল ফ্রেমটা খুবই সুন্দ তবে দয়া করে ছবি রাখবেন না!'

'ছবি তো লাগাসনি।'

'লাগিয়েছে। অর্পিতা শখ ওর নিজের বড় একটা ছবি লাগিয়েছে গত সপ্তাহে।'

'ফ্রেমটার রহস্য উদ্ধার করতে হবে। তুই কি আমাকে সেই দোকানদারের কাছে নিয়ে যাবি?'

'তা যাওয়া যায়।'

'চল্ তাহলে।'

'এক্ষুণি?'

'অসুবিধা আছে?'

'তা নেই।'

'তাহলে চল্ না।'

এরপর আমরা যখন সেই দোকানে পৌঁছালাম তখন রাত আটটা।

দোকানদারকে দোকানের বাইরে ডেকে নিলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম সেই রহস্যময় ফ্রেমটার কথা। কিছুতেই তিনি বলতে চাচ্ছিলেন না ফ্রেমটার কথা। তবে বার বার বলছিলেন ওই ফ্রেমে যেন ছবি রাখা না হয়।

'কেন?'

জিজ্ঞেস করতেই নারাজ। বলা নাকি যাবে না। বললে ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেক ধরাধরির পর তিনি বলতে রাজি হলেন।

দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবি লাগিয়েছেন নাকি?'

উত্তর না শুনেই বলতে শুরু করলেন, 'ছবি রাখার ওই ফ্রেমটাকে অভিশপ্ত বললেও ভুল হবে না। আমি এর আসল রহস্য জানি না। তবে যেটুকু জানি, তার বেশি বলতে পারব না। ওই ফ্রেমে এক প্রেতাত্মা বসবাস করে।' থামলেন দোকানদার।

প্রচণ্ড ভয় পেলাম আমরা। তবে পরের কথাটিতে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

দোকানদার বললেন, 'তবে, ওই প্রেতাত্মা কোন ক্ষতি করে না। তবে যদি ফ্রেমে কারও ছবি রাখেন তবেই বিপদ।'

আবার শংকিত হলাম আমরা। সিজান জিজ্ঞেস করল, 'কি বিপদ?'

দোকানদার বললেন, 'এ পর্যন্ত যাদের ছবি ওই ফ্রেমে রাখা হয়েছে শুনেছি তাদের সবাইকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে। এজন্যই আপনাদের কাছে ফ্রেমটা বিক্রি করতে চাইনি। দোকানে ছিল, একটা আকর্ষণ ছিল। কোন ক্ষতিও হবে না। এর আগে এই ফ্রেমটা আরও দুজন ফেরত দিয়ে গেছে। তারা বলেছে এই ফ্রেমে যার ছবি রাখা হয় সে আর বাঁচতে পারে না। এমন আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু হয় যা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।'

'সর্বনাশ।' আমার মাথায় বাজ পড়ল যেন। সিজান তো একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বিদায় নিয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করলাম আমরা। সিজানের ভাবনা, রাতে বাসায় কেউ নেই। যদি অর্পিতার কিছু হয়ে যায়?

আমি ভাবছি, এতদিন কোন ছবি ফ্রেমে রাখেনি আর এই কদিনের মধ্যে রেখে দিল। সিজান এর কারণটা পরে বলল। ও বলল, অর্পিতা নাকি ভেবেছে সবাই আসে আর ফ্রেমটার প্রশংসা করে যায়। অথচ কোন ছবি নেই। এজন্য গত সপ্তাহে ওর নিজের ছবিটা রেখে দিয়েছে।

আমরা যখন বাসায় পৌছালাম তখন ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। ঘরে ঢুকেই দেখি অর্পিতা মিট মিট করে হাসছে। অর্পিতার মুখে হাসি দেখে একটু স্বস্তি পেল সিজান।

অর্পিতা আমাকে দেখে বলল, 'আমার কেন জানি মনে হয়েছে তুমি আসবে আজ সিজানের সাথে।'

আমি বললাম, 'তাই!'

'হুঁ।' অর্পিতা সিজানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি এত দেরি করলে কেন? তুমি তো জানো তোমাকে ছাড়া আমি রাতে খাই না! চলো, দীপক, খাবে। আর শোনো, আজ কিন্তু তোমাকে যেতে দিচ্ছি না।'

খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা সব খুলে বললাম অর্পিতাকে। ওর একটা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

ও বলল, 'কে বলেছে এই ফ্রেমটা আমার খুব প্রিয়! ফ্রেমটা ভেঙে ফেললেও আমার কিছু যায় আসে না।'

আমি ভেবেছিলাম অর্পিতা ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। আসলে ও ঠাট্টা করে বলেনি। ওর কণ্ঠ আজ কেন জানি অন্যরকম মনে হচ্ছে। সিজান ফ্রেমটা নামিয়ে বের করে ফেলল ছবি। আলাদা করল, বলল কাল এটা ফেলে দেবে। ও চায় না এ ফ্রেম কারও হাতে গিয়ে তার কোন ক্ষতি হোক।

ফ্রেমটা রান্নাঘরে রেখে দিল সিজান।

আমি সে রাতে খেয়ে দেয়ে যে ঘরে ফ্রেম লাগানো ছিল সে ঘরেই শুলাম। ওদের বললাম দরজা খোলা রাখতে। আমি পাহারায় থাকব।

ওরা ঘুমাল পাশের ঘরে।

কি আশ্চর্য! ফ্রেমটা রান্নাঘর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অর্পিতার ঘরে এগুচ্ছে। দরজার কাছে যেতেই আপনা-আপনি দরজা খুলে গেল। ফ্রেমটা ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। ফ্রেমটা থেকে রঙ্গীন আলো বের হতে লাগল। সঙ্গে সেই ছোট্ট প্রেতাত্মা। ওটা ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করল। পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রেতাত্মাটা অর্পিতার কাছে গেল। বলল, 'অর্পিতা, অ্যাই অর্পিতা! আজ তোমার শেষ দিন। তোমার স্বামীকে তুমি গুডবাই জানাও।'

প্রেতাত্মাটা সরে এসে ফ্রেমের ওপর দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মিশে গেল ওটার সাথে। অর্পিতা চিৎকার দিয়ে উঠল। পরপরই অদ্ভুত একটা আলো এসে পড়ল ওর শরীরে। ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল অর্পিতা। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের ছাদ ভেঙে পড়তে যাচ্ছে ওর শরীরের ওপর। ঘরের চার দেয়াল চেপে আসছে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত এক হাসির শব্দ এলো দেয়ালের বিভিন্ন দিক থেকে। এ হাসির রহস্য বুঝতে পারল না ও। আমি নীরব বিস্ময়ে সব দেখছি। বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারেই বসে থাকলাম। এরপর কখন ঘুম এসেছে জানি না। চোখ খুলে দেখি সকাল।

সিজান অর্পিতাকে ডাকছে ঘুম থেকে ওঠার জন্য, শুনতে পেলাম আমি।

আমি বাথরুমে গেলাম। বাথরুম থেকে বের হতেই সিজানের সামনে পড়ে গেলাম।

সিজান বলল, 'অর্পিতা কেন জানি না ঘুম থেকে জাগছে না। ও তো কোন দিন এত দেরি করে না। ওই প্রথমে উঠে চা-টা দেয়।'

আমি বললাম, 'হয়তো রাতে ঘুম হয়নি। উঠবে কিছুক্ষণ পর।'

আমার এ কথায় কোন কাজ হলো না। সিজানের চোখে মুখে

টেনশনের ছাপ। কাল থেকে ওর চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে অর্পিতাকে ডাকার জন্যে গেলাম ওদের ঘরে।

অর্পিতার হাত ধরে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ ইলেকট্রিকের শক খাওয়ার মত চমকে উঠলাম আমি। অর্পিতার হাত বরফের মত হিম হয়ে আছে। এরপর ওর পাল্‌স্‌ খুঁজে দেখে যা বুঝলাম, তা আর সিজানকে বললাম না। আমি বোবা হয়ে চেয়ে রইলাম অর্পিতার হাসি মাখা মুখের দিকে।

সিজান আমার হাতে হাত বুলিয়ে বলল, 'দীপক, অর্পিতাকে ডাক্‌ না, আমরা চা-নাস্তা করব না!'

আমি. ম্লান স্বরে বললাম, 'অনেকদিন ও ঠিকমতো ঘুমুতে পারেনি, ওকে ঘুমুতে দে।'

মোকাদ্দেস আলী রাব্বী

প্রতিশোধ

নিস্তব্ধ গভীর রাত। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। শহরের একটা বাড়ির বারান্দায় ডিম লাইট জ্বলছে। সেই আবছা আলোয় আবির্ভূত হলো এক ব্যক্তি। তার হাতে কালো গ্লাভস, গায়ে গাঢ় রঙের পোশাক। ভাল করে খেয়াল না করলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। অবশ্য তাকে কেউ দেখছেও না। কার এত দায় পড়েছে এত রাতে কোথায় কি হচ্ছে খেয়াল করে বেড়াবে। তাছাড়া, বাইরে কোথাও থেকে এই বাড়ির ভিতরটা দেখা যায় না। সন্ধ্যা থেকেই ভারী বর্ষণ হওয়ায় শহরবাসী ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু শরীফ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগমের চোখে। শরীফ সাহেব চোরের মত পা টিপে টিপে বারান্দা পার হয়ে দরজা দিয়ে মেয়ের ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেন। দেখলেন সে ঘুমে বেহুঁশ। পাশে শুয়ে আছে তার ৩ মাস বয়সী বাচ্চা। মেয়ের ঘরে ঢুকতে শরীফ সাহেবের ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কাজটা করার সময় যদি মেয়ে জেগে যায়। পরক্ষণেই মনে পড়ল মেয়ে জাগবে কিভাবে। তাকে তো দুধের সাথে কড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। শরীফ সাহেব সব দ্বিধা কাটিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকে বাচ্চাটির মুখের উপর গ্লাভস পরা হাত জোরে চেপে ধরে রাখলেন। কতক্ষণ ধরে রেখেছিলেন কিংবা আশেপাশে কি ঘটছে সেসব তাঁর খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলেন স্ত্রী তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলছে, 'চলে এসো, গাধা!'

পরদিন সকালে জাহানারা বেগমের মরাকান্নায় এলাকাবাসী ঘটনা জানল। অতি দ্রুততার সাথে নামকাওয়াস্তে আনুষ্ঠানিকতায় অসহায়

বাচ্চাটিকে রেখে আসা হলো তার জন্য চির শান্তির স্থানে। পৃথিবী থেকে এভাবে বাচ্চাটিকে বিদায় করে দেয়ার মূল কারণ ছিল তার শারীরিক অসুস্থতা। সে জন্মেইছিল সিরিয়াস ফিজিক্যাল ডিসঅর্ডার নিয়ে। ডাক্তাররা বলেছিল ব্রেনের একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে কখনোই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে না। মানুষের মত বোধ তার ভেতর সৃষ্টি হবে না। যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে জীবন্মৃত মানুষ হিসাবেই বেঁচে থাকতে হবে। ব্যাপারটি জাহানারা বেগমের পছন্দ হয়নি। এমনিতেই বাচ্চাটির জন্য ডাক্তার, চিকিৎসা, ওষুধ বাবদ প্রচুর খরচ হচ্ছিল। এসবের কোন পজিটিভ রেজাল্ট নেই শুনে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাছাড়া মূর্খ পাড়া-প্রতিবেশী বিভিন্ন রকম কথা বলে বেড়াচ্ছিল, যা তার সহ্য হচ্ছিল না। এরকম মূর্তিমান ঝামেলাকে বয়ে বেড়ানোটা ছিল তাঁর কাছে অযৌক্তিক। এভাবে বেঁচে থাকলে বাচ্চাটার মৌলিক অধিকারও নষ্ট হত। এর চেয়ে সে দুনিয়ার তুলনায় কবরেই স্বস্তি বোধ করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। এসব চিন্তা তিনি পারিবারিক পর্যায়ে পরোক্ষভাবে ব্যক্তও করেছিলেন। তাঁর মেয়েও ভাবছিল কোনভাবে যদি বাচ্চাটা মরে বেঁচে যেত তাহলে সে ও তার পরিবার এই সমস্যা থেকে রেহাই পেত।

অতএব দেরি না করে কাজটা সেরে ফেলার তাগিদ অনুভব করছিলেন জাহানারা বেগম। ঝামেলা বেঁধেছিল বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা নিয়ে। কাজটা করতে ঢাকের বাঁয়া হিসাবে স্বামীর নামই তাঁর মাথায় প্রথম এসেছিল। তাকে রাজি করাতে অবশ্য জাহানারা বেগমকে অনেক শ্রম, মেধা ও সময় খরচ করতে হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই বেচারা কখনও তাঁর কথার বাইরে যাননি। এরকম ভীরু কাপুরুষ একজনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তিনি অবশ্য খুশিই হয়েছেন। কোনদিনই তাঁকে তিনি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেননি। জামাইটাও হয়েছে তাঁর স্বামীর মতই। কথায় আছে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। তাঁর জামাইয়ের ক্ষেত্রে কথাটা হয়েছে শাশুড়ীর পায়ের নিচে জামাইয়ের বেহেশত।

গভীর রাত। ঘুমে বিভোর সারা পাড়া। ঘুম নেই শুধু জাহানারা বেগমের একমাত্র সন্তান ডরোথির চোখে। বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর থেকে তার চোখের ঘুম পালিয়েছে। রাত জাগতে তার ভাল লাগে না, কিন্তু ঘুমও আসে না। বাচ্চাটার কথা খুব মনে পড়ে। তার প্রতি সে বেশ অবহেলা করেছে। সবকিছু জানার পর মমতা ভরে খুব একটা কাছে নেয়নি। তার মতে বাচ্চাটারও যে দোষ ছিল না তাও নয়। বাচ্চাটা কাঁদতে পারত না। খেতে দিলে খেত, না দিলে খিদেয় চেঁচিয়ে উঠত না। এসব অনুভূতিই তার ছিল না। এরকম একটা জড় পদার্থকে সে কিভাবে গড়ে তুলবে। তারপরও তার মনের কোন এক কোণে একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। এমন একটা সময়ে তার স্বামীও কিছুদিন আগে মাসখানেকের জন্যে গেল বিদেশে। শুয়ে থাকার বিরক্তি এড়াতে ডরোথি বিছানা থেকে উঠে ঝুল-বারান্দার দরজা খুলল। বাড়িতে এই ঝুল-বারান্দাই তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

দরজা খুলেই চমকে উঠল সে। দেখল তার বাচ্চাটা রেলিংয়ের উপর বসে আছে। চেয়ে আছে তারই দিকে। কেমন যেন মায়া ভরা চাহনি। বাচ্চাটা যেন তাকে কিছু বলতে চাইছে। যেন বলতে চাইছে, 'আমাকে একটু কোলে নেবে, মা?' ডরোথি বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিত। বাচ্চাটার নীরব কান্নায় তার অন্তর ফেটে যাচ্ছে। মনের অজান্তেই সে এক পা দুই পা করে এগিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটার দিকে। হঠাৎ বাচ্চাটা চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই সে দ্রুত গিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করল। জাহানারা বেগম তখন ঢুলছিলেন। একটা তীব্র চিৎকার আর ভারী কিছু পতনের শব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল। দ্রুত জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে শব্দের উৎসের দিকে লক্ষ করতেই তিনি পরিষ্কার আলোয় মেয়েকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলেন। রাতেই টেলিফোন, ছুটোছুটি করে ডরোথিকে ক্লিনিকে নেয়া হলো। ভাগ্য ভাল পা ভাঙা ছাড়া তার তেমন ক্ষতি হয়নি। তারপরও প্লাস্টার করে তাকে সেই বিছানায়ই পড়ে থাকতে হলো। মাঝখান থেকে দুর্নাম করায় অভ্যস্ত পাড়া-প্রতিবেশী বলে বেড়াতে লাগল, সে নাকি

ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল।

একদিন বিকালে ঘরে বসে এসব ভাবছিলেন জাহানারা বেগম। মেয়েটা তার আজ এক সপ্তাহ হলো পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে। কি হয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দেয় না। মেয়েটা পাগলই হয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে! বাচ্চাটার মৃত্যুর পর থেকে সবকিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কোনকিছুই আর তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই। স্বামীও আজকাল অচেনা হয়ে গেছে। এখন তাঁর বিনা অনুমতিতেই বাড়ির বাইরে যায়। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। তিনি চড়া গলায় কাজের মেয়েকে ডাকলেন। তার সাড়া পাওয়া গেল না। মনে হয় পাড়া বেড়াতে বের হয়েছে। এইটা হয়েছে আরেক কালসাপ। সুযোগ পেলেই বের হয়ে পাড়ার অন্যান্য মহিলাদের কাছে গিয়ে বাড়ির কথা বলে আসে। নিতান্ত উপায় নেই বলেই তাকে রাখা। আর কাউকে পেলে একে বের করে তবে তাঁর শান্তি। হঠাৎ তিনি খুব চায়ের তৃষ্ণা অনুভব করলেন। ফ্লাস্কে চা পেলেন না। ইচ্ছা হলো নিজে চা বানিয়ে খাবেন। কতদিন যে রান্নাঘরে যাননি তার হিসাব নেই। জাহানারা বেগম গ্যাস বার্নার ধরিয়ে চায়ের পাতিল খুঁজতে লাগলেন। কোথায় যে রাখে সব। হঠাৎ দেখতে পেলেন রান্নাঘরের জানালায় তাঁর নাতি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তিনি ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর নাকে পোড়া গন্ধ এল। শুনতে পেলেন কে যেন বেল টিপছে। মনে হয় কাজের মেয়ে সখিনা। দরজা খোলার তো কেউ নেই। তাঁকেই দরজা খুলতে যেতে হবে। তাঁর যেন কেমন গরম লাগতে লাগল। গরমে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জাহানারা বেগমের হুঁশ ফিরল ক্লিনিকে। মেয়ের কাছ থেকে জানতে পারলেন গ্যাস বার্নার থেকে আগুন তাঁর শাড়িতে লেগে গিয়েছিল। সেই সময় বেল টিপছিল তাঁর ভাই। চিৎকার শুনে তিনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। ভদ্রলোকের মাথা বেশ পরিষ্কার। তিনি এসে দ্রুত কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বোনকে কোনরকমে আগুনের

হাত থেকে রক্ষা করেন, দমকল বাহিনীকে খবর দেন, অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন। তারপরও সেকেন্ড ডিগ্রী বার্ন থেকে বোনকে রক্ষা করতে পারেননি। প্রতিবেশীরা অনেকে এসেছিল জাহানারা বেগমকে দেখতে। সামনে আহা! ইশ! জাতীয় শব্দ করলেও ঘর থেকে বেরিয়েই তারা বলতে লাগল এসবই পাপের শাস্তি, পাপ বাপকেও ছাড়ে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুপুর ১টায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন শরীফ সাহেব। কড়া রোদে ও প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় লোকজন খুব কম। শরীফ সাহেবের গা দিয়েও অঝোরে ঘাম ঝরছে। ইদানীং তাঁর এক অভ্যাস হয়েছে দিনের অধিকাংশ সময়ই রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো, বিড়বিড় করে কি বলা, নাতির কবরের কাছে গিয়ে বসে থাকা। তাঁর চিন্তাভাবনা আর কথাবার্তাও এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি এখন ফিরছেন বাড়িতে। বাড়ির সামনেই হাইওয়ে। তিনি হাইওয়ে পার হওয়ার চিন্তা করছেন। হঠাৎ রাস্তার বিপরীত দিকে তাকাতেই যেন তাঁর নাতিটাকে াকতে দেখলেন। তিনি ভাবলেন, আরে, ও ওখানে কেন, হাঁটা শিখল কিভাবে! আরে, আবার দেখি হাত নেড়ে আমাকেই ডাকছে! তিনি শি হলেন। ভাবলেন, যাই, বাচ্চাটার কাছে মাফ চেয়ে আসি। তিনি বাচ্চাটার দিকে দৌড় দিলেন। হঠাৎ গেল গেল জাতীয় হৈ চৈ তাঁর কানে এল। কে যেন তাঁকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। তিনি চোখের সামনে রাস্তা এগিয়ে আসতে দেখলেন।

মুহূর্তেই স্থানটিতে জনতার ভিড় জমে উঠল। শরীফ সাহেবকে ধাক্কা দিয়েই ট্রাকটি পালিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাল ট্রাকচালকের নাকি দোষ ছিল না। শরীফ সাহেবই হুট করে দৌড়ে রাস্তার মাঝে চলে আসেন। পাগল মানুষ কখন কি করে তার ঠিক নেই। এলাকার অনেকেই তাঁকে চিনত। তারা বিভিন্ন কথার জাল বুনতে শুরু করল। শোনার লোকেরও অভাব হলো না। রাস্তার মাঝখানে যেখানে শরীফ সাহেব পড়েছিলেন সেখানটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। ট্রাকের চাকা মাথার উপর দিয়ে যাওয়ায় তাঁকে চেনার উপায় ছিল না। বীভৎস

সেই দৃশ্যের দিকে কেউ বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকতে পারছে না। মানুষ অদৃশ্য কিছু দেখতে পায় না। যদি পারত তবে শরীফ সাহেবের কাছে এক নবজাতককে দেখতে পেত। তবে তার নির্লিপ্ত ভাব দেখে সে দুঃখিত না আনন্দিত তা বুঝতে পারত না।

মেহেদী হাসান

অদ্ভুত লাশ

১৯৩৫ সালের ঘটনা। যদিও সমাজে তখন এখনকার মত এত সন্ত্রাসী অপরাধ সংঘটিত হত না, তবুও এখনকার চেয়ে থানার সংখ্যা কম ছিল না। বরং সে সময়কার অনেক থানা বর্তমানে আর নেই অর্থাৎ থানার অফিস পরবর্তীকালে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে; এমনই এক থানা যার নাম নন্দনালী থানা, যা ছিল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত; আর আমি ছিলাম সে থানার বড় দারোগা। পুলিসের চাকুরি; সাধারণ মানুষের ধারণা–চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির আসামীদের নিয়ে কারবার, বড়ই থ্রিলভরা জীবন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে রকম কোন উত্তেজনাময় ঘটনা ঘটত না। প্রতিদিন অফিসে যেতাম; মাঝে মাঝে ২/৪ টি সাধারণ চুরির কেস্ আসত। আমার জুনিয়র নওশাদই সব সময় যেচে পড়ে সব তদন্তের ভার নিত। ফলে ফাইল প্রস্তুত করা, তা পরীক্ষা করা আর অফিসের পাশ দিয়ে বহমান আত্রাই নদীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় অতিবাহিত করা ছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও আমি অফিসে বসে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছি; এমন সময় এক সেপাই এসে জানাল–স্যর থানার ঘাটে এক লাশ আটকে পড়েছে, মানুষ খুব ভিড় করছে, কী করব? আমি বললাম–কেউ যদি লাশটাকে না চেনে তবে ভাসিয়ে দাও। সে সময় কলেরা দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন অনেক মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। তাদেরই দুই একটা লাশ ভেসে যায় মাঝে মাঝে। কারও অভিযোগ না পেলে লাওয়ারিশ কোন মৃতদেহ নিয়ে আমরা অযথা মাথা ঘামাতে যাই না। এই কারণে লাশটিকে ভাসিয়ে দিতে বললাম। পরদিন যথারীতি অফিসে বসেছি ঠিক তখনি সেই সেপাইটা হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে আসল এবং চোখ বড় বড় করে জানাল–কী আশ্চর্য! গতকালের লাশটা আবার ঘাটে লেগেছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কেন যেন তাকে পাগল পাগল মনে হলো। কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ করলাম না। বরং চেহারায় আরও গাম্ভীর্য টেনে এনে বললাম–কালকের মত আবার ওটাকে ভাসিয়ে দাও। আর কোন খোঁজ নিলাম না। পরদিন সকাল সকাল অফিসে গেলাম। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে সময় ছিল না। তাই কী আর করা? বসে বসে আমার স্ত্রীর জন্য কলকাতা থেকে ভি.পি যোগে পাঠানো শরৎ চ্যাটার্জীর একটা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। বইটা গতকাল এসেছে, কিন্তু ভুলবশত অফিসে ফেলে গিয়েছিলাম। এমন সময় সেই সেপাই আবার আসল এবং বলল–এক অদ্ভুত ঘটনা, স্যর! ওই লাশটা আবার ঘাটে এসে ঠেকে আছে। আমি তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালাম। বললাম–চল, লাশটাকে আমি দেখতে চাই।

ঘাটে গেলাম। দেখি–উপুড় হয়ে পানির মাঝে আধডোবা এক মৃতদেহ। ওপরে কোন ক্ষত দেখতে পেলাম না। পরনে পাতলা সাদা কাপড়ের পাঞ্জাবী, একই রঙের ধুতি। পানিতে বেশ কিছুক্ষণ আগে লাশটা পড়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিন-চার দিনের পুরানো লাশ বলে মনে হলো না। তাকে বললাম–তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ। কিন্তু কিছুতেই সে তা স্বীকার করতে চাইল না। আমি বললাম–একই রকম পোশাক দেখেছ বলেই বোধহয় তোমার এই ভুল হয়েছে। তারপর আমি নিজে উপস্থিত থেকে লাশটাকে একেবারে নদীর মাঝখানে ভাসানোর ব্যবস্থা করলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না লাশটা চোখের দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেল। তবে একথা আজ স্বীকার করছি যে, লাশটা দেখার পর আমার মনের মাঝে অনেক চিন্তাই এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, কিন্তু একথা আমি মানতে পারছিলাম না যে, এ মৃতদেহ মহামারীতে আক্রান্ত কোন মানুষের।

পরদিন আবার অফিসে বসেই খবর পেলাম এক লাশ ঘাটে এসে ঠেকেছে। এবার আর সেই সেপাইটা খবর নিয়ে আসেনি। খবর নিয়ে এসেছে আমার সহকারী নওশাদ। সে নিজের চোখে লাশটা দেখেছে।

নতুন চাকুরিতে ঢুকেছে। তদন্তের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সে এই লাশ নিয়ে তদন্ত করতে চায়। তবে প্রথমে আমার একটু থাকা দরকার। যদি কোন পয়েন্ট ভুলক্রমে ছেড়ে আসে–তা ধরিয়ে দেবার জন্য। তার উৎসাহে আমি বাধ্য হয়ে ঘটনাস্থলে গেলাম, কিন্তু সাথে সাথে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কী করে গতকাল যে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছি তা আবার স্রোতের বিপরীতে এসে ঘাটে ঠেকে। আমি সেই সেপাইটাকে ডাকলাম। সে আসল এবং জানাল–স্যর, আজও আমি লাশ দেখেছি। কিন্তু কিছু বলিনি। কারণ এ লাশের সাথে ভূত জড়িয়ে আছে, স্যর। আপনারাও কিছু করতে যাবেন না। এই লাশ নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করলে ভূতরা অখুশি হবে–তাতে খুব ক্ষতি হবে, স্যর। সব শোনার পর নওশাদ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, একটি মৃতদেহ নিজে একই জায়গায় বারবার চলে আসছে। কিন্তু আমার দুইদিনের ঘটনা যখন ব্যাখ্যা করলাম, তখন বিশ্বাস করল। সাথে সাথে সেই সেপাই, যার নাম বিপুল সাহা, তাকে জেরা করা হলো। নওশাদের জেরার মুখে বিপুলকে ভড়কে যেতে দেখলাম। আমি নওশাদকে থামতে নির্দেশ দিলাম। আর বিপুলকে বললাম–লাশ উঠিয়ে চারদিকে কাপড়ের ঘেরা দেবার ব্যবস্থা কর। আর দেখিস পাবলিক যেন ভিড় না করতে পারে।

অফিসে আসলাম। তারপর নওশাদের সাথে আলোচনায় বসলাম। নওশাদ বলল–বিপুলই পরপর তিনদিন আপনার কাছে ওই লাশের খবর এনেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে লাশের ব্যাপারে ওর একটা আগ্রহ আছে। কিন্তু যখন আমরা লাশটা উঠিয়ে তদন্ত করতে যাচ্ছি তখন ও ভূতের ভয় দেখিয়ে তদন্ত করতে নিষেধ করছে। আমার মনে হয় ওকে চাপ দিলে আরও কিছু বেরুবে। আমি বললাম–তুমি ঠিকই বলেছ–বিপুলকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, কিন্তু সেসময় এখনও আসেনি। আমাদের জানা দরকার–এটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মৃত্যু। যদি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় অথবা যদি খুন হয় তা হলে খুনের মোটিভটা কী? আর সেই কারণে, মৃত ব্যক্তির

পরিচয় জানা দরকার। নওশাদ বলল–তা হলে কী করব, স্যর? আমি বললাম–চৌকিদার, দফাদারদের খবর দাও। তারা লাশটাকে চিনতে পারে কি না দেখা দরকার। ও অফিস থেকে বেরিয়ে গেলে আমি লাশের কাছে গেলাম। পোশাক–পাঞ্জাবী, ধুতি আর গেঞ্জি। ধুতির তলে হাফপ্যাণ্টমত এলাস্টিকের কোমরওয়ালা সাদা শর্টস্। কোমরে মোটা কালো সুতো বেল্টের মত করে রয়েছে। আর সেই সুতোর সাথে ধুতিটা খুব কায়দা করে পরা বলেই কোমর থেকে ধুতি খসে যেতে পারেনি। তবে পোশাক ভিজে সপ্সপে হয়ে গেছে। সারা গায়ে শুধু বালি আর বালি। পেটের কাছে পোশাকটা ছেঁড়া। আর সেখানে বেশ বড় গর্ত মত এক ক্ষত। ছেঁড়া কাপড় আর ক্ষতটা দেখে মনে হলো ধারাল জিনিস দিয়ে বেশ জোরের সাথে আঘাত করা হয়েছে। মাথার কাছে কপালে এক কালসিটে দাগ্ দেখলাম।

এক চৌকিদার লাশটাকে চিনতে পারল। সে জানাল, মৃত লোকটির নাম রথীন্দ্রনাথ সাহা। তার নিজের গ্রামের বাসিন্দা সে। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। চৌকিদার আরও জানাল, রথীন্দ্রনাথ পাঁচদিন থেকে নিখোঁজ, তার স্ত্রী সন্তানরা তার খোঁজ করেছিল। কিন্তু তারা খুব উদ্বিগ্ন হয়নি; কারণ লোকটি ছিল শিল্পীমনা এক যাত্রা পাগল মানুষ। যাত্রাদলে অভিনয় করত। সেই কারণে মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে সে উধাও হয়ে যেত। আবার হয়তো দুই এক মাস পর বাড়ি ফিরে আসত। এটা স্ত্রী সন্তানের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমিজমাতে তার সংসার ভালই চলত। এমনি খুব নিরীহ ও গোবেচারা টাইপের মানুষ ছিল সে। কোন সময়ই কারও সাথেও থাকত না পাঁচেও থাকত না। এরকম নির্বিরোধী লোক কারও হাতে খুন হতে পারে ভাবাও যায় না। তার গ্রামটি থানা থেকে দশ মাইল পুব দিকে। তার স্ত্রী-সন্তানদের খবর দেয়া হলো। তারা এসে লাশটাকে সনাক্ত করল। তারপর ইন্‌কোয়েস্ট রিপোর্ট আর চালান প্রস্তুত করে মহকুমা সদরে ময়না তদন্তের জন্য লাশটিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী জানাল, নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তার

খুড়তত ভাই-এর সঙ্গে রথীনের খুব ঝগড়া হয়েছে। কারণ রথীনের খুড়তত ভাইটা পাঁড় মাতাল, অকর্মণ্য লোক। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে বেড়ায় আর সারাদিন মদের আড্ডায় সময় কাটায়। সংসার যে তার কীভাবে চলছে—এ খবর সে কোনদিনই নিত না। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ নিজের সংসারের ব্যাপারে অমনোযোগী হলেও তার ভাই-এর সংসারের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিত এবং যথাসাধ্য সাহায্যও করত। এ নিয়ে অবশ্য অন্য কারও মাথাব্যথা না থাকলেও দুষ্ট লোকেরা তার ভাই-এর সুন্দরী বউয়ের দিকে ইঙ্গিত করে হাসাহাসি করত। কিন্তু কোন সময়ই মানুষ স্পষ্ট কোন প্রমাণ আজতক পায়নি।

ঘটনার দিনটি ছিল রথীন্দ্রনাথের নিখোঁজ হবার আগের দিন। হাটবার। লক্ষ্মীপুরের হাট কেবলই জমতে শুরু করেছে। এসময় মদ খেয়ে তার ভাই বোতল হাতে করে বেরিয়েছে। ঠিক তখনই রথীন্দ্রনাথের মুখোমুখি। নেশাখোর মানুষ বলে টাকার অভাব তার লেগেই থাকে। তাই বোধহয় সে টলতে টলতে রথীন্দ্রনাথের কাছে টাকা চায়। মাতাল অবস্থায় এমনভাবে টাকা চাওয়াতে রথীন্দ্রনাথের মেজাজ যায় চড়ে। সে খুব জোর গলায় বলে উঠে—এত লোকের সামনে মাতাল হয়ে টাকা চাইতে লজ্জা করে না তোর!

সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো গলায় উত্তর দেয় ভাই—আরে, রাখ্ তোর লজ্জা! অমন খাসা একখান জিনিস দিয়ে রেখেছি, আর তুই টাকা দিবি না!

হৈ চৈ শুনে হাটের অনেক লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। এত লোকের সামনে লজ্জায় রাগে রথীন্দ্রনাথের চেহারা লাল হয়ে যায়। এবং সেও প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে তার ভাইয়ের গালে এক থাপ্পড় মেরে বসে। এতে তার ভাই বোতলটি ভেঙে রথীনকে আঘাত করতে এগিয়ে আসে। লোকজন তাকে ধরে ফেলে। রথীন্দ্রনাথ সরে যায়, আর তার ভাই চিৎকার করতে থাকে—তোকে আমি দেখে নেব রে শালা, এ মদের বোতল দিয়েই তোকে খুন করব। তুই আমার ঘরে আগুন লাগিয়েছিস।.

রথীন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছে জানবার পর, চৌকিদারের মুখ থেকেও

ঘটনাটি শুনলাম। একই রকম ঘটনা শুনে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে নিলাম। নওশাদ বলল—স্যর; এখনই লক্ষ্মীপুর যাওয়া দরকার। রথীনের ভাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আর একজন সাক্ষী পেলেই আমরা তার অপরাধ কোর্টে প্রমাণ করতে পারব।

আমি বললাম—যাও, তবে ওকে বোধ হয় আর ধরতে পারবে না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম—আমিও তোমার সাথে যাব। সে বলল—কেন, স্যর? আমি একাই ওকে ধরতে পারব।

আমি বললাম—আমার যাওয়া দরকার। কয়েকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। খুনের মোটিভটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

সে বলল—এখানে তো কোন রহস্য নেই, স্যর! রথীনের ভাইকে ধরতে পারলেই সব জট খুলে যাবে। তখন শুধু দরকার হবে একজন সাক্ষীর।

আমি বললাম—তাকে ধরা জরুরী, তবে আমার মনে হয় তাতে সমস্যার সমাধান হবে না।

আমি আর আমার জুনিয়র ঘোড়ায় চেপে রওনা হলাম। দ্রুত যেতে পারলাম না। কারণ একজন সেপাই আর চৌকিদার আমাদের ঘোড়ার সামনে হাঁটছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। গ্রামের মাতব্বর সহ বেশ ক'জন লোক আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। তারা বলতে লাগল—বাবু, রথীনকে খুন করেছে তার ভাই। ও সব পারে। যেই বললাম—তোমরা কেউ সাক্ষী হবে? অমনি সবাই আমতা আমতা করতে লাগল—আমরা তো দেখিনি বাবু, শুধু শুনেছি। আমি বললাম, তা হলে কে দেখেছে, তাকে ডাক। ওরা বলল—কালু ডোমের ছেলে যতীন দেখেছে, বাবু। সবাই ওরা প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে আসল যতীনকে। হালকা পাতলা গড়ন, নিরীহ চেহারা যতীনের, বয়স হবে বছর পঁচিশেক। সবাই তাকে চেপে ধরেছে বলার জন্য যে রথীনের ভাই-ই রথীনকে খুন করেছে। সে ভয়ে তখন কাঁপছিল।

আমি বললাম—তোমার কোন ভয় নেই। তুমি সাক্ষী হও।

অনেক অনুরোধের পর সে মুখ খুলল। এবং বলল, সে খুব ভাল

বাঁশী বাজাতে পারে। আর রথীন্দ্রনাথই তাকে যাত্রাদলে সুযোগ করে দেয়। এই কারণে সে রথীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল, তাকে শ্রদ্ধা করত। প্রায় সাথে সাথেই থাকত। ভাই-এর সাথে ঝগড়ার দিনও সে রথীন্দ্রনাথের সাথেই ছিল। সেও রথীনের ভাইকে রুখতে এগিয়ে যায় সেদিন। ফলে রথীনের ভাই তাকেও খুব শাসিয়েছিল। সে বলল—এর বেশি আমি কিছু জানি না, বাবু।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। যতীন ও অন্যান্য লোকের সহায়তায় আমরা রথীন্দ্রনাথের ভাই-এর বাড়ির দিকে এগুতেই সবাই হৈ চৈ করে উঠল—ওই যে রণেশ যাচ্ছে! রণেশ রথীন্দ্রনাথের সেই ভাই-এর নাম। সুতরাং আমি থামার জন্য তাকে আদেশ করলাম। পুলিশ দেখে সে বেশ হকচকিয়ে গেছে। সেটা মুহূর্তমাত্র, তারপর একটুও দেরি না করে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। নওশাদ আর সেপাইটা পিছু নিল তার। টর্চ নিয়ে এগুতে এগুতে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল—রণেশ লোকটা বড়ই ঘুঘু স্যর, নদী সাঁতরে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসে গেল। ডাক্তার মত দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম কোন ভারি শক্ত জিনিস দিয়ে কপালে আঘাত করা হয়েছে। এতে করে মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। আর পেটে কাঁচ জাতীয় ধারাল জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। যার কারণে পেটের মাংসপেশী ও ইনটেসটাইনে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণই মৃত্যুর কারণ। লাশের ক্ষতস্থানে ছোট ছোট কাঁচের টুকরা পাওয়া গেছে। কেমিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে—ইনটেস্টাইনে অ্যালকোহল জাতীয় কোন দ্রব্য নেই, তবে কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়ামের উপস্থিতি রয়েছে।

একমাস গত হয়ে গেছে। রণেশকে ধরতে পারিনি। তাই সিদ্ধান্তও নিতে পারছিলাম না যে কী করে মদের বোতলে কেরোসিন এল। এর মধ্যে নওশাদ একদিন খবর নিয়ে এল, বিপুল সাহার সঙ্গে রণেশের পরিচয় ছিল। সে তার বাড়িতে বেড়াতেও গেছে। আমি বিপুলকে ডেকে পাঠালাম। চাকুরির ভয় দেখিয়ে, প্রমোশনের লোভ

দেখিয়ে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম। সে তো পা ধরে কান্না শুরু করে দিল। তার একই কথা–রণেশের বউ আমার দূর সম্পর্কের মাসী হয়; তার বাড়িতে আমি জীবনে একবারই গেছি। রণেশের পরিচয় থাকলেও, তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, স্যর। আর রথীন্দ্রনাথকে আমি জীবনেও দেখিনি।

হঠাৎ একদিন এক মহিলা থানায় এসে উপস্থিত। কথাবার্তায় তাকে বেশ সভ্য শিক্ষিতই মনে হলো। মহিলাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে জানাল–আমি যতীনের স্ত্রী, আমার স্বামী সাতদিন থেকে নিখোঁজ। নওশাদকে ডায়েরী করিয়ে নিতে বললাম। খুব চিন্তার মধ্যে পড়লাম। নওশাদ বারবার বলতে লাগল–রণেশকে ধরতে পারলে যতীন আর নিখোঁজ হত না।

পরের দিন খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যতীনের স্ত্রীর লাশ নাকি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে গেলাম, দেখলাম সুইসাইডের সব আলামতই আছে, সঙ্গে সংক্ষিপ্ত হ্যাণ্ডনোট–আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সব ব্যাপারগুলো এক সঙ্গে কেমন জট পাকিয়ে গেল।

অনেক গুপ্তচর লাগালাম–কড়া নির্দেশ দিলাম যে করেই হোক রণেশকে খুঁজে বের করো। তার সাথে যতীনকেও খুঁজে বের করতে বললাম। আমার বিশ্বাস ছিল–যতীন মারা যায়নি। কারণ যতীন যদি সত্যি সত্যি মারা যেত তা হলে অবশ্যই তার লাশ কোথাও না কোথাও পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা তা পাইনি।

হঠাৎ এক রাতে বিপুল নিখোঁজ হলো। আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু পরদিন ভোরে এসে আমার ঘুম ভাঙাল সে। জানাল রণেশের বাড়ি গিয়েছিল, কৌশলে তার খোঁজ নিতে। খোঁজ নিয়েও এসেছে। তার কথামত নওশাদকে পাঠালাম। সে বান্দাইখাড়া জেলে পাড়া থেকে রণেশকে সত্যি সত্যি ধরে আনল। কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার করল না যে সে রথীনকে খুন করেছে। তার কথা–বাবু, আমার ভাইকে আমি খুন করিনি। আমার ভাই খুব ভাল লোক। আমি

রাগলে ওইরকম খুন তো অনেককেই করতে চাই। কিন্তু জীবনে কাউকে খুন করিনি। যতীনের ব্যাপারেও সে কিছুই স্বীকার করল না। মহাভাবনায় পড়ে গেলাম। কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছিলাম না।

কয়েকদিন পর এক চৌকিদার খবর আনল, হামিদপুরের হাটে সে নিজের চোখে যতীনকে দেখেছে। আমার জুনিয়র তখন থানায় ছিল না। আমি রাতের বেলায়ই কয়েকজন সেপাইসহ হামিদপুরে উপস্থিত হলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই তারা জানাল বাগদী পাড়ায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে। তাকে আমরা সত্যি ওখানে পেয়ে গেলাম। আমাদেরকে দেখে হাউমাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং পা জড়িয়ে ধরে বলল—বাবু, আমাকে ফাঁসি দিন। আমিই রথীনদাকে খুন করেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন এ কাজ করতে গেলে?

সে যা বলল—আমি মূর্খ মানুষ। বাঁশি বাজাতাম। যাত্রাদলে ঢুকতে খুব ইচ্ছে করত। কিন্তু কোন সুযোগ পেতাম না। সবাই বলত, রথীনদাকে ধরলে সে সুযোগ করে দিতে পারবে। আমি রথীনদাকে বলতেই সে বলল, আমি যদি পদ্মকে বিয়ে করি তা হলে সে সুযোগ দেবে। পদ্ম শিক্ষিতা মেয়ে, আমি তার যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু যাত্রায় সুযোগ পাওয়ার লোভে অত চিন্তা না করে বিয়ে করে ফেললাম। কিন্তু আমি খুব অসুখী ছিলাম। কারণ পদ্ম ভালবাসত রথীনদাকে। আমি তা জানতাম না। ঘটনার দিন আমি বাড়ি গিয়ে দেখি পদ্ম খুব সেজেছে। আমাকে দেখে খুব হকচকিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—কার জন্য সেজেছ সুন্দরী? সে খুব রেগে গেল। মূর্খ, মাতাল, লম্পট ইত্যাদি বলে গালি দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক চড় বসিয়ে দিই। কাঁদতে কাঁদতে সে চিৎকার করতে থাকে যাকে ভালবাসলাম সে বউ ছেলে আছে বলে বিয়ে করল না, আর এক মূর্খের হাতে আমাকে গছিয়ে দিল, তাকেও ভালবাসতে পারলাম না।

একথা শোনার সাথে সাথে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পদ্মর বাবা যাত্রাদলের মালিক ছিলেন, হঠাৎ তিনি মারা যান। তারপর

পদ্মরা খুব অভাবে পড়ে। তখন রথীনদা যাত্রাদল কিনে নিয়ে মালিক হয়ে যান। কিন্তু তিনি পদ্মদের সংসারের ভারও নেন। সে সময় পদ্মর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু দুর্নামের ভয়ে তিনি তাকে বিয়ে না করে বিয়ে দেন আমার সঙ্গে। ঝগড়ার পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে মদের দোকানে যাই এবং প্রচুর মদ খাই। সেখানে রণেশ আমাকে শাসিয়ে দেয়–তোর রথীনদাকে সাবধানে থাকতে বলিস। তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলি, রথীনদাকে আমিই খুন করব। তারপর বাড়ি ফিরছিলাম। তখন সাঁজ পেরিয়ে গেছে। নদীর ধারে রথীনদার সাথে দেখা। তিনি হাতে এক বোতল কেরোসিন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। আমার মাতাল অবস্থা দেখে বকাবকি করতে লাগলেন। আমিও রেগে যাই। হঠাৎ তার হাত থেকে বোতল কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করি। সে অচেতন হয়ে পড়ে। তারপর ওই বোতল দিয়ে তাকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিই। পরে যখন সবাই রণেশকে সন্দেহ করতে লাগল, আমিও বাঁচার একটা পথ পেয়ে সবার মত বললাম সে-ই খুন করেছে। কিন্তু পরে আমার খুব খারাপ লাগছিল বলে পালিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রীও বুঝতে পেরেছিল যে রথীনদাকে আমিই খুন করেছি। সেও আত্মহত্যা করে।

আবার সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে–বাবু, আমার ফাঁসির হুকুম দিন। যার জন্য খুন করলাম সে তো আর নেই।

অতঃপর তাকে কোর্টে চালান করি। কিন্তু আজও আমি এ রহস্যের কোন কিনারা করতে পারিনি–কীভাবে স্রোতের বিপরীত দিকে এসে লাশটা বারবার থানার ঘাটে এসে ঠেকছিল। তা হলে কি ধরে নেব যে, রথীন্দ্রনাথের অতৃপ্ত আত্মা তার হত্যার বিচারের জন্যই লাশটাকে বারবার থানার ঘাটে নিয়ে আসছিল।

মোহসীন রেজা বায়রন

প্রেতাত্মা

ইংল্যাণ্ডের পুব উপকূলে ছোট্ট এক শহর সিবার্গ। পুব অ্যাংলিয়া নামে ডাকা হয় ইংল্যাণ্ডের এ অঞ্চলটিকে। বন্ধু হেনরী লণ্ডের সঙ্গে উনিশশো উনিশ সালে সিবার্গে ছুটি কাটাতে যাই আমি।

ভ্রমণার্থী তেমন একটা ছিল না সে বছর। হোটেলে আমরা ছাড়া আর একজন মাত্র পর্যটক। লোকটার নাম প্যাক্সটন। লম্বা ছিপছিপে এক যুবক। কোন কারণে উদ্বিগ্ন আর অসুখী যেন সে।

এক সন্ধেয়, হেনরী আর আমি বসে রয়েছি হোটেল লাউঞ্জে, ও এসে হাজির।

'মাফ করবেন,' বলল প্যাক্সটন, 'আপনাদের বিরক্ত না করে পারলাম না। মানে আমি বেশ একটু বিপদে পড়ে গেছি। কারও সাথে কথা বলা দরকার। আপনাদের কি সময় হবে?'

বসেই ছিলাম, তাই বললাম, 'খুব হবে। বসুন।'

'কদিন আগে,' বিনা ভূমিকায় বলতে শুরু করল প্যাকস্টন, 'হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেস্টনে যাই আমি। গ্রামটা এখান থেকে পাঁচ মাইলের মত। সাথে ক্যামেরা ছিল আমার। ফ্রেস্টনের গির্জার দরজাটা আজব লাগে আমার চোখে। দরজায় তিনটে কাঠের মুকুট রয়েছে দেখে ছবি তুলতে যাই।

'পাদ্রী বেরিয়ে আসেন আমাকে ছবি তুলতে দেখে। দরজার মুকুটগুলোর কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করি আমি। তিনি শোনান অদ্ভুত এক কাহিনি।

'বহু বছর আগে,' বলে চলে প্যাক্সটন, 'অ্যাংলিয়া একটা রাজ্য ছিল। অ্যাংলিয়ার শেষ রাজা মারা গেছেন প্রায় হাজার বছর আগে।

তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর মুকুট তিনটাও উধাও হয়ে যায়। প্রজাদের বিশ্বাস ছিল ওগুলো জাদুর মুকুট। ওরা ধরে নেয় মুকুট তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় পুঁতে ফেলা হয়েছে। সাগর পাড়ি দিয়ে শত্রু এলে, তাদের বিরুদ্ধে দেশকে যাতে রক্ষা করতে পারে ওগুলো।

'প্রায় তিনশো বছর আগে, একটা মুকুটের সন্ধান মেলে। গোপনে বিক্রি করে দেয়া হয় ওটা–এরপর ওটার হদিস আর কেউ জানে না।'

'আর বাকি মুকুট দুটো?' হেনরী প্রশ্ন করে।

'দু'নম্বরটা সাগরে ভেসে চলে যায়-। আর পাওয়া যায়নি।'

'তিন নম্বরটা?' আমি রীতিমত উত্তেজিত। 'ওটা পাওয়া গেছে?'

'আসছি সে কথায়,' বলে প্যাক্সটন। 'এ রাজ্যে এজার নামে এক পরিবার ছিল। লোকে বিশ্বাস করত এজাররা তিন নম্বর মুকুটটা পাহারা দিয়ে রেখেছে। এজারদের শেষ বংশধর গত বছর মারা গেছে। তার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চার্চ ইয়ার্ডে তার কবর খুঁজে পাই আমি–তার স্মৃতিস্তম্ভে লেখা কথাগুলো টুকে নিই আমি।

উইলিয়াম এজার
মৃত্যু: ২১ ডিসেম্বর ১৯১৮
বয়স: ২৮ বছর

'পরে, প্রেস্টনের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকানটায় যাই। কপালগুণে সতেরোশো চল্লিশ সালের প্রাচীন এক বই পেয়ে যাই ওখানে। ওটার ভেতরে একথাগুলো লেখা ছিল:

'আমার নাম নাথনিয়েল এজার,
আমি ওই পাহাড়টার মালিক,
এজার বংশের দায়িত্ব একটাই,
রাজ্য রক্ষাকারী মুকুটটিকে পাহারা দান,
মরণের পর যখন কবরে যাব,
দেহের হাড় যখন পচে যাবে,
সন্তানদের মাঝে বেঁচে থাকব তখনও,
তারা আমাকে ভুলবে না।'

'বইটা কিনে নিয়ে সিবার্গের দিকে হাঁটা দিই। উইলিয়াম এজার যে বাড়িতে বাস করত সেটা খুঁজে বের করি। ফ্রেস্টন আর সিবার্গের মাঝামাঝি এক জায়গায় ওটা।

'বাড়িটা ছোট এক পাহাড়ের নীচে। চূড়াটা গাছ দিয়ে ঘেরা। দেখামাত্র বুঝে ফেলি এটাই সেই জায়গা।'

'কীসের জায়গা?' জবাব চাই আমি। ওর দীর্ঘ কাহিনি শুনতে শুনতে আমরা দু'বন্ধু ক্লান্তি বোধ করছি।

'যেখানে তিন নম্বর মুকুটটা পুঁতে রাখা হয়,' বলে প্যাক্সটন। তারপর আমাদের চমকে দিয়ে আরও জানায়; এবং জিনিসটা এখন আমার ঘরে। দেখবেন চলুন।'

ওর কথা আমাদের বিশ্বাস হলো না। ফলে নিজেরা যাচাই করার জন্যে, চেয়ার ছেড়ে প্যাক্সটনের পিছু নিলাম।

ওর ঘরে নিয়ে গেল প্যাক্সটন। একটা সুটকেস খুলতে ভেতরে ঘরের কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস দেখা গেল। মোড়ক খুলতে দেখি সত্যিই একটা মুকুট!

মুকুটটা রুপোর তৈরি। চারটে রত্নখচিত গোলাকার এক ধাতব বস্তু। হাত বাড়ালাম আমি ওটা ছুঁয়ে দেখার জন্যে।

'ছোঁবেন না!' চেঁচিয়ে উঠে মুকুটটা সরিয়ে নিল প্যাক্সটন।

'কেন, নিয়ে নিচ্ছি নাকি?' ঈষৎ ক্ষুব্ধ হই আমি।

'কিছু মনে করবেন না,' বলল প্যাক্সটন। 'এমন করার কারণ...' অদ্ভুত চাহনি বুলাল সে গোটা ঘরে। 'এটা হাতে পাওয়ার পর থেকে আর একা নই আমি।'

'মানে?' হেনরী জিজ্ঞেস করে।

আরেকটু খোলসা হয় এবার প্যাক্সটন।

'এজারের বাড়ি থেকে সোজা এখানে আসি আমি। সন্ধের পর, কোদাল আর লণ্ঠন নিয়ে ফিরে যাই ওই পাহাড়টায়। চূড়ায় একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করি, গাছের ঘেরের ঠিক মধ্যখান বরাবর।

'যেই খুঁড়তে আরম্ভ করলাম,' কথার খেই ধরে প্যাক্সটন, স্পষ্ট টের পেলাম কে যেন লক্ষ করছে আমাকে। একবার তো মনে হলো,

তাকে দেখলামও বুঝি। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। লোকটা আমার পেছনে ছিল, কখনোই সামনে আসেনি।

'কোটে একবার টানও পড়ল। ঠিক তখনই মুকুটটা খুঁজে পাই, আর পরমুহূর্তে পেছন থেকে শুনি রক্ত হিম করা এক চিৎকার।

'চিৎকারটা কে দিল?' প্রশ্ন করি আমি।

'কাউকে দেখতে পাইনি,' জবাব দিল প্যাক্সটন। 'কিন্তু অনুমান করতে পারি।' বিছানার পাশে টেবিলে রাখা প্রাচীন একটা বইয়ের দিকে আঙুলের ইশারা করল ও। 'এঘরে যখনই এসে ঢুকি, দেখি বইটা খোলা রয়েছে।'

টেবিলের দিকে চাইলাম আমি। প্রথম পৃষ্ঠাটা খোলা। নামটা পড়া গেল–উইলিয়াম এজার ১৮৯০।

'আপনার ধারণা উইলিয়াম এজার আপনাকে অনুসরণ করছে?' বললাম আমি। 'কিন্তু সে তো কবেই মরে গেছে।'

'কিন্তু তার ভূত আমার পিছু ছাড়ছে না। মুকুটটা তার চাই। অথচ কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা নেই।'

'আপনি কী করবেন ওটা দিয়ে?' জানতে চাইলাম।

'যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসব। তাতেই যে উইলিয়াম এজারের ভূত আমাকে ক্ষমা করে দেবে, হলফ করে বলা যাচ্ছে না।'

লোকটা ভয়ানক আতঙ্কিত।

'বেশ তো, আজ রাতে আমরাও না হয় আপনার সাথে যাব,' প্রস্তাব করলাম ওকে সাহস জোগাতে।

আমি কথা বলছি, একটা ছায়া নড়ে উঠল কামরার ভেতর। ওটা লক্ষ্য করে মুখ পাংশু হয়ে গেল প্যাক্সটনের।

সে রাতে, হোটেল ত্যাগ করার সময়, হোটেল পোর্টারের সঙ্গে একা কথা বললাম আমি। 'আমাদের ফিরতে দেরি হতে পারে,' জানালাম।

'আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব, স্যার,' বলল পোর্টার। 'সদর দরজা খুলে রাখব। ওই ভদ্রলোক হোটেলে থাকছেন বুঝি?'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে, মি. প্যাক্সটনের সাথে যিনি থাকেন।'

'না,' চট করে জবাব দিলাম আমি। পোর্টারের কথাটা অন্যদের বললাম না। কিন্তু আমি নিজেও তো দেখেছি ওটাকে। আমাদের তিনজনের সাথে, প্যাক্সটনের ঘরে, আরেকটা লোক ছিল।

আধ ঘণ্টা লাগল উইলিয়াম এজারের বাড়ি পৌঁছতে। সাগরতীর ঘেঁষে গিয়েছে রাস্তাটা। জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই আশপাশে।

পাহাড়টা চোখে পড়ল আমাদের। সাগর শান্ত। পাহাড়ী গাছ-গাছালির পেছন থেকে আলো বিলাচ্ছে চাঁদ।

পাহাড়ে উঠে এলাম আমরা। ভুল করে সাথে কোদাল আনা হয়নি। তবে পরোয়া করল না প্যাক্সটন। হাত ব্যবহার করে মাটি খুঁড়তে লাগল।

গর্ত খোঁড়া হলে পর, তার ভেতর মুকুটটা রেখে দিল সে। তারপর ঢেকে দিল মাটি দিয়ে।

'তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম,' বলল গলা চড়িয়ে। 'এবার আমাকে ক্ষমা করো, উইলিয়াম এজার, শান্তিতে থাকতে দাও।'

কোন শব্দ নেই। কিন্তু প্যাক্সটন আমাদের দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'ও বলছে– "কখনও না"।'

প্যাক্সটনকে ফিরিয়ে আনলাম হোটেলে। মাটিতে চোখ রেখে, নীরবে হেঁটে এসেছি তিনজনে।

'ভয় পাবেন না,' সান্ত্বনা দিলাম আমি। 'কাল দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনাকে লণ্ডনের ট্রেনে তুলে দেব আমরা। ট্রেন ছেড়ে দিলে দেখবেন কোথায় চলে গেছে সব দুশ্চিন্তা।'

'ও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না,' সুনিশ্চিত ঘোষণার মত শোনাল ওর কথাগুলো।

পরদিন সকাল সাতটাও বাজেনি, হেনরী ঘুম থেকে জাগাল আমাকে।

'চলো নাস্তা সেরে নিই,' দরজার ওপাশ থেকে বলল। 'তারপর প্যাক্সটনকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।'

কিছুক্ষণ পরে, তৈরি হয়ে নেমে এলাম নীচে। হেনরী অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

'প্যাক্সটন কোথায়?' প্রশ্ন করলাম।

'ঘরে নেই,' জানাল সে। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমার ঘরে গেছে বুঝি।'

তাড়াহুড়ো করে পোর্টারের কাছে গেলাম দু'জনে।

'মি. প্যাক্সটনকে আজ সকালে দেখেছেন?' জবাব চাইলাম আমি।

'জ্বী, স্যর,' বলল লোকটা। 'এই তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। কেন, স্যর, আপনার সাথেই তো গেছেন।'

'আমার সাথে?' বিস্ময়ে বিস্ফারিত আমার চোখ।

'জ্বী, স্যর,' বলল পোর্টার। 'আপনি হোটেলের বাইরে থেকে ডাকলেন না ওনাকে? কাগজ পড়ছিলাম, চোখ তুলে দেখি আপনি দাঁড়িয়ে।'

আমার মুখে কথা জোগাল না।

'গতকাল আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটেছে ফ্রেস্টনে,' বলল পোর্টার।

'কী ঘটনা?'

'গির্জায় একটা কবর হঠাৎ করে খুলে গেছে,' বলল লোকটা। 'আর লাশ বেমালুম হাওয়া।'

'কার কবর ওটা?'

'উইলিয়াম এজার নামে এক লোকের।'

হেনরী আর আমি দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। সৈকত ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে প্যাক্সটন। কার উদ্দেশে যেন হাত নাড়ছে। কে লোকটা বুঝতে পারলাম না। সাগর থেকে ঘন কুয়াশা উঠে আসছে।

প্যাক্সটনের পেছনে ছুটছি, কুয়াশা ঘন হলো আরও। ক'মুহূর্ত বাদে, ওকে আর নজরে এল না। কিন্তু ওর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে ভেজা বালির বুকে। জুতোর চিহ্ন স্পষ্ট সৈকতে।

বালিতে আরও কার যেন পদচিহ্ন ফুটে উঠেছে। এর পায়ে জুতো নেই। ছাপগুলো বড় অদ্ভুত। পায়ের পাতা রয়েছে–কিন্তু মাংস

নেই–কেবলই হাড়।

নাম ধরে ডাকলাম প্যাক্সটনকে। ও-ও পাল্টা ডাকল বলে মনে হলো। একটু পরে দীর্ঘ, পিলে চমকানো এক আর্তচিৎকার কানে এল। কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ওই ভয়তাড়িত বীভৎস চিৎকার জীবনে ভুলব না আমি।

হেনরী আর আমি দু'জনেই ভয় পেয়ে জমে গেলাম। প্যাক্সটন যে অশরীরীটির খপ্পরে পড়েছে তার সাথে মোলাকাত করার ইচ্ছে কিংবা সাহস কোনটাই আমাদের নেই। আমরা দু'বন্ধুই বুঝে গেছি প্যাক্সটন আর এ জগতে নেই।

ধীর পায়ে আগে বাড়লাম আমরা। কয়েক গজ সামনে, প্যাক্সটনের দেহ পড়ে আছে লক্ষ করলাম। বালি আর পাথরে বোঝাই ওর মুখের ভেতরটা, ঘাড়টা ভাঙা।

কুয়াশার অন্তরাল থেকে হঠাৎ গা শিউরানো এক হাসির শব্দ ভেসে এল। কোন জীবিত মানুষ ওভাবে হাসতে পারে না। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল দু'বন্ধুর।

পুলিস অগুনতি প্রশ্ন করল আমাদের। তবে কে খুন করেছে প্যাক্সটনকে, বের করতে পারল না তারা। হেনরী আর আমি মুখ বন্ধ রাখলাম। পুলিস আমাদের পাগল ঠাওরাবে এব্যাপারে কিছু বলতে গেলে।

অ্যাংলিয়ার মুকুটটা দেখার জন্যে আর ফিরলাম না আমরা। ওটা নিরাপদে আছে। ওটার যক্ষ-উইলিয়াম এজারের পাল্লায় পড়ার কোন শখ নেই আমাদের।

মূল: এম. আর. জেমস
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

এরিক জানের সঙ্গীত

তন্ন তন্ন করে একটার পর একটা মানচিত্র ঘেঁটেও আমি খুঁজে পাইনি রু্য দ'সেই। এই মানচিত্রগুলো অবশ্য খুব একটা নতুন নয়, আর তা ছাড়া আমি জানি অনেক জায়গার পুরানো নামও বদলে গেছে। জায়গাটার পুরানো পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটতেও আমি তাই বাদ রাখিনি। অনেক জায়গায় সশরীরেও গিয়েছি। হোক না অন্য নাম, কিন্তু রু্য দ'সেই নামে যে রাস্তাটা আমি চিনতাম তার কোন হদিসই পেলাম না। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত, এত খোঁজ-খবর করেও সেই বাড়িটা বা রাস্তাটা, এমনকী সেই জায়গাটার পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ এই মাস কয়েক আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন আমি ওখানেই ছিলাম, ওখানেই আমি শুনেছিলাম এরিক জানের সঙ্গীত।

আমার স্মরণ শক্তি যে ঠিক আগের মত নেই, এটা খুব আশ্চর্যের নয়। কেননা ওখানে থাকবার সময় আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমি বেশ মনে করতে পারি আমার চেনা-জানার মধ্যে কাউকেই আমি রু্য দ'সেই এ নিয়ে যাইনি। কিন্তু এ রকম একটা জায়গা যে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এটাও ঠিক মেনে নেবার মত নয়। আমার খুব মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিলেই রু্য দ'সেই। আর একবার কাছাকাছি এসে পড়লে সেই অদ্ভুত জায়গাটা চিনতে না পারবার কোন কারণই নেই, বিশেষ করে যে একবারের জন্য হলেও ওখানে গেছে।

একটা ছোট্ট নদীর ওপারেই ছিল রু্য দ'সেই। নদীর পাড় ধরে ছিল সার সার ইঁটের তৈরি বিষণ্ন চেহারার সব গুদাম ঘর। একটা গাঢ়

রঙের পাথরে তৈরি সেতু নদীর এপার থেকে ওপারে গিয়ে পড়েছে। নদীর ধারটা সব সময়ই কেমন আঁধার আঁধার হয়ে থাকত। মনে হত আশপাশের এলাকার কলকারখানার কালো ধোঁয়ার মেঘ ইচ্ছে করেই যেন এখানটায় সূর্যের আলো আটকে দিচ্ছে। নদীটার অবস্থাও তথৈবচ। দূষিত কালো পানি আর বিকট ধরনের একটা দুর্গন্ধ। এমনটা আমি আর কোথাও দেখিনি। আর একদিন হয়তো এই দুর্গন্ধটাই আমাকে সাহায্য করবে জায়গাটা খুঁজে পেতে। সেতুটা পার হলেই একটা রেলিং দেওয়া পাথর বিছানো পথ ক্রমশ উপরে উঠেছে। প্রথম দিকে চড়াইটা অত বোঝা যায় না, কিন্তু আরেকটু এগোলেই পথটা যেন একটু বেশি মাত্রায় খাড়া হয়ে উপরে উঠছে, এমন মনে হবে। ঠিক এখান থেকেই রু্য দ'সেই রাস্তাটার শুরু।

এত সরু রাস্তা আমি আর কোথাও দেখিনি। রাস্তাটা এতটাই খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে যে কোন যানবাহনের পক্ষে এ রাস্তায় চলাচল করাই অসম্ভব। কোথাও কোথাও তো রীতিমত সিঁড়ি টপকেই উঠতে হয়। আইভিলতায় ঢাকা অনেক উঁচু একটা পাথরের দেয়ালে গিয়ে পথটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় বিছানো পাথরগুলো কোথাও কোথাও চৌকো, আবার কোথাও বা গোলাকার। কোথাও আবার মাঝে মাঝেই পাথরের আবরণ উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে, এখানে ওখানে প্রায়ই ধূসর সবুজ ঘাস, আগাছা বেয়াড়ার মত বেড়ে উঠেছে। পথের দু'ধারের বাড়িগুলো যেন প্রাগৈতিহাসিক কালকে মনে করিয়ে দেয়। এই সব প্রাচীন উঁচু উঁচু বাড়িগুলো কী এক বিচিত্র কারণে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে হেলে আছে। এমনও দেখা যায় পথের দু'ধারে মুখোমুখি দুটো বাড়ি পরস্পরের দিকে এতটাই ঝুঁকে এসেছে যে পথের উপর একটা বিচিত্র তোরণের মত হয়ে গেছে। এই উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর জন্যই বোধ হয় রাস্তাটা সব সময়ই আবছা আলো আঁধারিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

প্রথম প্রথম এখানে এসে লোকগুলোকেও কেমন অস্বাভাবিক লাগত। হয়তো লোকগুলো একটু বেশি রকম চুপচাপ আর কম কথা বলে তাই অমনটা মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য আবিষ্কার করেছিলাম

এখানকার বাসিন্দারা প্রায় সবাই বার্ধক্যের কোঠায়। ঠিক কীভাবে যে আমি এরকম একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারব না। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। আর্থিক অনটন এমন এমন সব বিচ্ছিরি জায়গায় আমাকে থাকতে বাধ্য করছিল আর এতবার ভাড়া মেটাতে না পারায় আমাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে যে সে রকম অবস্থায় কারও মাথা ঠিক থাকবার কথাও নয়। এখানেই আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো ব্ল্যান্ডটের বাড়িতে গিয়ে উঠি। রাস্তা শেষের আইভিলতায় ঢাকা খাড়া পাথুরে দেয়াল থেকে তিন নম্বর বাড়িটাই ব্ল্যান্ডটের। আর সব বাড়িগুলোর মত জীর্ণ আর পোড়ো গোছের হলেও এটাই ছিল এ রাস্তার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি।

পাঁচতলার একটা কামরায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হলো। বাড়িটা এক রকম ফাঁকাই। খুব বেশি লোক নেই, আর পাঁচতলার বাসিন্দা বলতে শুধু আমি। যেদিন আমি এখানে এসে উঠি সে রাতেই শুনলাম চমৎকার সুরে কেউ কোন একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। পরদিন বুড়ো ব্ল্যান্ডটের কাছে খোঁজ নিতেই জানা গেল একটা বাতিকগ্রস্ত জার্মান ভায়োল বাদক–চিলেকোঠার ঘরের একমাত্র বাসিন্দা। লোকটা বোবা, নিজের নাম স্বাক্ষর করে এরিক জান নামে। সন্ধ্যায় এখানকার একটা থিয়েটার অর্কেস্ট্রায় বাজাতে যায়। নিরালায় স্বচ্ছন্দের সাথে ভায়োল বাজাবার জন্য লোকটা চিলেকোঠার ঘরটা বেছে নিয়েছে। শুধু চিলেকোঠার বাসিন্দাই নয়, খোদ ঘরটিও যেন আমাকে টানতে লাগল। চিলেকোঠার ঘরের জানালা দিয়ে সেই আইভি ঢাকা দেয়ালের ওপাশটায় বিস্তীর্ণ শহরটাকে এত উপর থেকে দেখবার কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। সারা রু দ্য সেই-এ এই ভায়োল বাদকই একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পায়।

প্রতিরাতেই আমি এরিক জানের ভায়োল বাজানো শুনতাম। আমার ঘর থেকেই বেশ শোনা যেত সেই চমৎকার সুর লহরী। অদ্ভুত সুরটা যেন কিছুতেই ঘুমাতে দিত না। সঙ্গীত সম্পর্কে আমি একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু যে সঙ্গীত শুনছি তাকে এতদিন এখানে

ওখানে শোনা কোন ধরনের সঙ্গীতের সাথেই মেলাতে পারছি না। যেন অন্য কোন অজানা জগতের একটা দুর্বোধ্য ভাষা। পৃথিবীর কিছুর সাথেই যেন এর মিল নেই। কেমন একটা অসম্ভব পৃথিবী যেন ধ্বনিত হচ্ছে এই সুরে। কিন্তু মানতেই হবে অসাধারণ এই সুরের কারুকাজ। যতই শুনছি ততই এর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। ভায়োল বাদক সত্যিই একটা প্রতিভা এটা মানতেই হচ্ছে। এক সপ্তাহ পার না হতেই ঠিক করলাম শিল্পীর সাথে যে করেই হোক আলাপ করতে হবে।

এক রাতে এরিক জান যখন থিয়েটার থেকে ফিরছে তখনই তাকে ধরে বসলাম। বললাম তার সাথে আলাপ করতে চাই। ওর বাজানোর প্রশংসা করে এটাও জানালাম, ওর ঘরে বসে যদি একটু ভায়োল বাজানো শুনি নিশ্চয়ই তাতে ও আপত্তি করবে না।

মাথায় টাকপড়া ছোটখাট রোগাটে লোকটার শরীর অনেকখানিই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পরনের কাপড়চোপড়ও যেন জীর্ণতার শেষ সীমায়। আমার কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত চেহারা আর নীল চোখ জোড়ায় আতঙ্ক আর রাগ এক সাথে ফুটে উঠল। অমায়িক আচরণ দিয়ে অবশ্য লোকটাকে গলিয়ে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। লোকটা অবশেষে কেমন অনিচ্ছুক আর নিরুপায় ভঙ্গিতে আমাকে ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করতে। উৎসাহিত হয়ে আমিও লোকটার পিছন পিছন সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম।

লোকটার ঘরে আসবাব-পত্র বলতে বেশি কিছু নেই। সরু লোহার খাট, বইয়ের সেলফ, ঘরের কোণে ওয়াশবেসিন, তিনটে জরাজীর্ণ চেয়ার আর একটা ছোট লিখবার টেবিল। সারা মেঝেময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সঙ্গীতের স্বরলিপির কাগজ। দেয়ালের কাঠের উপর কোন কালেই রঙ চড়েনি। গোটা ঘরে ধুলো আর মাকড়সার জাল। এ ঘরে যে কেউ বাস করে এটা বিশ্বাস করাই কঠিন। বেশ বোঝা যাচ্ছে এরিক জানের আসল জগৎটা এই ভুতুড়ে পোড়ো ঘরটা ছাড়িয়ে কল্পনার কোন দূর নক্ষত্রমণ্ডলীতে অবস্থিত।

একটা চেয়ারের দিকে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে এরিক জান

কাঠের দরজাটা বন্ধ করল, তারপর হাতে করে নিয়ে আসা জ্বলন্ত মোমবাতিটার শিখা থেকে আরেকটা মোমবাতি ধরাল, যাতে আরও একটু আলো হয়। পোকায় কাটা কাপড়ের কভার থেকে বিশাল বেহালার মত বাদ্যযন্ত্রটা বের করে ঘরের সবচেয়ে নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে পড়ল। বাজাতে শুরু করবার পর খেয়াল করলাম লোকটা কোন স্বরলিপি দেখে বাজাচ্ছে না। সুরটা বোধহয় তার নিজেরই রচিত। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকলাম। শুধু চমৎকার বললে তার বাজানোর কিছুই প্রায় বর্ণনা দেওয়া হয় না। কিন্তু এই সঙ্গীতের বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। এরিক জান যেন তার সুর দিয়েই একটা জটিল নক্সা বুনে চলল। স্বীকার করছি এমন চমৎকার বাজানো আমি কমই শুনেছি, কিন্তু রোজ রাতে তাকে যে সুরগুলো বাজাতে শুনি এই সুর তার ধারে কাছে দিয়েও গেল না।

সেই অদ্ভুত সুরটা আমার মনে বেশ পাকাপাকি ভাবেই গেড়ে বসেছিল। অনেক সময় আমি কখনও গুনগুন করে, কখনও শিস দিয়েও সুরটা বাজাতে চেষ্টা করেছি। তাই যখন এরিক জান তার বাজানো শেষ করে ভায়োল আর ছড়টা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে তখনই ধরে বসলাম গতরাতে সে যে সুরটা বাজাচ্ছিল সেটাই এখন একবার বাজিয়ে শোনাক।

ভায়োল বাজাবার সময় তার চেহারায় যে নির্বিকার শান্ত একটা ভাব দেখা যাচ্ছিল তা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। প্রথমবার কথা বলবার সময় যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে আবার আতঙ্ক আর রাগ একসঙ্গে ফুটে উঠতে দেখলাম তার চেহারায়। যথেষ্ট অনুরোধ-উপরোধেও যখন কাজ হলো না, তখন নিজেই সেই অদ্ভুত সুরটা শিস দিয়ে বাজিয়ে তাকে শুনিয়ে উত্তেজিত করতে চাইলাম। কিন্তু সুরটা চিনতে পারামাত্র নিবাদ আতঙ্কে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। সে ক্ষিপ্রতার সাথে এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরেই ঝট করে জানালার দিকে তাকাল–যেন জানালা দিয়ে এক্ষুনি কেউ ঘরে এসে ঢুকবে। গোটা ব্যাপারটাই আমাকে এতখানি হতচকিত করে দিল যে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম।

লোকটার মাথায় ছিট আছে। সত্যিই আছে।

জানালার দিকে তাকাতেই আবার আমার সেই কৌতূহলটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সেই পাথরের দেয়ালটার ওপাশে পশ্চিম দিকে এত উপর থেকে জোছনা প্লাবিত শহরের দৃশ্যটা দেখবার এই সুবর্ণ সুযোগ আর কিছুতেই হাতছাড়া করতে মন চাইল না। জানালার দিকে এগিয়ে পর্দাটায় যেই হাত দেব, অমনি বোবা লোকটা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় খপ্ করে আমার হাতটা ধরে দরজার দিকে টানতে শুরু করল। কব্জির উপর মুঠোটা দারুণ শক্তভাবে চেপে বসেছে। লোকটা এবার সত্যিই খেপেছে। ওর নীল চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। এই ছিটগ্রস্ত লোকটার উদ্ভট পাগলামি কত আর সহ্য করা যায়।

কড়া গলায় ওকে আমার হাত ছাড়তে বললাম। বললাম এক্ষুনি আমি যাচ্ছি, এখানে থাকবার আর আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। আমার মেজাজ দেখেই বোধ হয় কব্জির উপর মুঠোটা আলগা হলো খানিকটা। ওর চেহারায়ও দেখলাম একটা কোমল ভাব ফিরে এসেছে। আমার কব্জির উপর এরিক জানের মুঠোর চাপ অনুভব করলাম আবার, কিন্তু এবার তাতে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণতা। আমাকে টেনে একটা চেয়ারে বসিয়ে সেই ছোট্ট টেবিলটায় গিয়ে বসে কী যেন লিখতে শুরু করল।

কাগজটা আমার হাতে দিতেই আমি ওটা পড়তে শুরু করলাম। ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে এরিক জান যা লিখেছে তা হলো, সে তার অদ্ভুত আচরণের জন্য সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী। বার্ধক্য, একাকীত্ব আর কিছু স্নায়বিক সমস্যা, যা তার সঙ্গীত ও অন্যান্য ব্যাপারের সাথে জড়িত, এ উদ্ভট আচরণের কারণ। আমি যে তার বাজনা শুনেছি এতে সে খুবই প্রীত এবং তার সঙ্গীত শুনতে মাঝে মাঝেই তার ঘরে আসতে পারি। কিন্তু সেই অদ্ভুত সঙ্গীতটা সে কোনক্রমেই শোনাতে রাজি নয়। অন্য কারও কাছ থেকে সেটা শুনতেও তার আপত্তি। ওর ঘরের জিনিস-পত্র অন্য কেউ স্পর্শ করুক, এটাও সে চায় না। আমার সাথে আলাপ হবার আগে তার ধারণাই ছিল না যে আমার

পাঁচতলার ঘর থেকে তার ভায়োল বাজানো শোনা যায়। তাই সে আমাকে অনুরোধ করছে ব্ল্যান্ডটকে বলে আমি যেন নীচের তলার কোন একটা ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা করি। অবশ্য এ বিষয়ে ভাড়ার বাড়তি অংশটুকু সে বহন করতে রাজি আছে।

ভাঙা ভাঙা আর প্রায় দুর্বোধ্য লেখাটি পড়তে পড়তে এরিক জান লোকটার জন্য কেমন মায়াই হলো। লোকটার মানসিক অবস্থা যে খুব সুবিধের নয় সে তো আর বুঝতে বাকি নেই।

হঠাৎ, সম্ভবত একটা উটকো দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে, বন্ধ জানালাটা ঝনঝন করে উঠল। এই আচমকা শব্দে আমরা দু'জনেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। আমি আর দেরি করলাম না, এরিক জানের হাতটা মুঠোয় ধরে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ঝাঁকি দিয়েই বিদায় নিলাম।

পরদিন ব্ল্যান্ডট আমাকে তিনতলার একটা বড় আর কিছুটা বেশি ভাড়ার একটা কামরা দিল। আমার ঘরের দু'পাশের কামরার ভাড়াটেদের একজন সুদের কারবারী আর আরেকজন চামড়ার ব্যবসায়ী। চারতলায় সে সময় কোন ভাড়াটেই ছিল না।

এটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না যে এরিক জান আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে তার কামরায় হানা দিলে অবশ্য সে তার ভায়োল বাজিয়ে শোনাতে আপত্তি করত না। কিন্তু তার আচরণে সেই প্রথম রাতের বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণতার কোন চিহ্নই ছিল না। তার বাজানোর মধ্যেও যেন কেমন একটা অনিচ্ছুক আর নিস্পৃহভাব প্রকট হয়ে থাকত। বোঝাই যাচ্ছিল আমার সঙ্গ সে ঠিক উপভোগ করছে না। সত্যি বলতে কি, আমাদের সম্পর্কটা একটা ভদ্রতাসূচক আলাপ পর্যন্ত গিয়েই থেমে পড়েছিল। তার সাথে দেখা হত কেবল রাতেই। দিনের বেলাটা সে ঘরেই ঘুমিয়ে কাটাত; সে সময় সে কাউকেই তার ঘরে ঢুকতে দিত না। তার এই শীতল আচরণের জন্যই তার সঙ্গে ভালমত আলাপের আগ্রহও আমার দমে গিয়েছিল। কিন্তু তার ওই চিলেকোঠার ঘরটা আর সেই অদ্ভুত আশ্চর্য সুরের সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কৌতূহল কেবলই বাড়ছিল। একদিন একটু দুঃসাহসী হয়ে চিলেকোঠার ঘরটা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায়

এরিক জান থিয়েটার অর্কেস্ট্রায় বাজাতে যায়, এই সুযোগটাই নিয়েছিলাম। অবশ্য কাজ হয়নি, এরিক জানের কাঠের দরজাটায় তালা ঝুলছিল।

একটা ব্যাপারে অবশ্য কোন বাধা ছিল না, আর তা হলো রোজ রাতে চুপি চুপি এরিক জানের সঙ্গীত শোনা। প্রথমটায় আমি পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই রহস্যময় সুরলহরী শুনতাম। পরে একটু সাহস করে পা টিপে টিপে সেই নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িগুলো টপকে একেবারে চিলেকোঠার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। রাতের পর রাত সুরটা যেন নেশার মত আমাকে পেয়ে বসছিল। শুনতে শুনতে মনে হত কোথাও যেন ভয়াবহ একটা কিছু গর্জে উঠতে চাইছে, ফেটে পড়তে চাইছে। কেমন একটা পিচ্ছিল গা শিউরে ওঠা একটা অনুভূতি আমাকে আলতো স্পর্শ করেই সরে যাচ্ছে। কোন মহাশূন্যের ভিতর যেন একটা নিরেট ভয় দানা বেঁধে উঠতে চাইছে। অথচ সেই মোহনীয় সুরগুলো কিন্তু আদতেই ভয়ঙ্কর ছিল না। মাঝে মাঝেই সুরের কারুকাজ এত দক্ষভাবে একটা জটিল নক্সা মত কিছু বুনে তুলতে চেষ্টা করত যে মনে হত একটা ভায়োল নয়, একাধিক ভায়োল পরস্পর আলাপ করছে। এরিক জান সত্যিই সুরের যাদুকর। সেই যাদু তার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে মোহগ্রস্তের মত আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখত। ক্রমে রাতের পর রাত এরিক জানের বাজনা যেন আরও উদ্দাম, আরও বন্য হয়ে উঠছিল। সেই অদ্ভুত সুরগুলোকে যেন কী এক উন্মাদনায় পেয়ে বসছিল। মনে হচ্ছিল স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের সীমারেখা কেউ গুলিয়ে দিতে চাইছে। এ সময় এরিক জানের দিকে তাকালে মনে হত ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর উপর দিয়ে। দিন দিন যেন আরও ন্যুব্জ, আরও ভেঙে পড়ছিল ওর শরীর। আমার সঙ্গে কথা বলা তো সে এক রকম বন্ধই করে দিল। সিঁড়িতে দেখা হলেও রূঢ়ভাবে এড়িয়ে যেত। আর ওর ঘরে ঢুকবার তো কোন সুযোগই আর থাকল না।

একরাতে ওর ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছি। সুরটা যেন ক্রমেই আরও উঁচু গ্রামে চড়ছে। ভায়োল বাদককে যেন

কী একটা উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে। খোদ বাদ্যযন্ত্রটাই যেন কোন এক ভয়ঙ্কর পরিণামের আশঙ্কায় আতঙ্কে চিৎকার করছে। কী একটা যেন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেটে পড়তে চাইছে। সেই ভয়াবহ তালগোল পাকানো আওয়াজটা পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শীর্ষে পৌঁছানো মাত্র বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে নাড়ী ছেঁড়া একটা ভয়ার্ত চিৎকার আমাকে জানিয়ে দিল আতঙ্কটা নেহাৎ সুরলহরী নয়, বরং ভয়ঙ্কর রকম বাস্তব। আমি পাগলের মত দরজায় আঘাত করলাম। ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ আসছে না। অজানা আশঙ্কায় আমার সারা শরীরে একটা কম্পন দেখা দিল।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন চেয়ার ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে মেঝে থেকে উঠবার চেষ্টা করছে। ভায়োল বাদক জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বুঝতে পেরে আবার নতুন উদ্যমে দরজায় ঘা দিতে শুরু করলাম, সেই সঙ্গে নিজের নামও চিৎকার করে জানালাম। শুনতে পেলাম এরিক জান টলমল পায়ে জানালার কাছে গেল। জানালাটা বন্ধ করবার শব্দ পেলাম। দরজাটা খোলামাত্র এরিক জান আমার পরনের কাপড়টা খামচে ধরে ফেলল। ঠিক যেমন ডুবন্ত মানুষ হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে। এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম আমাকে দেখে তার চেহারায় একটা অদ্ভুত স্বস্তির আর খুশির ছাপ দেখতে পেলাম।

এরিক জানের সারা শরীর তখনও থর থর করে কাঁপছে আমাকে একটা চেয়ারের দিকে ঠেলে দিয়ে সে নিজেও ধপ্ করে বসে পড়ল আরেকটায়। মেঝের উপর ভায়োল আর ছড়টা অনাদরে পড়ে আছে। এরিক জানের কিন্তু ওদিকে খেয়ালই নেই। নিরেট আতঙ্ক নিয়ে সে যেন কান খাড়া করে কিছু শুনবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো সে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উঠল। টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা কাগজে কিছু লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

আমি ওর হাত থেকে কাগজটা নিতেই সে আবার টেবিলটার কাছে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কী একটা লিখতে শুরু করল। কাগজটায় বেশি কিছু নেই, শুধু লেখা আছে সে তার মাতৃভাষা

জার্মানে এই রহস্যময় সঙ্গীত আর তার জীবনের আশ্চর্য বিস্ময়কর ঘটনাগুলো লিখছে এবং যতক্ষণ না লেখাটা শেষ হয় ততক্ষণ যেন আমি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

আমি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছি ওদিকে এরিক জান লিখেই চলেছে। কাগজের পৃষ্ঠাগুলো তার পাশে টেবিলের উপর স্তূপ হয়ে উঠছে।

আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার মাথার ভিতর সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এরিক জানের ছোট্ট শরীরটা ভয়ানক ভাবে কেঁপে উঠল। তার লেখা থেমে গেছে, দৃষ্টি পর্দা ঢাকা জানালাটার দিকে। মনে হলো সর্ব শক্তি দিয়ে কী একটা যেন শুনবার চেষ্টা করছে। আমিও যেন ক্ষীণ একটা বাজনার আওয়াজ পেলাম। আওয়াজটা যেন পশ্চিম দিক থেকে আসছিল। হয়তো দেয়ালের ওপাশটায় কাছেপিঠের কোন বাড়িতে কেউ কোন একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষীণ শব্দেই এরিক জানের প্রতিক্রিয়া হলো ভয়ঙ্কর। মুহূর্তের মধ্যে হাতের পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেঝে থেকে ছোঁ মেরে ভায়োল আর ছড়টা তুলে পাগলের মত বাজাতে শুরু করে দিল সে। রাতের নিস্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে বেজে উঠল বাদ্যযন্ত্রটা।

এই সঙ্গীত ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। একটা বিকট কোন কিছুর আতঙ্কে এরিক জানের চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাগলের মত বাজিয়ে সে যেন কোন একটা শব্দকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, চাইছে কোন একটা অশুভ আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখতে। ভয়ানক এই সুরটা আরও বন্য, আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এই বিশৃঙ্খল আর উন্মাদনার মধ্যেও এরিক জানের বিস্ময়কর প্রতিভা যেন অসংলগ্নতা এড়িয়ে আশ্চর্য চাতুর্যের সাথে নান্দনিকতাকে রক্ষা করে চলেছে। আমি সুরটা চিনতে পারলাম। থিয়েটারের জনপ্রিয় হাঙ্গেরীয় নাচের একটা সঙ্গীত বাজাচ্ছে সে। এই প্রথম আমি ওকে অন্যের সুর করা সঙ্গীত বাজাতে শুনছি।

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আরও উঁচুতে চড়ছে, আরও মাতাল হয়ে

উঠতে চাইছে। এরিক জানের শরীরটা বাঁদরের ক্ষিপ্রতায় মোচড় খাচ্ছে। ওর সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। বাজাতে বাজাতেও সে জানালার দিকে তাকাতে ভুলছে না। এই উন্মত্ত সঙ্গীতের মধ্যে আমি যেন দেখতে পেলাম কালো মেঘের গুচ্ছ কি এক ভয়াবহ আলামতে পাক খেয়ে উঠছে, তার ভিতরেই সরীসৃপসদৃশ বিকট চেহারার পিশাচেরা কী এক বীভৎস আনন্দে নেচে চলেছে। মাঝে মাঝেই সেই কালো মেঘের গুচ্ছের পেটের ভিতর থেকে এঁকেবেঁকে প্রচণ্ড জীঘাংসা নিয়ে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে। সেই সময়, ঠিক সেই সময়ই, শুনতে পেলাম আরেকটা তীক্ষ্ণ সুর, যা এরিক জানের ভায়োল থেকে নয়, আসছে জানালার বাইরে দেয়ালের ওপাশটা থেকে। সুরটা যেন সব রকম প্রতিরোধ চেষ্টাকে ঠাট্টা করছে।

হঠাৎ জানালাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। মনে হলো এরিক জানের বাজনা শুনতে যে তীব্র দমকা হাওয়া এসে জানালার বাইরে পাক খাচ্ছিল, তাই যেন বুনো মোষের মত জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরিক জানের বাদ্যযন্ত্রটা এমন ভয়ঙ্কর ভাবে চিৎকার করছে, কেউ দেখলেও বিশ্বাস করতে চাইবে না কোন ভায়োল থেকে এ ধরনের আওয়াজ বেরোতে পারে। ঝন্ ঝন্ করে জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র শীতল একটা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা ঘরের মধ্যে ঢুকে মোমবাতির শিখাটাকে বিপন্ন করে তুলল। আমি ঝট্ করে এরিক জানের দিকে তাকালাম। এরিক জান যেন কিছুই দেখছে না। ওর বিস্ফারিত চোখ দৃষ্টিহীন কাঁচের গোলকের মত সামনে স্থির, তাতে কোন প্রাণের সাড়া নেই। সে শুধু কী এক যান্ত্রিক ঘোরের মধ্যে ভায়োলের ছড় টানছে। ভায়োল থেকে এখন যে সুর ছড়িয়ে পড়ছে, কোন কলমের সাধ্য নেই তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

টেবিলের উপর যে কাগজগুলো এরিক জান লিখে স্তূপ করছিল, একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে জানালার দিকে ছুটল। মরিয়া হয়ে আমিও ছুটলাম ওগুলো ধরতে, কিন্তু জানালার কাছে পৌছাবার আগেই হাওয়ার তোড় ওগুলোকে বাইরে উড়িয়ে

নিয়ে গেল। তখনই আমার মনে পড়ল কতবার আমার ইচ্ছে হয়েছে এই জানালা দিয়ে একবার দেয়ালের ওপাশটায়, বিস্তীর্ণ শহরটাকে দেখব। আমার পিছনে তখনও এরিক জানের ভায়োল গুঙিয়েই চলেছে, মোমবাতির একচিলতে শিখাটিও তীব্র বাতাসের সঙ্গে মরণপণ করে লড়ে যাচ্ছে।

আর আমার সামনে যেখানে শহরের বাতিগুলো মিটমিট করে জ্বলবার কথা সেখানে কিছুই নেই। যেদিকে চোখ যায় একটা সীমাহীন অন্ধকার যেন গোটা চরাচর জুড়ে বসে আছে। অথচ এটা অসম্ভব। বাড়ি-ঘরের বাতি নিভে গেলেও রাস্তার আলোগুলো সারারাতই জ্বলে। তীব্র একটা আতঙ্ক নিয়ে আমি সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার হাওয়ার ঝাপটায় মোমবাতির আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়ে আমার চারপাশটাকে কেউ যেন নিকষ কালো পাথুরে আঁধার দিয়ে মুড়ে দিল। যে নিরেট আঁধারের দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে রহস্যময় সেই ভায়োলের পৈশাচিক উষ্ণ সঙ্গীতে।*

টলতে টলতে জানালার কাছ থেকে কোনমতে পিছু হটতে গিয়ে অন্ধকারে ধাক্কা খেলাম টেবিলটার সাথে। পরক্ষণেই একটা চেয়ারে পা বেধে যাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে চেয়ারটার সাথেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়লাম। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে ভায়োলের শব্দটা লক্ষ্য করে এগোতে চেষ্টা করলাম। এরিক জানকে সঙ্গে নিয়ে যে করেই হোক এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। জানি না এই হিংস্র অন্ধকারের গ্রাস থেকে আদৌ বেরোনো সম্ভব হবে কিনা। তবু তো একবারের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতেই হবে। শরীরে ভায়োলের ছড়ের গুঁতো খেয়ে বুঝলাম ভায়োল বাদকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আঁধারে হাত বাড়িয়ে দিতে এরিক জানের চেয়ারের পিঠটা আঙুলে ঠেকল। পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিলাম। কোন সাড়া নেই। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বললাম আমাদের এক্ষুনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এরিক জান কোন জবাব দিল না। যেভাবে যন্ত্রের মত ছড় টানছিল সেভাবেই টানতে থাকল। চিলেকোঠার ঘরটার মধ্যে

সেই ভয়ঙ্কর সঙ্গীত আর উন্মত্ত হাওয়া যেন এক প্রলয় নৃত্যে মেতেছে। আবার এরিক জানকে স্পর্শ করতেই আমি শিউরে উঠলাম। ওর শরীরটা বরফের মত ঠাণ্ডা, নিঃশ্বাস পড়ছে না। একটা কাঠের পুতুল যেন আঁধারের ভিতর বসে ভায়োল বাজাচ্ছে। একটা তীব্র ভয় আমাকে গ্রাস করল। প্রায় অলৌকিক ভাবেই কাঠের দরজাটার স্পর্শ পাওয়া মাত্র একটানে ওটা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। পিছনে তখনও এরিক জানের ভায়োল বেজেই চলেছে।

পড়িমরি করে সেই অন্তহীন নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে কী করে যে নীচে এসে পৌঁছেছিলাম, কী করে যে সেই পাথর বিছানো পথ ধরে ছুটতে ছুটতে দুর্গন্ধময় নদীটার ধারে এসে পড়েছিলাম, তারপর সেই পাথুরে সেতু পেরিয়ে কীভাবে যে আলোকিত প্রশস্ত রাস্তার উপর এসে পৌঁছেছিলাম তার কিছুই বলতে পারব না। শুধু এটুকু খেয়াল আছে কোথাও হাওয়া ছিল না তখন, রাস্তার বাতিগুলো তখনও জ্বলছিল।

অনেক খোঁজ-খবর করেও আমি আর র‍্যু দ'সেই-এর সন্ধান পাইনি। অবশ্য এজন্য আমার তেমন আফসোসও ছিল না, যেমন ছিল না এরিক জানের লেখা ওই কাগজগুলোর জন্যেও। হয়তো ওগুলো পড়তে পারলে সেই রহস্যময় সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু একটা জানা যেত। কিন্তু ওই যে বললাম, খুব বেশি আফসোস নেই। তবু কেন যে আমি জায়গাটা এখনও খুঁজছি কে জানে।

মূল: এইচ. পি. লাভক্র্যাফ্‌ট
রূপান্তর: সোহেল ইমাম

অভিশাপ

দুশো বছরের পুরানো ও ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মন্দির আবার নতুন করে দাঁড় করাতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার তারেক আহমেদকে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছেন আজ সাতদিন হলো। ঢাকায় তাদের ফার্মের বেশ সুনাম থাকাতে এধরনের ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্পর্শকাতর এবং স্থাপনা তৈরির দায়িত্ব সরকারের তরফ থেকে তাদের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে।

অনেক দিনের পুরানো মন্দির। এখন শুধু ওটার ধ্বংসাবশেষই আছে। সেটাকে ভেঙে একটা নতুন মন্দির দাঁড় করানোটাকে প্রথম দিকে তারেক আর তাঁর দলবল চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন কত বড় ভুল হয়েছে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা এই সাতদিনেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছেন। তার উপর আবার চার-পাঁচদিন ধরে শুরু হয়েছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। থামার কোন লক্ষণ নেই। বছরের এ সময়ে এটা একেবারেই বেমানান। তারেক আহমেদ নিজে তো বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেনই, তাঁর সাথে যারা এসেছে তারাও নানাজন নানা রকম অভিযোগ করছে। বৃষ্টির পানিতে মাটি হয়ে উঠেছে থকথকে কাদা। কোথাও কোথাও বুট পরা পায়ের অর্ধেক কাদার ভেতরে দেবে যায়। তখন আরেকজন এসে তাকে টেনে তোলে। সবকিছু মিলিয়ে কিছুদিন ধরে এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অথচ প্রথম দুটি দিন কি সুন্দর ছিল! কি চমৎকার রৌদ্রালোকিত দিন! কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই কে জানে সে রোদ কোথায় হারিয়ে গেল। প্রকৃতি যেন এরপর রুদ্ররোষে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল। কিন্তু এরপরও ওরা কাজ বন্ধ করেনি। সকলেই চেষ্টা করেছে যতটুকু সম্ভব কাজ করার। কিন্তু এভাবে আর কত। কাজের অগ্রগতি হয়েছে খুব সামান্য।

তারেক মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, আজকের দিনটা দেখে কাল ঢাকায় যোগাযোগ করে আপাতত কিছুদিনের জন্যে কাজ বন্ধ রাখার কথা বলবেন।

স্থানীয় দশ-বারোজন লোককে মাটি খোঁড়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা এই দুর্যোগেও পুরোদমে কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে। তারেক একটি বর্ষাতি গায়ে দিয়ে ওদের কাজ তদারকি করছেন। ভাঙা মন্দির থেকে সামান্য কিছুটা দূরে তারেকরা থাকার জন্যে পাশাপাশি তিনটি তাঁবু গেড়েছেন। সেটার একটি থেকে কেউ একজন দৌড়ে এসে ওঁকে কি যেন বলল। তারেক তড়িঘড়ি করে তাঁবুতে চলে এলেন। ঢাকা থেকে জরুরী ফোন কল এসেছে। ফোন তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে ওদের ঢাকা অফিসের ইনচার্জ সাদেকুল করিমের গলা শুনতে পেলেন। 'তারেক সাহেব, কাজ বন্ধ করে দিন। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে আসুন। সরকার এ ফান্ডে যে টাকা দিয়েছিল, সেটা উইথড্র করেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এর পরে আর আমাদের পক্ষে কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তবে ভাববেন না, সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাদেরকে একটা বড় ধরনের অ্যামাউন্ট দিতে রাজী হয়েছে।' সাদেকুল করিমের গলায় বেশ খুশি খুশি ভাব।

এপ্রান্তে তারেক মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক বাবা, বাঁচা গেল। এ ধরনের বিশ্রী পরিবেশে আর কাজ করতে হবে না। আর তাছাড়া, ওর অধীনস্থদের এরকম পরিবেশে আর দুদিনও রাখা যেত কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ওকে ফেলেই হয়তো সবাই ঢাকা চলে যেত। স্বস্তি গোপন করে তারেক বললেন, 'কিন্তু কেন, স্যার? আমাদের দিক থেকে কোন সমস্যা?'

'না, না, পুরোটাই সরকারের নিজস্ব ব্যাপার। শুনেছি সরকার নাকি এই মন্দির সংস্কারের ফান্ড দিয়ে পুরানো একটা মসজিদ

সংস্কার করতে চায়। তারা আমাদের কোন ফল্ট খুঁজে পায়নি। আচ্ছা রাখি, আপনি যত শিগ্‌গির পারুন চলে আসুন।'

দু'ঘণ্টা পর। সবাই সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঢাকার পথে রওনা হবে। সেজন্যে সবাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। আগের সেই বিমর্ষ ভাব আর নেই। মাটি খননের কাজে নিয়োজিত স্থানীয় শ্রমিকদের পাওনা অনেক আগেই মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের সবাই চলে গেলেও, একজন লোক এখনও যায়নি। তারেক তাঁবু থেকে বেরিয়ে শেষবারের মত যখন জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এই সময় লোকটার দিকে ওঁর নজর পড়ল। লোকটা একা একা খনন করা গর্তটার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তারেক তার দিকে এগিয়ে যান। 'কি ব্যাপার, তুমি দাঁড়িয়ে আছ! তোমার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়নি?'

লোকটি মাথা চুলকে স্বভাবসুলভ সরল হাসি দিয়ে বলে ওঠে, 'হইছে স্যার, তয় যাওনের আগে আপনেরে একটা জিনিস দেখাইতাম।'

'কি জিনিস?'

সে এদিক ওদিক তাকায়। 'আপনের তাঁবুর ভেতরে চলেন।'

তারেক লোকটাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। লোকটা লুঙ্গির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা পুরানো পলিথিন বের করে আনে। ভেতর থেকে ধাতব কি যেন একটা বের করে তারেকের দিকে এগিয়ে দেয়। তারেক সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকেন। জিনিসটা নিরেট পাথরের তৈরি একটি পা। সাইজে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চির মত হবে। অবিকল ছোট বাচ্চাদের পায়ের মত। একেবারে জীবন্ত। ভাঙা দিকটা দেখলে মনে হয় জিনিসটা একসময় ছোট্ট কোন মূর্তির শরীরের অংশ ছিল। তারেকের মুখ দিয়ে অজান্তেই অস্ফুটে বেরিয়ে আসে। 'এটা কোথায় পেলে?'

'মাটি খোঁড়ার সময় পাইছি, স্যার। কাউরে দেহাই নাই আপনেরে দেহামু বইলা লুকায়া রাখছি।'

'কিন্তু মূর্তিটার বাকি শরীর কোথায়?'

'কইতে পারতাম না, স্যার। তয় মনে করছিলাম ঠ্যাংটা যখন পাইছি, পুরা শইলডাও পামু। কিন্তু অনেক খুঁইজাও আর কিছু পাই নাই। তাইলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা, যাও।'

লোকটা চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই তারেক তাকে কি মনে করে থামান। পকেট থেকে বকশিশ হিসেবে লোকটাকে কিছু টাকা দেন।

সেদিন বিকেলে গরুর গাড়িতে করে ওরা যখন চলে আসছিল, তারেক সেসময় পেছনে চেয়ে চেয়ে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটা দেখছিলেন। মন্দিরের সামনে ওদের খোঁড়া বিরাট গর্তটা ইতিমধ্যে বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে মন্দিরটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। তারেক চোখ ফিরিয়ে নেন।

সেরাতে শুতে যাবার আগে হঠাৎ করে তারেকের ওই ভাঙা পায়ের কথা মনে পড়ে। ওটা আজ দুপুরে ওকে তাঁবুর ভেতর অপরিচিত লোকটি দিয়েছিল। ট্রাভেল ব্যাগ খুলে পলিথিনে মোড়ানো পা'খানি বের করেন তিনি। জিনিসটা হাতে নিয়ে তারেকের শরীর শির শির করে ওঠে। কেন জানি মনে হয়, তিনি জীবন্ত কোন কিছু ধরে আছেন। নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে তিনি আরেকটি জিনিস দেখে বিস্মিত হন। পায়ের গোড়ায়, অর্থাৎ যেখান থেকে পা'খানি ভেঙেছে, সেখানে ছোপ ছোপ শুকনো রক্তের দাগ। কেমন কালচে লাল। মনে হচ্ছে ওখানটায় একসময় প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। কিন্তু সেটা কি করে হবে? জিনিসটা তো নিরেট পাথর বৈ আর কিছু নয়। ওঁর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ব্যাপারটার কোন কুলকিনারা করতে পারেন না। শেষে যেভাবে ছিল সেভাবে আবার জিনিসটা ব্যাগে ভরে রেখে শুয়ে পড়েন। সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার তারেক আহমেদ গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

সারাদিনের টিপ টিপ বৃষ্টি এখন এই গভীর রাতে তমল বর্ষণ হয়ে

দেখা দিয়েছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে তীব্র বাতাস। তুমুল ঝড়-বৃষ্টি ভাঙাচোরা মন্দিরটাকে কুয়াশার মত ঢেকে ফেলেছে। বৃষ্টির পানিতে মন্দিরের ছোট্ট উঠান ডুবে গেছে। মাঝখানে করা বড় গর্তটা অনেক আগেই পানিতে তলিয়ে গেছে। মন্দিরের পেছনে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে বহু বছরের পুরানো একটি বটগাছ রয়েছে। সেটার নিচে এই তুমুল বৃষ্টিতে আশ্রয় নিয়েছে একজন মানুষ। মানুষটা মানসিক ভারসাম্যহীন। একজন উন্মাদ। গ্রামের সবাই তাকে বাতাসী পাগলী বলে চেনে। সে দু'হাতের মধ্যে ছোট্ট একটা পাথরের মূর্তি ধরে আছে। নিজের শরীরের শতচ্ছিন্ন কাপড়টুকু দিয়ে সে বার বার পাথুরে মূর্তিটাকে মুছে দিচ্ছে। কিন্তু মূর্তিটার ক্ষতস্থান থেকে পড়া রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। টকটকে লাল তাজা রক্ত। মূর্তিটার একটি পা নেই। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার হলেও ওটার পাথুরে চোখদুটো ভাটার মত জ্বলজ্বল করছে।

লন্ডন। প্রফেসর রবার্টসন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বসে একটি বইয়ের উপর ঝুঁকে আছেন। বইটি বহু বছরের পুরানো প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর লেখা। ইতিহাসের উপর প্রফেসরের প্রচণ্ড ঝোঁক থাকায় তাঁর একজন বন্ধু সুদূর ভারত থেকে এই বইটি পাঠিয়েছিলেন বছর দেড়েক আগে। তারপর থেকে তিনি নাওয়া খাওয়া ভুলে এই বইয়ের উপরই পড়ে আছেন। বইটি বহু আগের প্রাচীন ভাষায় লেখা। আর তাই বইটা পড়ে বুঝতে বা অর্থ উদ্ধার করতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। পুরানো পার্চমেন্ট অনেক জায়গায় খসে গেছে। লেখাগুলো ঝাপসা হতে হতে কোথাও একেবারে মিলিয়ে গেছে। তারপরও প্রফেসর অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বইটি পড়ার চেষ্টা করছেন। তবে মাস ছয়েক ধরে তিনি বইটার একটি প্যারার মর্ম উদ্ধার করতে পারছিলেন না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তাঁর মনে হলো, তিনি সেটা পেরেছেন। আর তাই উত্তেজনায় বইটির উপর ঝুঁকে পড়েছেন। প্রফেসর অনুবাদ করা প্যারাটা পড়তে শুরু করলেন।

'রাজা ছিলেন খুব অত্যাচারী। সবাই তাঁর আনুগত্য মেনে নিলেও

মন্দিরের ওই পুরোহিত তাঁর আনুগত্য মেনে নেননি। তিনি কয়েকজন লোক নিয়ে রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে মন্দিরটি জ্বালিয়ে দেন। আর পুরোহিতসহ ওই লোকগুলোকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার হুকুম দেন। ওই সময় রানী ছিলেন গর্ভবতী। অনেক দিন পর তিনি সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন। মারা যাবার সময় পুরোহিত রাজাকে ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ দিয়ে যান। বলেন, 'রাজা, তোমার কোন উত্তরাধিকার থাকবে না। তোমার স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করবে সে জন্মের পর পাথর হয়ে যাবে।'

বলা বাহুল্য অত্যাচারী রাজা তাতে কান দেননি। এর কিছুদিন পর রানী একটা ফুটফুটে পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। রাজার মনে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। কিন্তু পুরোহিতের অভিশাপে কিছুদিনের মধ্যেই সে সন্তান ধীরে ধীরে পাথরে রূপান্তরিত হতে থাকে। রাজা অনেক ওঝা অনেক কবিরাজ ডাকেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সবার চোখের সামনে দিয়ে ফুটফুটে সেই সন্তান একসময় নিরেট পাথর হয়ে যায়। রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু তখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে রাজা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পাথর হয়ে যাওয়া সন্তানটিকে ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সামনের উঠোনে সমাহিত করেন।' প্যারাটি এখানেই শেষ। নিচে কোথাও এ প্রসঙ্গে আর কিছু লেখা নেই। এমনিতে প্রচণ্ড বাস্তববাদী মানুষ প্রফেসর রবার্টসন। যুক্তিহীন কোন কিছুকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দেন না। আর তাই ইতিহাসের বইতে এ ধরনের একটি রূপকথার মত কাহিনী পড়ে স্বভাবতই তিনি বেশ বিরক্ত বোধ করতে থাকেন। মনে মনে ভাবেন, তাঁর গত ছ'মাসের পরিশ্রম হয়তো একেবারেই বৃথা গেল।

আহমদ মাহবুব ইমাম

পেইন্টিং

এক

‘দেখো, পিশাচটা কী সুন্দর!’

‘পিশাচ আবার সুন্দর হয়?’

‘জগতের সবকিছুরই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে আর সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগে সুন্দর মন ও চোখ।’

‘তারমানে তুমি বলছ তোমার সুন্দর মন আছে, আমার তা নেই?’

‘রেগে যাচ্ছ কেন? আমি আসলে ওরকম কিছু বলিনি,’ বলেই কেঁদে ফেলল নীলি। ওর নাম নীলিমা, আমি ওকে নীলি বলে ডাকি, আবার কখনও শুধু নী-ও বলি।

আমি এতক্ষণে পিশাচটির দিকে তাকালাম। না, এটা সত্যিকারের পিশাচ নয়। এটা একটা পেইন্টিং। পিশাচটির দিকে তাকাতেই আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। কী বীভৎস! কী ভয়ঙ্কর! মনে হচ্ছে এটা পেইন্টিং-এর পিশাচ নয়, বাস্তব কোনও পিশাচ-এর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

যদিও কোনও সত্যিকারের পিশাচ দেখিনি, তবে এটার চেয়ে ভয়ঙ্কর সত্যিকারের পিশাচ হবে না বলেই আমার ধারণা। নীলি এখনও নিঃশব্দে কাঁদছে, আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম না। ‘ছবিটা তোমার পছন্দ হয়েছে?’

নীলি কোনও কথা বলল না। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ, তাই আমি ছবিটি কিনলাম।

রাত বারোটা, তাই রাস্তায় বেশি গাড়ি নেই। আমি আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি। আমার পাশে নীলা বসে আছে। তার হাতে পিশাচ-

এর পেইন্টিং। 'নীলি... নীলা..., নীলিমা, কথা বলছ না কেন?' তবুও নীলি কথা বলল না। আমি গাড়ির গতি বাড়ালাম। এবার অবশ্য সে কথা বলবে। আমি আরও গতি বাড়ালাম।

'এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছ কেন? আস্তে চালাও!'

আমি গাড়ির গতি কমালাম না।

'আস্তে চালাও, নইলে আমি আবার কেঁদে ফেলব।'

আমি গাড়ির গতি কমিয়ে আনলাম, কারণ চাই না আমার ভালবাসার মানুষটি কষ্ট পাক। শুধু আমি কেন? কোনও পুরুষই চায় না তার ভালবাসার মানুষটিকে কষ্ট দিতে।

'আচ্ছা নীলি, তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস?'

'ভালবাসা মাপার কোনও যন্ত্র থাকলে বলতে পারতাম।'

'তুমি চাইলে আমি ভালবাসা মাপার যন্ত্র তৈরি করব।'

'তা হলে তুমি তো বিখ্যাত হয়ে যাবে, আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে তোমাকে আপন করে নিতে চাইবে। তাই তুমি বিখ্যাত হও তা আমি চাই না,' বলেই হেসে ফেলল নীলিমা।

আমি ওর হাসি দেখতে লাগলাম, লিওনার্দো যদি নীলিমার হাসি দেখত তা হলে সে মোনালিসার ছবি আঁকত না।

নীলিমা আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার কোনও কষ্ট লাগছে না। আমি খুব আনন্দিত। তারপর আমার ঘুম ভেঙে গেল। তিনটে বাজে, বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে ছোট একটা ডিম লাইট জ্বলছে। আমি বিছানা থেকে নামলাম। আর তখনি বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমার সামনে ভয়ঙ্কর একটা পিশাচ দাঁড়িয়ে আছে।

পিশাচটা খুবই কুৎসিত। তার পুরো শরীর চামড়াহীন, মাংসগুলো যেন এক্ষুনি শরীর থেকে খসে পড়বে। হাতির মত দু'টো পা, কুমিরের মত মাথা, তবে চোখ একটা। তার বড় বড় লাল দাঁতগুলো যেন আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাবে। আমি আতঙ্কে অবশ হয়ে যাচ্ছি।

'ঘুম আসছে না?' নীলিমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এতক্ষণে

ধাতস্থ হলাম। আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে তা হলে পেইন্টিং-এর পিশাচটা দেখছিলাম। আসলে নীলির কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই কুৎসিত পেইন্টিংটা বেডরুমে রেখেছে।

'না, তুমি ঘুমাও,' বলে আমি বাথরুমের দিকে রওনা দিলাম। বাথরুমের লাইট অফ করা। আমি লাইট জ্বালাতে সুইচবোর্ডের দিকে গেলাম। সুইচ অন করলাম, কিন্তু লাইট জ্বলল না। নিশ্চয়ই লোডশেডিং।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার খুব ভয় করছে। ভয় দূর করার জন্য অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম।

মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা কিছু নেমে যাওয়ার আভাস পেলাম। আমার পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়ে আছে। কে? নীলিমা? আস্তে আস্তে পিছন ফিরলাম। পিশাচ, হ্যাঁ সেই কুৎসিত পিশাচটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভয়ঙ্কর লোমশ হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিলাম। কখন যে বেডরুমে এসেছি, তা আমি নিজেই বলতে পারব না। মনে হচ্ছে আমি শত শত মাইল দৌড়ে এসেছি।

নীলিমা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হ্যাঁ, এ সুযোগেই আমাকে কাজটা সারতে হবে। আমি চুপি চুপি ছাদে চলে এলাম। রাস্তায় দুই একটা করে গাড়ি চলছে। আমি আমার হাতের পেইন্টিং-এর পিশাচটাকে আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম রাস্তার দিকে।

কাজটা শেষ করতেই আমার সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়, আমারও ঠিক সে রকম অনুভূতি হচ্ছে।

দুই

নীলিমার ডাকে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন সকাল আটটা। আজ নিশ্চয়ই আমার দিনটা ভাল যাবে। আমি ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সে গুড়ে বালি, তা বুঝতে পারলাম দেওয়ালে ঝোলানো পেইন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে।

'নীলি... নীলি... নীলিমা...'

'কী হয়েছে?'

'এই পেইন্টিংটা এখানে এল কেমন করে?'

'কেন? কাল তো এখানেই ঝুলিয়েছিলাম।'

'আমি যে রাতে—' আর বলতে পারলাম না।

আমি কি তা হলে স্বপ্ন দেখেছিলাম? না, এ হতেই পারে না। আজ সারাদিন অফিসের কাজে মন বসাতে পারিনি। আমার সমস্ত ভাবনার সাথে পিশাচটি জড়িয়ে যাচ্ছিল। এই পেইন্টিংটা যে আমার জীবনের কাল হবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

কিন্তু আমার কী করার আছে? নাহ্, কিছু একটা করতেই হবে। প্রয়োজন হলে নীলাকে...। নাহ্, এ সম্ভব নয়। নীলা আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ওকে ছাড়া আমি... আর ভাবতে পারলাম না, মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।

আজ আকাশের অবস্থা ভাল নয়, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। এই অসময়ে ঝড়বৃষ্টি? আসলে এই পিশাচটা এ বাড়িতে আসবার পর থেকে আমার মাথার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে। গ্রীষ্মকালে ঝড়বৃষ্টি হবে না তো কী হবে?

সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমাতে এলাম, তখন রাত এগারোটা। নীলির শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে। বাইরে প্রচণ্ড অন্ধকার, তবে মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে।

বিছানায় শোয়ার পরপরই চলে গেল বিদ্যুৎ। ঝড়বৃষ্টির রাতে বিদ্যুৎবিহীন থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখানে কিছু আছে? আমার মন বলছে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ ঘাপটি মেরে পড়ে আছে।

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল। আমার পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি এটা অনুভব করছি। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে চাইলাম। না, অযথা ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমি তো জানালা বন্ধ করেছি।

হয়তো বন্ধ হয়নি। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে আর সে বাতাসই আমার গায়ে লাগছে।

আমি বিছানা থেকে উঠে জানালা বন্ধ করতে গেলাম। বাইরে তুমুল বৃষ্টির সাথে দমকা বাতাস বইছে, আর মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে।

আমার গলায় ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করলাম। অন্ধকারে কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে। এমন সময় বিজলি চমকাল, আর সেই আলোয় আমি যা দেখলাম তাতে শরীর একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পিশাচটা আমার গলা টিপে ধরেছে। আস্তে আস্তে তার আঙুলের চাপ বাড়ছে। পচা মাংসের গন্ধ আমার নাক দিয়ে ঢুকে পেটের ভিতর মোচড় মারছে।

আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি...

আর কিছুই মনে নেই। শুধু অনুভব করলাম কে যেন আমার হাত ধরে জোরে টান দিল।

তিন

আমি কী? আমি কোথায়? এখনও বেঁচে আছি? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বেঁচে

আছি। আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। নীলি আমার পাশে বসে আছে। ওর ফ্যাকাসে মুখ দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

'পেইন্টিংটা... পেইন্টিংটা আসলে...'

'আমি জানি' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম। তখনও বিদ্যুৎ আসেনি, তবে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে।

মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে। দেয়াল থেকে পেইন্টিং-এর পিশাচটাকে নীচে নামালাম, তবে চোখ বন্ধ করে ওটার দিকে তাকাবার ইচ্ছা ও সাহস কোনওটাই এখন আমার নেই।

মোমবাতির উপর পেইন্টিংটা ধরে রাখলাম। আস্তে আস্তে ওটা পুড়ে যাচ্ছে। মাংস পোড়ার তীব্র কটু গন্ধ নাকের ভিতর ঢুকছে।

জানালা দিয়ে একঝলক দমকা বাতাস ঘরে ঢুকল, নিভে গেল মোমবাতিটা। নীলির চিৎকারে পেইন্টিংটা ফেলে ওর পাশে গেলাম। এখানেই তো ছিল। 'নীলি... নীলি...' গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকতে লাগলাম।

'আমাকে বাঁচাও!' অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেলাম। ওটা নীলির কণ্ঠস্বর।

আমি অন্ধকারে নীলিকে খুঁজতে লাগলাম। 'নীলি... নীলিমা... কোথায় তুমি?' কোনও সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ কোথায় যেন বাজ পড়ল। ভয়ঙ্কর শব্দে আমার শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। ওটার আবছা আলোয় যা দেখতে পেলাম তাতে আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ হিম হয়ে গেল।

আমার নীলার রক্তাক্ত দেহের উপর পিশাচটি হামাগুড়ি দিয়ে বসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওহ! কী বীভৎস দৃশ্য!

'আহ্, কী শান্তি! অনেকদিন পর মানুষের মাংস খাচ্ছি,' একটা ভয়ানক কর্কশ গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার মাথার ভিতর কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন তীব্র আলোয় আমার চোখ জ্বালা পোড়া করছে। বিদ্যুৎ চলে এসেছে। আমার নীলিকে দেখতে পেলাম।

দরজার পাশে পড়ে আছে।

ও কি আমার নীলি? ওর শরীরে কোনও মাংস নেই, শুধু কয়েকটা হাড্ডি পড়ে আছে।

নিজ জীবনের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। তাই আমি চলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমাকে এখান থেকে পালাতেই হবে।

রাস্তা একদম জনমানবশূন্য। খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছি। মাথার ভিতর শুধু একটাই চিন্তা বাঁচতে হবে... আমাকে বাঁচতে হবে।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। হর্ন বাজালাম, কিন্তু তা লোকটির কানে যাচ্ছে না। ইচ্ছে হলো সাদা চাদর গায়ে দেওয়া লোকটার উপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিই।

কষে ব্রেক চাপলাম। গাড়ির টায়ারের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সাদা চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ কী! এই তো সেই ভয়ঙ্কর মাংসাশী পিশাচটা! আমার নীলিকে খেয়েও ওর খিদে মেটেনি, আবার আমাকে খেতে এসেছে। পিশাচটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি মনে মনে মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগলাম।

মোঃ রাকিব হাসান

অন্য ভুবনের একজন

এখন রাত কয়টা? দু'টা-তিনটা...নাকি তারও বেশি? দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ হলো সেটারও কোন সাড়াশব্দ নেই। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার খুব সমস্যা হয়। আর ঘুম আসতে চায় না। আবার ঘুম আসে ফজরের আযানের পরপর। ততক্ষণ পর্যন্ত সময়টুকু জেগে বসে থাকতে হয়। খুব সাবধানে উঠে বসলাম, ঠিক তখনই অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য আমাকে অভিভূত করে দিল। খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে চাঁদের আলো। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে আমার খাট এবং ঘরের একাংশ। অবর্ণনীয় এক সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত ঘর। বিথীর মুখে, শরীরে পড়ছে চাঁদের আলো। অদ্ভুত নিষ্পাপ আর মায়াময় দেখাচ্ছে ওকে। বিথী আমার স্ত্রী, আমার পাশেই ঘুমুচ্ছে। ওর শোয়ার ভঙ্গিটা খুব অদ্ভুত, পা গুটিয়ে নিয়ে ছোট বাচ্চাদের মত জড়সড় হয়ে ঘুমোয়। অন্যান্য দিন আমার ঘুম ভাঙবার সাথে সাথে ও-ও উঠে বসে। জিজ্ঞেস করে, পানি খাবে কিনা...মাথাব্যথা করছে কিনা...। ওর কথা শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মাঝরাতে ঘুম ভাঙবার কেবলমাত্র এই দুটি কারণই আছে। কিন্তু আজকে ওর ঘুম ভাঙল না। সম্ভবত ভ্রমণের ক্লান্তিই এর কারণ। আস্তে করে চাদরটা ওর গলা পর্যন্ত টেনে দিলাম, তারপর কপালে একটা গভীর চুমু দিয়ে সাবধানে খাট থেকে নেমে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে জোছনার আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এক অপার্থিব সাদা আলোয় ভরে আছে চারিদিক। লম্বা লম্বা মেহগনি গাছগুলোর অদ্ভুত ছায়া পড়েছে মাটিতে। হালকা বাতাস বইছে। বাতাস একটু জোরে বইলেই গাছের পাতায় অদ্ভুত সড়সড়

শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ আমার চেনাজানা, পরিচিত কোন জগৎ নয়, অতিলৌকিক কোন জগৎ। যে জগৎকে আমিই প্রথম দেখবার সুযোগ পেলাম। ইচ্ছে হলো, বিথীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে এই ভয়াবহ সুন্দর দৃশ্যটি দেখাই। কোন সৌন্দর্যই একা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না, সঙ্গী দরকার হয়। সঙ্গী পাশে থাকলে, সৌন্দর্য যেন আরও বহুগুণ বেড়ে যায়।

ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলাম। শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাংঘাতিক পরিশ্রান্ত ও আজ। বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ সেই ভয়ংকর সম্ভাবনার কথাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিথী যদি টের পেয়ে যায় সব? যদি জেনে ফেলে সবকিছু? ...তখন কী হবে? আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় জগৎ সংসারের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলি। ভীষণ অস্থির লাগে...অসহায় মনে হয় নিজেকে। পৃথিবীর আর কেউ না জানুক, আমি জানি যে, এই মেয়েটিকে আমি কী অসম্ভব ভালবাসি। জগতের সমস্ত প্রাণীর সবটুকু ভালবাসা এক জায়গায় করলেও, ওর জন্য জমানো আমার ভালবাসার সমান হবে না। একটা মুহূর্তও ওকে না দেখে থাকতে পারি না। কিন্তু সমস্যা হলো, আমার ভালবাসার কথাটা কখনও ওর কাছে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারি না। ও সেটা খুব সহজেই পারে। যখন তখন আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'এই যে, মিস্টার, তোমাকে ছাড়া কিন্তু আমি বাঁচব না। সো ডোন্ট লিভ মি এভার...। জাস্ট লাভ মি ফর এভার।'

বিথী প্রথমে এই রকম অখ্যাত একটা জায়গায় কিছুতেই বেড়াতে আসতে রাজি হয়নি। বলতে গেলে আমার চাপে পড়েই এসেছে। কারণ এই জায়গায় কয়েকদিনের জন্য আসাটা আমার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল। আশেপাশে কোন হোটেল না পাওয়ায় উঠতে হয়েছে এই রেস্টহাউজে। অবশ্য থাকবার জন্য খুব একটা মন্দ না। অন্তত আমার জন্য। আর তা ছাড়া এটি আমার পূর্ব পরিচিত। বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে কখন ঘুম এসে গেছে...

ঘুম ভাঙল বিথীর চেঁচামেচিতে। আমার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে।

'দেখেছ, কী সুন্দর সকাল?' ঝলমলে গলায় বলল ও। 'আর তুমি ঘুম থেকে উঠতেই চাচ্ছ না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আসলেই চমৎকার একটি সকাল। সূর্য এখনও পুরোপুরি ওঠেনি, অসংখ্য পাখি ডাকছে গাছে গাছে। গতরাতের দৃশ্য আর এখনকার দৃশ্যের মধ্যে কত তফাৎ! আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলাম।

'আজকে বারান্দায় বসে চা খাব। মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো,' তাড়া লাগাল ও।

'কিন্তু আমার মুখ না ধুয়ে চা খেতেই ভাল লাগে। ইংরেজদের ভাষায়, বেড-টি।'

'তোমার এই বিশ্রী অভ্যাসটা আমার একদম অপছন্দ। ইংরেজরা নোংরা জাতি ছিল বলে কি আমাদেরও নোংরা হতে হবে?' কৃত্রিম ঝগড়ার সুরে বলল ও। 'যাও, জলদি করো।'

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ নিজেকে খুব সুখী মনে হলো। আমার এত সুখ কি স্রষ্টা সহ্য করবেন?

গতরাতের ভয়টা হঠাৎ করেই আবার পেয়ে বসল। কণ্ঠ শুকিয়ে আসতে লাগল। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলাম, আমার এই অসীম বিপদ থেকে তিনি যেন আমাকে উদ্ধার করেন, আমার বিথীকে যেন তিনি ভাল রাখেন। ঠিক করলাম, ওকে কিছুতেই একা থাকতে দেওয়া যাবে না। আজ সারাদিন ওকে নিয়ে ঘুরব।

আমাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার এবং টুকটাক কিছু কাজ করবার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। আমাদের কেয়ারটেকার রইসউদ্দিন, এ কাজের জন্য বজলু নামের একজনের কথা বলল। খুবই নাকি ভাল লোক, বিশ্বস্ত এবং কর্মঠ। আজকাল সাধারণত একসাথে এতগুলো গুণ কোন মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায় না। আমি রাজি হলাম কিন্তু বিথী হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। ও তখন দূরের পুকুর ঘাটটা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে।

'আচ্ছা, পুকুর ঘাটটার ওদিকে...ওই ও পাশটায় কী?' হঠাৎ করে প্রশ্ন করল ও আমাকে।

ভয়ংকরভাবে চমকে উঠ্‌লাম আমি। যদিও চমকে উঠবার মত কিছুই হয়নি, তারপরও। শুধু মনে হলো আমার চোখের দিকে তাকালেই ও বুঝে ফেলবে অনেক কিছু।

'ওটা কিছু না। পুরানো কোন কবরস্থান হবে হয়তো।' গলার স্বরে স্বাভাবিকতা আনবার চেষ্টা করলাম। 'চলো, আজকে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি।' ওর মন অন্যদিকে ফেরানোর জন্য বললাম।

'ইচ্ছে করছে না...আচ্ছা বলো তো এখানে কী জন্য এসেছ?'

'কেন? এখানে ভাল লাগছে না?'

'একটুও না। কেমন বিষণ্ন চারদিক।'

'সকালেই না বলেছিলে, খুব ভাল লাগছে?' হেসে জানতে চাইলাম।

'এখন আর লাগছে না,' বলেই ও ঘরে চলে গেল। আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, বেচারিকে এখানে এনে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ করব, সিদ্ধান্ত নিলাম।

'স্যার, বজলুরে কি সন্ধ্যায় সঙ্গে আনব?' রইসউদ্দিন প্রশ্ন করল।

'আচ্ছা...এনো,' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলাম।

মাগরিবের আযানের পরপরই রইসউদ্দিন ওকে নিয়ে এল। বজলু, হৃষ্টপুষ্ট মোটাসোটা লোক, তবে খুবই করিৎকর্মা। কোন কাজের কথা বলে শেষ করবার আগেই সে সেটা করে ফেলে। কোন কঠিন ব্যাপারও সে চট করে বুঝে ফেলে। আর পরিশ্রমের কাজগুলো করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। শুধু একটাই সমস্যা, সে আগুনের ধারে কাছে যেতে চায় না, এ ছাড়া অন্য যে কোন ব্যাপারে সে দারুণ নিপুণ। বিথী তো মহাখুশি এরকম একজন কাজের লোক পেয়ে। এরমধ্যেই আমাকে ও একাধিকবার বলেছে, বজলুকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমি জানি বিশেষ একটা কারণে এটা কখনোই সম্ভব হবে না। কিন্তু ওকে তো আর সেটা বলা যায় না, শুধু বজলুর বউ ছেলে-মেয়ে আছে...ওদেরকে ছেড়ে যাবে কীভাবে...এই সব বলে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তখনও কি জানতাম কী ভয়াবহ দুর্যোগ অপেক্ষা করছে আমার সামনে...

বজলু আসবার কয়েকদিন পর, এক বিকেলে আমি আর বিথী সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। বজলু যথারীতি বেশ কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছে, সব কাজকর্ম শেষ করে। এরই মধ্যে হঠাৎ মূর্তিমান বিভীষিকার মত বজলুর ছোট মেয়েটা এসে হাজির। আমাকে কিছু করবার বা বলবার সুযোগ না দিয়ে সে বিথীর সামনে চলে এল। প্রশ্ন করল, 'আফা, রইস চাচারে দ্যাকছেন?' অর্থাৎ সে আমাদের কেয়ারটেকারকে খুঁজছে।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ওই ওদিকে দেখেছি, যাও।' আমি কোন দিকে ইশারা করলাম তা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। আমি চাচ্ছিলাম মেয়েটি যত দ্রুত সম্ভব বিদেয় হোক। রইসউদ্দিনকে আমার চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছিল সে মুহূর্তে। এতবড় একটা ভুল সে কী করে করল? কেন সে এদিকে নজর রাখল না? আর এই বিপদের সময়ে সে করছেই বা কি? মেয়েটি চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু আমার শেষ আশার প্রদীপটুকু নিভিয়ে দিল বিথীর অতিরিক্ত কৌতূহল। সে মেয়েটিকে ডেকে ফেরাল। আমি কিছুই করতে পারলাম না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম সত্যের ভয়ংকর উদ্‌ঘাটন।

বিথী হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, খুকি, কাঁদছ কেন? রইস চাচাকে কী দরকার?'

'বাপজানের অসুখ খুব বাড়ছে...আমার একলা ডর করে।'

'ওহ্ তাই নাকি। আহারে...। তা রইস কী হয় তোমার?'

'বাপজানের বন্ধু লাগে। আমি কই চাচা।'

এরপর আমি যে ভয় করছিলাম তাই সত্যি হলো। বিথী প্রশ্ন করল, 'কী নাম তোমার বাবার? কোথায় থাকো তোমরা?'

'বাপের নাম বজলু মিয়া। ওইহানে থাকি।' আঙুল তুলে দূরে একদিকে দেখিয়ে দিল। তারপর যোগ করল, 'আমার বাপজান আগে এইহানেই কাম করত। তখন আমাগোর খাওনের কুনো অভাব আছিল না।'

বিথী বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। ওর মাথার মধ্যে

ঘুরছে, আমার বাপের নাম বজলু এবং সে এখানেই কাজ করত, এই দুটি কথা। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও কি আমাদের বজলুর কথা বলছে? কিন্তু তা কী করে হয়...বজলু তো কিছুক্ষণ আগেই কাজ করে গেল।'

'আরে ও কিছু নয়, বাচ্চা মেয়ে, কী বলতে কী বলেছে। হয়তো বাবার নাম বাচ্চু মিয়া, বলছে বজলু মিয়া।' ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম আমি।

কিন্তু আবার বাধ সাধল ওই মেয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল। 'ক্যান? বাপের নাম মিছা কমু ক্যান? জানেন না মিছা কওন পাপ?'

আমার অস্থিরতা বিথীকে আরও সন্দিহান করে তুলল। আমাকে বলল, 'রেডি হয়ে নাও। এই মেয়ের বাবাকে দেখতে যাব।'

'না!' আর্তনাদের মত আমার গলা চিরে শব্দটা বের হয়ে এল। 'তুমি পাগলামি করছ।'

'কেন?' প্রশ্ন তুলল ও। 'একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ায় তোমার অসুবিধা কোথায়?'

কিছুতেই ফেরাতে পারলাম না ওকে। বজলুর বাড়ির সামনে যেয়ে রীতিমত ঘামতে শুরু করলাম আমি। কারণ আমি জানি, কতবড় বিস্ময় ওর জন্য ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছে। ও ভেজানো দরজাটা মৃদু ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। পেছন পেছন আমি। ঘরে ঢুকতেই বিকট একটা পচা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল, আর ঠিক সেই সময় কানে এল বিথীর চিৎকার। ঘরের মাঝামাঝি একটা চৌকিতে শুয়ে আছে বজলু। মরণাপন্ন...অসহায়। পরনের লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর পর্যন্ত তোলা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কুষ্ঠ রোগে বজলুর বাঁ পা-টা পচে গলে গেছে, কোন কোন জায়গায় হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বিথী ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে ঘুরে তাকাল, থরথর করে ভয়ে কাঁপছে ও তখন।

'তুমি সব জানতে! তা হলে...তা হলে ও কে?' কোনমতে বাক্য দুটি উচ্চারণ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল ও আমার হাতে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত এবং আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক।

আমি যা যা আশঙ্কা করেছিলাম, তার সবকটিই বাস্তবে রূপ নিল। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারলাম না। এই ভীষণ ভয়ংকর ঘটনায় ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল এবং সেই অবস্থাতেই একদিন সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে বসল। শেষ দিকে বজলু নামের কাল্পনিক কোন মানুষকে ভয় পেত। একা থাকতে পারত না, এমনকী ও আমাকেও ভয় পেত। শেষ পর্যন্ত ও আত্মহত্যার মধ্যে দিয়েই মুক্তির পথ বেছে নিল। ওর জন্য কিছুই করতে পারিনি, ওর এই পরিণতিতে আমার কোন হাতও ছিল না। একেই বোধহয় বলে নিয়তি। অসীম ক্ষমতাধর এক স্রষ্টা, যিনি আমাদের মত কোনকিছুকে সৃষ্টি করেছেন আবার বিথীর মত অসম্ভব সুন্দর মানব কন্যাও সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই হাতের লেখনিতে বাস্তব রূপ পেয়েছে আমার সমস্ত দুর্ভাগ্য। বিথীর শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। ওর কাছে ক্ষমা চাইতেও পারিনি। আর কী বলেই বা ক্ষমা চাইতাম? কী করে বলতাম যে নকল বজলু আসলে মানুষ নয়...অন্য কিছু। ওর জন্ম অন্য কোন জগতে, যে জগতের সাথে মানুষের কোন পরিচয় নেই। ও অন্ধকারের জীব, বহুরূপী। আমিও তাই। রইসউদ্দিন অবশ্য মানুষ...রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু ও আমার বহুদিনের চেনাজানা, বিশ্বস্ত লোক। আমার আর ওর পরামর্শেই বজলু সেজে আমাকে সাহায্য করবার জন্য এসেছিল আমারই এক বন্ধু। বিথী কোনদিন জানবে না ওরকম একটা অখ্যাত জায়গায় আমি আসলে বেড়াতে যাইনি, গিয়েছিলাম প্রয়োজনে। ওই এলাকার দেড়শো বছরের পুরাতন, নির্দিষ্ট একটি কবরের মাটি না খেলে, আমার বয়স বাড়তে থাকে খুব দ্রুত। এসব কথা কখনও কেউ জানেনি, কেউ জানবেও না। শুধু জানে রইসউদ্দিন। কিন্তু সে খুব বিশ্বস্ত লোক। সে কারও কাছে মুখ খোলেনি, কখনও খুলবেও না। আর খুললেও কিছু যায় আসে না। ভুতুড়ে গল্প আজকাল কেউ বিশ্বাস করে? আপনারাই বলুন?

মোঃ ফজলে রাব্বি

ভৌতিক হাত

জমিয়ে গল্প বলছেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার মঁসিয়ে বারমুতিয়ের। অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়েই তাঁর কারবার। খুন-খারাবি, রহস্য এবং রোমাঞ্চে ভরা গল্পগুলো একের পর এক বলে যাচ্ছেন তিনি, একটার সূত্র ধরে আরেকটা, যেন অবলীলায় সিগারেটের আগুনে সিগারেট ধরাচ্ছেন।

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সেইন্ট-ক্লদ হত্যারহস্য ব্যাখ্যা করছিলেন বারমুতিয়ের। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছেন কৌতূহলী শ্রোতার দল। চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডটি মাত্র দুদিন আগে সংবাদপত্রের পাতায় বেরিয়েছে বড় বড় অক্ষরে এবং তার জের হিসেবে প্যারিসের পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, রেস্তোরাঁয় সর্বত্র চলছে তুমুল জল্পনা কল্পনা। শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছেন তাঁরা।

গল্পটা শেষ হওয়া মাত্র মহিলাদের মধ্যে থেকে তিলোত্তমা একজন বলে উঠলেন, 'মাগো! কী সাংঘাতিক! অবিশ্বাস্য ব্যাপার!! ভুতুড়ে কাণ্ড কাকে বলে।'

বারমুতিয়ের মহিলার দিকে তাকালেন। 'অবিশ্বাস্য? ঠিকই বলেছেন মাদাম,' বললেন তিনি, 'কিন্তু মাফ করবেন, ভুতুড়ে নয়। ভূত-প্রেতের কোন জায়গা নেই আমাদের পুলিশের খাতায়। এটা স্রেফ মার্ডার কেস। একটা অপরাধ। অপরাধী দারুণ সেয়ানা, কোন ক্লু রাখেনি। পাকা হাতের নিখুঁত কাজ। আর সেজন্যেই রহস্যজনক মনে হচ্ছে। কিন্তু ভুতুড়ে? উঁহুঁ।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আরেকটা গল্প বলি। এটা ঠিক ভুতুড়ে নয়,

তবে অদ্ভুতুড়ে বলতে পারেন।'

শ্রোতারা নড়েচড়ে বসলেন। বারমুতিয়ের একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছেড়ে শুরু করলেন:

'আমার পোস্টিং তখন কর্সিকার এজাসিও শহরে। সমুদ্রের তীরে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, ছোট শহরটার তিনদিক ঘিরে রেখেছে সারি সারি উঁচু পাহাড়, পর্বত আর জঙ্গল।

'কর্সিকানরা রক্ত-গরম, স্বাধীনচেতা জাত। ছোটখাট চুরি ছ্যাঁচড়ামির ঘটনা এখানে ঘটে না বললেই চলে। কেস যেগুলো আসত সবই খুন কিংবা বদলা-খুনের। রক্তের বদলে রক্ত ঝরিয়ে প্রতিশোধ–এটাই কর্সিকানদের রেওয়াজ। আইন-আদালত, বিচার-আচার এসবের বড় একটা ধার ধারে না কর্সিকানরা। ফলে খুনোখুনি একবার শুরু হয়ে গেলে সহজে তা থামত না, বংশানুক্রমে বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকত। প্রতিশোধ আর পাল্টা-প্রতিশোধের আগুনে অকাতরে আহুতি দিত বিবাদমান দু'পক্ষের নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা। মাত্র বছর দুয়েক ছিলাম সেখানে। সেই দুই বছরেই অসংখ্য মার্ডার কেসের তদন্ত করতে হয়েছে আমাকে।

'যাহোক, তদন্ত আর তল্লাশি করে দিনগুলো একরকম কেটে যাচ্ছিল। একদিন খবর পেলাম আমার এলাকায় রহস্যজনক এক লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। লোকটা বিদেশী এবং মালদার আদমি। সমুদ্রের ধারে নির্জন এক ভিলা লিজ নিয়ে সে বসবাস করতে শুরু করল। অচিরেই তার সম্পর্কে নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। শোনা গেল, লোকটা নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে। তার যাদুর শক্তিতে সে একটা বদরাগী প্রেতাত্মাকে বন্দী করে রেখেছে। প্রায়ই মাঝরাতে প্রেতাত্মার সাথে তার তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। শপাং শপাং চাবুক মারার শব্দও অনেকে শুনেছে। এরকম উদ্ভট অনেক কথাই শুনতে পেলাম।

'গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম লোকটা জাতে ইংরেজ। ভদ্রলোকের নাম জন রোয়েল। স্যর জন রোয়েল। বাড়িতে তিনি নিজে এবং ফরাসী এক চাকর ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী থাকে

না। প্রত্যেকদিন সকালে কাঁধে একটা রাইফেল আর কোমরে পিস্তল নিয়ে তিনি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যান এবং ঘণ্টাখানেক শুটিং প্র্যাকটিস করেন। মাঝে মাঝে তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে শিকার করতে এবং সমুদ্রে মাছ ধরতে দেখা যায়। এ ছাড়া সারাদিন নিজের বাড়িতেই থাকেন। কারও সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেন না, কিংবা শহরের দিকেও কখনও আসেন না। অনেক চেষ্টা করেও এর বেশি কিছু জানা গেল না। তবুও গোপনে আমার লোক দিয়ে বিদেশীটার উপর নজর রাখতে লাগলাম। কিন্তু সন্দেহজনক তেমন কোন রিপোর্ট পাওয়া গেল না।

'এদিকে গুজবের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। লোকে বলাবলি করতে লাগল ইংরেজ লোকটা ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। ভয়ঙ্কর অপরাধের নানারকম ফিরিস্তিও লোকের মুখে মুখে শোনা যেতে লাগল। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে ঠিক করলাম আমি নিজে এবার মাঠে নামব। পরদিন থেকেই তাঁর এলাকার মধ্যে শিকার করতে শুরু করে দিলাম।

'দিন কয়েকের মধ্যেই লোকটার সাথে পরিচয়ের একটা সুযোগ এসে গেল। সেদিন ভদ্রলোক নিজেও শিকারে বেরিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমরা দু'জন পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। এমনি সময় ঘটনাক্রমে একটা তিতিরকে আমরা দুজনেই একসাথে তাক করেছি। ভদ্রলোক মিস করা মাত্রই আমি গুলি ছুঁড়লাম। উড়ন্ত পাখিটা শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল। একটু পরেই আমার কুকুর ওটাকে মুখে করে নিয়ে এল। কালবিলম্ব না করে আমি শিকার হাতে জন রোয়েলের সামনে হাজির হলাম এবং তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করলাম তিনি যেন অনুগ্রহ করে পাখিটা গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর এলাকায় অনুমতি না নিয়ে শিকার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

'লাল চুল, লাল দাড়িঅলা, লম্বা লোক দেখতে অনেকটা হারকিউলিসের মত। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তবে বেশ অমায়িক। টিপিক্যাল ব্রিটিশদের মত গোমড়ামুখো নন। তিনি আমাকে

সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার সৌজন্যের জন্যে অসংখ্যবার ধন্যবাদ দিলেন। মাসখানেকের মধ্যে বার ছয়েক তাঁর সাথে এভাবে আমার দেখাসাক্ষাৎ এবং আলাপ হলো।

'একদিন বিকেলে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দেখি ভদ্রলোক বাগানে চেয়ার পেতে বসে সিগার টানছেন। সম্ভাষণ জানাতেই আমাকে এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

'বিয়ার খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন সমুদ্রের ধারের এই জায়গাটা তাঁর খুব ভাল লেগে গিয়েছে। সুযোগ বুঝে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলাম এবং সতর্কতার সাথে এটা ওটা প্রশ্ন করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বেশ খোলামনেই উত্তর দিচ্ছিলেন। জানতে পারলাম তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন। আফ্রিকা, ইণ্ডিয়া এবং আমেরিকা তাঁর ভালভাবেই দেখা হয়ে গেছে। একসময় হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ভাই, অ্যাডভেঞ্চার এই জীবনে কম হলো না।"

'এরপর শিকারের প্রসঙ্গ উঠল। ভদ্রলোক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন। বাঘ, হাতী, হিপো এবং গরিলা শিকারের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "এগুলো তো সবই ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী।"

'ভদ্রলোক হেসে বললেন, "হিংস্র তো বটেই। তবে মানুষের মত অতটা হিংস্র নয়।" কথাটা বলেই ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "অবশ্য মানুষও যে আমি দু'একটা শিকার করিনি এমন নয়।"

'এরপর তিনি আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর পিস্তল বন্দুকের সংগ্রহ আমাকে দেখাবার জন্যে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'ড্রইংরুম দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না এটা শিকারীর ঘর দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে বাঘ আর চিতার ছাল। দরজার উপরে বসানো দাঁতাল গণ্ডার এবং শিং[illegible] বাইসনের মাথা। বড় দেয়ালের

মাঝামাঝি একটুকরো গাঢ় লাল মখমলের গায়ে আমার চোখ আটকে গেল। ওটা কী? লাল কাপড়ের উপরে কালো ওটা কী? একটু এগিয়ে গেলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখি একটা হাত। কনুই থেকে কেটে নেওয়া একটা হাত ঝুলছে। হাতটার বিশাল পাঞ্জা আর অস্বাভাবিক লম্বা আঙুলগুলো দেখে আন্দাজ করা যায় যে হাতের মালিক খুব শক্তিশালী লোক ছিল।

'এমনিতেই ওই অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা আমাকে দারুণ চমকে দিয়েছে। তার উপর যখন দেখলাম ওটার কব্জিতে মোটা লোহার শিকল পরানো এবং শিকলটা দেয়ালে গাঁথা একটা মজবুত আংটার সাথে শক্ত করে আটকানো, তখন আমার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল।

'কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী?"

'ভদ্রলোক সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "আমার শত্রুর হাত।"

'আমি বললাম, "লোকটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ছিল!"

'মুচকি হেসে উত্তর দিলেন তিনি, "তা ছিল, তবে আমার চেয়ে বেশি নয়। প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছেন। শিকল পরিয়ে রেখেছি যাতে পালাতে না পারে।"

'হেঁয়ালি করছেন বুঝেও বললাম, "শিকলের প্রয়োজন কী? হাতটা তো আর সত্যি সত্যি পালাতে পারবে না।"

'জন রোয়েল গম্ভীরভাবে বললেন, "পারবে, সেজন্যেই শিকলের প্রয়োজন।"

'আড়চোখে চকিতে একবার তাঁকে দেখে নিলাম। লোকটা কী পাগল, না ইয়ার্কি মারছে? কিন্তু তাঁর চোখমুখ সিরিয়াস, ইয়ার্কি মারার কোন চিহ্ন সেখানে দেখতে পেলাম না। দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে আমি তাঁর সংগ্রহের আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করে আমার মনে খটকা লাগল। দেখলাম ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা শো-পিসগুলোর আড়ালে বেশ কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র। ভদ্রলোক খুব অল্প সময়ের জন্যে একবার ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে মর্মর পাথরের তৈরি ধবধবে সাদা ফুলদানিটার ভিতর থেকে আমি একটা রিভলভার তুলে নিয়ে দ্রুত

পরীক্ষা করলাম। ছটা চেম্বারেই গুলি ভরা। ভেনাসের মূর্তির আড়ালে রাখা বিভলভারটা আর পরীক্ষা করতে পারলাম না, তার আগেই জন রোয়েল ফিরে এলেন। তবু শুধু ওই অল্প সময়েই আমার যেটুকু দেখার ছিল, তা আমি দেখে নিয়েছি। মোট তিনটা রিভলভার আমার চোখে পড়েছে। সম্ভবত সব কটাই লোড করা। এভাবে হাতের কাছে প্রস্তুত এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র দেখে আমার মনে হলো-গৃহকর্তা যে কোন সময়, যে কোন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে এরকম আশঙ্কা করছেন। কিন্তু, এরকম আশঙ্কা করার কারণটা কী?

'এরপর আরও কয়েকবার আমি ভদ্রলোকের বাসায় গিয়েছি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই আর চোখে পড়েনি। মজার ব্যাপার এই যে, প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রমকে মানুষ যেভাবে মেনে নেয়, বিদঘুটে স্বভাবের এই লোকটির উপস্থিতিও আশেপাশের মানুষ সেভাবেই ধীরে ধীরে মেনে নিল। গুজবও ক্রমশ থিতিয়ে গেল।

'বছর খানেক পরের কথা। নভেম্বরের শেষাশেষি এক সকালে আমার চাকর আমাকে ডেকে তুলে খবর দিল আগের রাতে জন রোয়েলকে কে বা কারা হত্যা করেছে। মিনিট দশেক পরে পরিচিত বাড়িটাতে পৌঁছে দেখতে পেলাম ড্রইংরুমের মেঝেতে দামী পার্সিয়ান কার্পেটের উপর পড়ে আছে গৃহকর্তার মৃতদেহ। তাঁর চোখে মুখে তখনও লেগে আছে নিখাদ আতঙ্কের ছাপ। তাঁর বিপর্যস্ত চেহারা, অবিন্যস্ত কাপড়চোপড় এবং ঘরের আসবাবপত্রের লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে বোঝা যায় মৃত্যুর আগে প্রাণপণ লড়াই করেছেন স্যর জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। হাতের নাগালের মধ্যে এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, অথচ সেগুলো কোন কাজেই আসেনি!

'ডাক্তারের তাৎক্ষণিক রিপোর্টে জানা গেল শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে স্যর জন রোয়েলকে। মৃতদেহের গলায় এবং ঘাড়ে আঙুলের দাগগুলো গভীর মনোযোগের সাথে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর মুখ থেকে স্বগতোক্তির মত

বেরিয়ে এল, "আশ্চর্য! এগুলো কি মানুষের আঙুল, না কঙ্কালের!"

'অস্ফুট কথাটা কানে আসা মাত্র আপনা থেকেই আমার চোখ গেল দেয়ালের গায়ে লাল মখমলের উপর। হাতটা ওখানে নেই। দেয়ালে ঝুলছে ভাঙা শেকড়ের টুকরো।

'মৃতদেহটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। দুটো জিনিস আমার নজরে পড়ল। মৃতদেহের ঘাড়ে ও গলায় পাঁচ পাঁচটা গভীর গর্ত, যেন লোহার শলাকা ফুঁড়ে তৈরি হয়েছে। আর দাঁতে দাঁত চেপে রাখা মুখের ভিতরে পাওয়া গেল কামড়ে নেয়া কাটা আঙুলের ছোট্ট একটা টুকরো।

'হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে পুলিশের যা যা করণীয়, এরপর একে একে সেসব করা হলো। বাড়ির ভিতরে, বাইরে এবং চারপাশটায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হত্যাকারীর পায়ের ছাপ কিংবা অন্য কোন ক্লু পাওয়া গেল না।

'চাকরটার জবানবন্দী নেয়া হলো। সে জানাল কিছুদিন ধরে তার মনিবকে খুব উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তাঁর নামে চিঠিপত্র আগে খুব একটা আসত না, কিন্তু ইদানীং প্রায় প্রতিদিনই একটা করে চিঠি আসতে শুরু করে। পড়া শেষ করেই জন রোয়েল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন। একেক দিন গভীর রাতে উদ্ভট আচরণ করতে দেখা যেত তাঁকে। দেখা যেত ড্রইংরুমে কাটা হাতটার সামনে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য কাকে যেন চিৎকার করে শাসাচ্ছেন তিনি। তারপরই হয়তো হাতটা লক্ষ্য করে শপাং শপাং চাবুক চালাচ্ছেন। এভাবে রাত পার করে ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে যেতেন। ঘুমানোর সময় তাঁর বালিশের নীচে থাকত গুলি ভরা পিস্তল।

'ঘটনার রাতে অবশ্য উদ্ভট কোনকিছু করতে দেখা যায়নি তাঁকে। ড্রইংরুমে চেঁচামেচি কিংবা শাসানির শব্দও শোনা যায়নি। বরাবরের মত সকালে ড্রইংরুমের জানালা খুলে দিতে গিয়ে চাকর তাঁকে মৃত অবস্থায় কার্পেটের ওপর পড়ে থাকতে দেখে।

'পোস্ট মর্টেম ইত্যাদি করার পর স্থানীয় সমাধিক্ষেত্রে স্যার জন রোয়েলের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

'এর পর তদন্ত চলল দিনের পর দিন। হত্যাকারীকে ধরার জন্য পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা চালাল। কিন্তু বৃথা। হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

'মাসতিনেক পরে এক রাতে আমি একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। আসলে সেটা ছিল ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। দেখলাম সেই কালো কুৎসিত হাতটা আমার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আঙুলগুলোকে পায়ের মত ব্যবহার করে কাঁকড়া কিংবা মাকড়সার মত সারা ঘরময় দ্রুতবেগে ছুটোছুটি করছে হাতটা। অদ্ভুতদর্শন জিনিসটা মেঝেতে হাঁটছে, চেয়ারে উঠছে, টেবিলে চড়ছে এবং অনায়াসে এক দেয়াল বেয়ে উঠে গিয়ে ছাদ পার হয়ে অন্য দেয়াল দিয়ে নেমে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় বিছানায় উঠে এসে আমার গা বেয়ে উঠতে লাগল হাতটা। মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি হতেই আচমকা ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। শীতের মধ্যেও দেখি দরদর করে ঘামছি। আলো জ্বালিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু নেই। কিন্তু তখনও বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস শব্দে লাফাচ্ছে। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর বহু কষ্টে যখন একটু তন্দ্রা মতন এসেছে, সেই সময় আবার সেই একই দৃশ্য স্বপ্নে দেখলাম।

'এভাবে এক রাতে বার তিনেক একই দুঃস্বপ্ন দেখে সকালে ঘুম ভাঙল চাকরের ডাকাডাকিতে। চোখ মেলে দেখি তার হাতে ঝুলছে সেই হাত, যে হাত শোভা পেত স্যর জনের বৈঠকখানায়, যে হাত গত রাতে আমার কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার—হাতটায় চারটে আঙুল, ওটার তর্জনীটা নিখোঁজ।

'চাকর জানাল, জন রোয়েলের কবরের উপরে হাতটা পাওয়া গেছে।'

মঁসিয়ে বারমুতিয়ের তাঁর গল্প শেষ করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিলোত্তমা মহিলাটি বললেন, 'মাগো! কী সাংঘাতিক। এর পরেও কি আপনি বলবেন আপনাদের পুলিশের খাতায় ভূত-প্রেতের কোন জায়গা নেই?'

পলিশ অফিসার হাসলেন। বললেন, 'উল্টোটা বলতে পারলেই

খুশি হতাম, মাদাম।'

'বেশ, তা হলে বলুন আপনার গল্পের ভৌতিক হাতের ব্যাখ্যাটা কী?' মহিলা প্রশ্ন করলেন।

'ব্যাখ্যা একটা আছে,' বারমুতিয়ের বললেন, 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের সেটা পছন্দ হবে না।'

'তবু বলুন, শোনা যাক,' শ্রোতাদের অনেকেই এবার এক সাথে বলে উঠলেন।

বারমুতিয়ের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষে বললেন, 'ব্যাখ্যাটা খুব সহজ। কাটা হাতটার আসল মালিক যে ব্যক্তি, ধরা যাক সে জীবিত। এটুকু ধরে নিলেই বাকিটা ঠিক ঠিক মিলে যাবে। হাতকাটা লোকটা এসেছিল প্রতিশোধ নিতে এবং প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে গেছে।'

সবাই চুপ করে থাকলেও তিলোত্তমা মহিলাটি মৃদু আপত্তি তুললেন, 'কিন্তু...'

মূলঃ গী দ্য মোপাসাঁ
রূপান্তরঃ খুররম মমতাজ

অশরীরী

তিনতলায় এত সুন্দর একটা ফ্ল্যাট এত কম ভাড়ায় পেয়ে যাবে, কল্পনাও করেনি সাইদ। এখন চিন্তা কেবল একটাই, মিলা ফ্ল্যাটটা পছন্দ করবে কি না। তবে সাইদের দৃঢ় বিশ্বাস, মিলাও পছন্দ করবে।

দুই বেড, ড্রইং-ডাইনিং, কিচেন আর দুটো বারান্দা মিলিয়ে অসাধারণ বাসাটা। তার চাইতেও অসাধারণ হচ্ছে ভাড়ার ব্যাপারটা। এই বাজারে এ রকম বাসার যে ভাড়া হওয়া উচিত তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র ভাড়া। সাইদ কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বাড়িওয়ালাকে প্রশ্নটা করেই ফেলে, 'রহমান সাহেব, এত সুন্দর ফ্ল্যাট অথচ ভাড়া এত কম! কোন সমস্যা নেই তো?'

বাড়িওয়ালা রহমান সাহেব যেন খানিকটা বিব্রত বোধ করেন। তারপর বলেন, 'সমস্যা একটা আছে। ফ্ল্যাটটার একটু ভৌতিক সমস্যা আছে।'

সাইদ ভাবে রহমান সাহেব রসিকতা করছেন, কিন্তু রহমান সাহেবের চেহারা দেখে বোঝে, না, ভদ্রলোক সিরিয়াস।

'আপনি দেখেছেন?' প্রশ্ন করে সাইদ।

রহমান সাহেবকে আরও বিব্রত দেখায়, 'না, ঠিক আমি দেখিনি, তবে ঘটনাটা খুলে বলি আপনাকে। এই ফ্ল্যাটে কয়েক বছর আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আনফরচুনেটলি তখন যাঁরা ভাড়া ছিলেন সেই মহিলা আর তাঁর বাচ্চাটা মারা যায়। তবে ব্যাপারটা খুন-জখম কিছুই না। আগুনে পুড়ে মৃত্যু। মহিলা বাচ্চা কোলে রান্না করছিলেন হয়তো। এমন সময় চুলা থেকে তাঁর শাড়িতে আগুন লাগে। খুবই

স্যাড আর আনফরচুনেট ঘটনা। তারপর অবশ্য মাস ছয়েক ফ্ল্যাট খালি ছিল। মাস ছ'য়েক পর প্রথম ভাড়া দেই আমি ফ্ল্যাটটা, কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেয় ওরা। এরপর আরও দুটো ফ্যামিলি ভাড়া নিয়েছিল ফ্ল্যাটটা, কিন্তু তারাও দিন সাতেকের মধ্যে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যায়। সবার একই কমপ্লেন, বাসাটা নাকি ভূতুড়ে।'

কোন কথা না বলে হাত বাড়ায় সাইদ, বলে, 'কোন চিন্তা নেই, রহমান সাহেব, আমি ভূতে মোটেও ভয় পাই না। আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে ভাড়া দিতে পারেন। তবে শর্ত একটাই, ভাড়া কিন্তু বাড়ানো চলবে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়িওয়ালা রহমান সাহেব বলেন, 'আমি রাজি।'

'তবে আরও একটা শর্ত আছে,' বলে সাইদ, 'আমার ওয়াইফ, মিলা ওর নাম। ওকে কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু জানাবেন না।'

হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ান রহমান সাহেব, বলেন, 'যেমন আপনার ইচ্ছা।'

নতুন সংসার, আসবাব বলতে হালকা রড আয়রনের সামান্য কটি জিনিস, কিন্তু সে সব তুলতে আর গুছিয়ে রাখতে যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তে হবে সাইদ কল্পনাও করেনি। এ মুহূর্তে সাইদ ওদের খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে। মিলা কিছুক্ষণ ওদের বিশাল সুটকেসটা টানাটানি করে সাইদের পাশে এসে একই ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। সাইদ লক্ষ করে, মিলার নাকের চারপাশ জুড়ে চিনির দানার মত ঘাম জমে আছে। সাইদের একাগ্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা দেখে মুখ ভেঙচায় মিলা। সাইদও মিলার মত মুখ বাঁকিয়ে মুখভঙ্গি করবার চেষ্টা করে। তারপর দু'জনেই ওরা হেসে ওঠে। নিঃস্তরঙ্গ বিকেলের মৌনতা যেন হঠাৎ ভেঙে যায়। এমন সময় দরজায় বেরসিক ঠক ঠক শব্দ শুনে উঠে পড়ে সাইদ। দরজা খুলে দেখে গ্যাসের চুলো লাগানোর মিস্ত্রি এসে গেছে। কিচেনে ঢুকে দাঁড়িয়ে থেকে চুলাটা লাগানো দেখে সাইদ। মিস্ত্রিকে ভাল করে চেক করে দেখতে বলে, কোন গ্যাস লিক করছে কি না। নিজেও ক'বার চেক করে দেখে

মিস্ত্রিকে বিদায় করে ও।

তারপর শোবার ঘরে এসে দেখে এতক্ষণে মিলা ঘরটাকে অনেকটা গুছিয়ে এনেছে। মিলার কোমর জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে সাইদ বলে, 'লক্ষ্মী বউ আমার।'

মিলা বলে, 'কোন লাভ নেই, সাহেব। আজকে আমি কোন অবস্থাতেই রান্নার ঝামেলায় যাব না।'

সাইদ আহত স্বরে বলে, 'তোমার কি ধারণা তোমাকে আমি আদর করছি রান্না করাবার ফন্দিতে? জ্বী না, মিলা, আপনাকে আজকে রান্না বান্না কিচ্ছু করতে হবে না। আজ আমরা বাইরে খাব।' এমন সময় হঠাৎ সাইদের মনে হয় ঠিক ওদের পেছন থেকে কেউ একজন দেখছে ওদের। কারও ঠাণ্ডা একটা দৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করে সাইদ। আস্তে আস্তে অনুভূতিটা বাড়তে থাকে। শিথিল হাতে মিলার কোমড় ছেড়ে চট্ করে ঘুরে দাঁড়ায় সাইদ। আবছা একটা ছায়া সরে যায় যেন।

মিলা প্রশ্ন করে, 'কী হলো, সাইদ?'

সাইদ হাসি মুখে বলে, 'কিছু না, আমার মনে হলো মেইন গেটটা বোধহয় ভুলে খুলে রেখে এসেছি।'

মিলা হেসে ফেলে বলে, 'দূর, মিস্ত্রি চলে যাবার পর তুমি নিজে বন্ধ করলে না।' তারপর সাইদকে পাশ কাটিয়ে ঘরগুলো ঘুরে দেখতে থাকে মিলা। বারান্দায় গিয়ে বলে, 'কী সুন্দর ফ্ল্যাট! কেমন করে জোগাড় করলেন, সাহেব!'

সাইদ মাথা নেড়ে ভারী গলায় বলে, 'স্ত্রী ভাগ্য, আর কী!'

সন্ধ্যায় বের হবার আগে গোসল করতে ঢোকে মিলা। সাইদ জানে, মিলা বাথরুমে ঢুকলে ঘণ্টা খানেকের আগে বের হবে না। বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে সাইদ প্রশ্ন করে, 'মিলা, আমি একটু নীচে যাচ্ছি, সিগারেট আনতে, তুমি ভয় পাবে না তো?'

শাওয়ারের শব্দ ছাপিয়ে মিলার কণ্ঠ শোনা যায়, 'হ্যাঁ, যাও, তবে দরজার চাবি নিয়ে যেয়ো, আমি কিন্তু দরজা খুলতে পারব না। আমার দেরি হবে।'

নীচে যাবার আগে রুমগুলো আর একবার ঘুরে দেখে সাইদ। তারপর শ্বাস ফেলে ভাবে, দূর শালা, আসলে তো দেখি আমিই ভয় পাচ্ছি। তারপর সিগারেট আনবার জন্য রওনা দেয় সাইদ।

শাওয়ারের রিমঝিম শব্দের মাঝে সাইদের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ পায় মিলা। এতক্ষণ গুনগুন করছিল মিলা, এবার একটু জোরে গান করে। এই এক অদ্ভুত অভ্যাস ওর। শাওয়ারের নীচে দাঁড়ালে যেন ওর গান গাইতেই হবে। কিছুক্ষণ গান করবার পর ঘরের ভিতর খুটখাট শব্দ শুনে গলা নামিয়ে ফেলে মিলা। সাইদ কি এসে গেছে নাকি এত তাড়াতাড়ি? হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে মিলার, উঁচু গলায় মিলা ডাকে, 'সাইদ, সাইদ!'

কোন উত্তর না দিয়ে শব্দটা বেড়ে ওঠে শুধু।

এবার মিলা বেশ জোরে বলে, 'সাইদ, ভয় দেখাবে না প্লিজ, আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি।'

শব্দটা থেমে যায় চট্ করে। কিন্তু মিলার মনে হয় ঠিক ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। মিলা অনুভব করে, শিরশির করে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে ভয়ের স্রোত। মিলা স্পষ্ট বুঝতে পারে, ঠিক ওর পেছনটাতেই দাঁড়িয়ে অশরীরী কেউ একজন। একটা ঠাণ্ডা হাত যেন স্পর্শ করে মিলার কাঁধ। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁপুনি উঠে যায় মিলার। ভয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে মিলা ঠিক করে ঘুরে দাঁড়াবে ও, দেখবে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ওটা কী। এমন সময় দরজা খুলবার শব্দ শোনে মিলা। শোনে সাইদের গলা, সাইদ বেসুরো গলায় গান গাইছে, 'এক আকাশের তারা তুই, একা গুনিসনে।'

মিলার ভয় কেটে যায়, চট্ করে ঘুরে বেসিনের আয়নায় নিজেকে দেখে হেসে ফেলে মিলা, ভয় পেয়ে কী অদ্ভুত চেহারাই না হয়েছে ওর।

বাইরে খাওয়া সেরে ওদের ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়। জামা কাপড় বদলে বিছানায় শুয়ে খানিক খুনসুটি করে ওরা। তারপর নিয়ম মত ঘুমের ভান শুরু করে সাইদ। মিলা ঘুমিয়ে পড়ে একসময়

তারপর চোখ মেলে সাইদ। মাঝে মাঝেই এটা করে সাইদ। ডিম লাইটের হালকা আলোয় মিলার ঘুমন্ত মুখ যেন মোমের মত দেখায়। সাইদের মনে হয়, যেন ঘুমন্ত কোন রাজকন্যাকে দেখছে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে দু'একটা অস্পষ্ট শব্দ করে মিলা, হাসেও মাঝে মাঝে। সাইদ শুধু মুগ্ধ আবেগ নিয়ে দেখে যায়। গভীর ঘুম মিলার, মাঝে মাঝে দু'একবার শব্দ করে পরীক্ষা করেছে সাইদ, মিলা মোটেও টের পায় না। আর তরুণ বয়স থেকেই রাত জাগা সাইদের অভ্যাস, সামান্য শব্দেই ও জেগে যায়। তন্ময় সাইদের চমক ভাঙে খুটখাট শব্দে। মাথা তোলে সাইদ, কোথাও কোন কাগজ পড়ে নেই তো? ফ্যানের বাতাসে উড়ে ওকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করছে! শব্দের উৎস খুঁজবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সাইদ। মনে হচ্ছে রান্নাঘর থেকে আসছে শব্দটা। এমন সময় চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ শুনে গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে যায় সাইদের। বিড়বিড় করে সাইদ নিজেই নিজেকে বোঝায়, হ্যালুসিনেশন হচ্ছে ওর। ভূত বলে কিছু নেই। এখন ওকে রান্নাঘরে যেতে হবে, প্রমাণ করতে হবে এটা ভ্রম। নয়তো ভয়টা বাড়তেই থাকবে।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে পড়ে সাইদ। আবারও ফিসফিস কথা যেন ভেসে আসে রান্নাঘর থেকে। সাইদের অবচেতন মন কিছু একটা অনুভব করে। এক পা, দু'পা করে মনের বিরুদ্ধে রান্নাঘরের দিকে এগোতে থাকে সাইদ। দরজা থেকে দেখে মনে হয় আবছা আলোয় ভরে আছে রান্নাঘর। থমকে যায় সাইদ। হঠাৎ ছোট্ট একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সাইদ ওর পেছনে। দরদর করে ঘামতে থাকে সাইদ। বহু কষ্টে পেছনে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে যায় সাইদ। বছর দুয়েকের ছোট্ট একটা শিশু ওদের ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। পায়ের নীচটা দুলতে থাকে সাইদের। সাইদ দেখে শিশুটা ওর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, কাছাকাছি আসবার পর বুঝতে পারে সাইদ, অসম্ভব পোড়া আর বিকৃত একটা শিশুর দিকে তাকিয়ে আছে ও। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে অপার্থিব এক কান্না। শিশুটা হাত বাড়ায় সাইদের দিকে

হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায় সাইদ, ও বুঝতে পারে ভয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে ও। আস্তে আস্তে শিশুটির বাড়ানো বরফ শীতল হাতটা ধরে ফেলে সাইদ, আর তখনি ও বুঝতে পারে, পুরো ব্যাপারটা কী! আসলে কী ঘটেছিল সেদিন। শিশুটির মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে নয়, শিশুটিকে এ ঘরে রেখে রান্না করছিলেন। তাঁর শাড়িতে আগুন লাগবার সাথে সাথে চিৎকার করেন তিনি। অবুঝ শিশুটি কিছু না বুঝেই দৌড়ে যায় রান্নাঘরে, মাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে নিজেও পুড়ে যায়। পুরো ঘটনাটা যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখে সাইদ। বিকৃত শিশুটির হাত ধরে ধীর পায়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে সাইদ। সেখানে দাঁড়িয়ে অসম্ভব বিকৃত চেহারার এক নারী। সাইদ কোন কথা বলে না। নারীটি এগিয়ে এসে সাইদের হাত থেকে শিশুটিকে কাছে টেনে নেয়। সাইদ বলে, 'আমি জানি আপনারা দু'জনেই খুব কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এতে আপনার বা বাচ্চাটার কারোরই কোন দোষ ছিল না।'

অপার্থিব এক হাহাকার শুনে জমে যায় সাইদ। কতক্ষণ পর জানে না ও, মিলার কণ্ঠ শুনে চমক ভাঙে ওর। ঘুম জড়ানো চোখে মিলা বলে, 'এই রাত দুপুরে রান্নাঘরে কী করছ তুমি?'

'কিছু না,' জবাব দেয় সাইদ।

তারপর দিন কেটে যায়। মিলাকেও পুরো ঘটনাটা বলে সাইদ। সব শুনে মিলার মুখটা খুব দুঃখী দুঃখী হয়ে ওঠে। বলে, 'ইস্, কতটাই না কষ্ট পেয়েছেন ওঁরা।'

আর কোনদিন সামান্যতম ভয়ও পায়নি মিলা আর সাইদ। বাড়িওয়ালা রহমান সাহেব কথা রেখেছেন, ভাড়া বাড়াননি তিনি। তবে মাঝে মাঝে সাইদ, এমনকী মিলাও অনুভব করে, কেউ একজন বড় আকাঙ্ক্ষা আর কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওদের।

সরদার শাহরিয়ার মোস্তফা

মোনালিসা

এক

বিশাল এক দানব ধেয়ে আসছে ময়নার দিকে। লালা ঝরছে ওটার মুখ থেকে। এককেক পা ফেলছে মাটিতে আর কেঁপে উঠছে মাটি। হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়ল দানবটা। কিন্তু থেমে থাকল না ময়না। পড়িমরি করে ছুটছে। যে করেই হোক সামনের ওই বিশাল প্রাসাদে আত্মগোপন করতে হবে।

কিন্তু প্রাসাদের দরজার কাছে আসতেই থেমে গেল সে। দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে। আঁতকে উঠল দরজার কড়ায় ইয়া বড় এক তালা ঝুলতে দেখে। এখন?

ধ্রাম! ধ্রাম!

মরিয়া হয়ে দরজায় থাবা বসাল ময়না। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, অনেকটা কাছে চলে এসেছে দানব। আসছে একটু একটু করে।

পাঁচ হাত!

চার হাত!

তিন হাত!

ধ্রাম! ধ্রাম! ধ্রাম!

দু'হাত!

এক হাত!

আচমকা পিঠে খামচি অনুভব করল ময়না। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে মেঝের ওপর।

কাঁপছে ময়না। 'উত্তেজনায় এখনও ওঠানামা করছে বুক। গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে।

একবার, দু'বার, তিনবার চোখ পিটপিট করল ময়না। অবাক বিস্ময়ে চাইল এদিক-ওদিক। কোথায় সে? এটা তো একটা কামরা। চারদিকে সোফা, টেলিভিশন, শো-কেস আরও অনেক কিছু।

মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ময়না। ধুর! এসব কী! মনে মনে বলেই হেসে ফেলল ও। এতক্ষণ তা হলে স্বপ্ন দেখছিল। আসলে একগাদা বাসন মেজে ক্লান্ত হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতই বা বয়স ওর! মাত্র এগারো। এই বয়সে এতবড় একটা বাসার সমস্ত কাজকর্ম সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়।

সোফার নীচে চোখ চলে গেল ময়নার। ও, তা হলে এই ব্যাপার? আসলে দানব টানব কিছু নয় বিচ্ছু খরগোশগুলোয় আঁচড়ে দিয়েছিল ওর পিঠ। কেন যেন, ময়নার ঘুম একেবারেই সহ্য করতে পারে না ওরা। যখনই একটু ঘুমায়, বুকে, পেটে উঠে উপদ্রব শুরু করে।

খরগোশগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল ময়নার মন। এ বাড়িতে প্রথম যেদিন এসেছিল মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। অনুপম মামু, মানে এ বাসার মালিক, কমলাপুরের ফুটপাথ থেকে তুলে নিয়ে এল ওকে। জানা নেই শোনা নেই, প্রথমে লোকটার সাথে আসতে একটু ভয় ভয় করছিল ময়নার। কিন্তু লোকটা যখন মায়ের হাতে কড়কড়ে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে দিল এবং বলল, 'খালাম্মা, কোন চিন্তা নেই। আপনার মেয়ে আমার বাসায় ভালই থাকবে। এরকম একটা মেয়ের খুব প্রয়োজন আমার। ঘরের কাজকর্ম করবে, খাবে, টেলিভিশন দেখবে। তা ছাড়া আমার একটা ছোট্ট ছেলেও রয়েছে, ওর দেখাশোনা...'

সেই যে আজমপুরে ওকে নিয়ে এল অনুপম মামু, তারপর প্রায় দেড়বছর হয়ে গেছে মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হয়নি ময়নার। কতবার বলেছে ময়না, কাকুতি-মিনতি করেছে, কোন লাভ হয়নি। বাসায় এসে মামুর ভিন্নরূপ দেখেছে সে। চরম কঠোর। কথায় কথায় মারধর করে।

আসলে ময়নার কপালটাই খারাপ। না হলে আর এরকম হয়। এ বাড়ির সকলেই খারাপ। একটু এদিক-ওদিক হলেই রুদ্রমূর্তি ধারণ

করে বসে সবাই। এমনকী ওর-চেয়ে দু'বছরের ছোট আকুলও। অনুপম মামুর ছেলে। একবার দুধ আনতে একটু দেরি হয়েছিল ময়নার। ঘাড়ের ওপর খুনতি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল আকুল। তারপর, সে কী রক্ত! ব্যথায় প্রায় একমাস ঘুমোতে পারেনি সে। অথচ আকুলকে কিচ্ছু বলেনি ওর বাবা-মা।

একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারে না ময়না। এখানে, ওকে দেখতে একবারও আসে না কেন বাবা-মা? ঠিকানা জানে না? নাকি আসতে ভয় পায়? নাহ্, এ বাড়ির ঠিকানা তো জানা আছে বাবার। ওকে যেদিন কড়কড়ে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে নিয়ে এসেছিল অনুপম মামু সেদিনই বাবাকে দিয়ে এসেছিল ঠিকানাটা। তা হলে? আসে না কেন ওরা?

আচ্ছা, এক-কাজ করলে কেমন হয়? এরা তো কিছুতেই যেতে দেবে না ওকে। চুপি চুপি একদিন পালালে কেমন হয়? ফুড়ুৎ করে দৌড় মারবে। একবার পালাতে পারলে আর কে পায় ওকে। গিয়ে ঝুপ করে উঠে পড়বে মায়ের কোলে। ব্যস।

'ময়না! এই ময়না!' দরাজ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছেন লিলি মামী। পড়িমরি করে ছুটল ময়না।

'জ্বি, মামী।'

আগুনে দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন লিলি মামী। কর্কশ স্বরে জানতে চাইলেন, 'কোথায় মরেছিলি?'

'জ্বি, ড্রইং রুমে...উফ...' মামীর চড় খেয়েই থেমে গেল ময়না। গুঙিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল দু'পা।

'এখানে ঘুমোতে এসেছিস হারামজাদি?' রাগে থরথর করে কাঁপছেন লিলি মামী, মাজায় কাপড় গুঁজে আরেকটা চড় মরার জন্য হাত তুললেন। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেল ময়না।

বাইরে কলিং বেল বাজছে।

ভঙ্গিমা বদলে দেয়াল ঘড়ি দেখলেন লিলি মামী। রাত এগারোটা। বললেন, 'যা তোর মামা এসেছে, গেট খুলে দে।'

আতঙ্কে কাঁপছিল ময়না। টলতে টলতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দুই

দরজা খুলতেই ছিটকে পেছনে সরে এল ময়না। না ভয়ে নয়, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অনুপম মামু বেদম এক লাথি কষে দিয়েছে ওর পেটে।

ক্ষণিকের ব্যথায় নীলচে হয়ে গেল ময়না। ফুঁপিয়ে উঠেছিল প্রায়, কোনরকমে সংবরণ করল নিজেকে। জানে, কাঁদলে এই রাতের অন্ধকারেই ওকে গলা টিপে শেষ করে দেবে লোকটা।

'হারামজাদি! ঘুমাও?' গর্জে উঠল অনুপম মামু। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, তবু দাঁড়াল ময়না। এগিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। ইয়া বড় কী একটা নিয়ে যেন ঘরে ঢুকল অনুপম মামু। রাগে এখনও গজ্‌গজ্‌ করছে। সিধে চলে গেল বেডরুমের দিকে।

দরজা আটকে ড্রইং রুমের কার্পেটে একটু বসল ময়না। তলপেটের ভেতর কলকল শব্দ করছে। কিন্তু আশ্চর্য, ব্যথা নেই একটুও। যাক, তবু বাঁচা গেছে। এ মুহূর্তে যদি ব্যথার চোটে কাজকর্ম না করতে পারত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। ওর কথা বিশ্বাসই করত না কেউ।

কী এমন দোষ করেছে ময়না যে জন্যে ওর পেটে এত জোরে লাথি মারল অনুপম মামু? দেরি করে ফেলেছে দরজা খুলতে? কই, না তো! বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়ে খুলেছে সে দরজা। তা হলে? হয়তো বাইরে থেকেই রেগে মেগে ফিরেছে মামু। মেজাজ খারাপ ছিল। হয়তো বা। তা ছাড়া লোকটাও যে এমন কিছু সুবিধার তা তো নয়। বিনা অপরাধেই মারধর করে।

প্রায়ই খালি হাতে আসে অনুপম মামু। কিন্তু আজ কী যেন একটা নিয়ে এসেছেন হাতে করে। জিনিসটা কী? বোধহয় ছবি। এর আগেও লিলি মামীকে এ ধরনের একটা জিনিস নিয়ে ঢুকতে দেখেছে ময়না।

পরে জেনেছে, ওটা একটা বিদেশী কুকুরের ছবি। ঘরে টাঙিয়ে রাখার জন্য নিয়ে এসেছে।

ঘরে আবার কুকুরের ছবি! আবডালে আবডালে হেসেই খুন হয়েছিল সেবার ময়না। ভাবছে, এবারও কি কুকুর বিড়ালের ছবি নিয়ে এসেছে নাকি মামু?

ধুর, মামু কেন, ছাই! দু'বেলা যে লোক মারে সে আমার মায়ের ভাই হতে পারে নাকি? তার চেয়ে লোকটাকে শুয়োর বলে ডাকলে মজা পেত ময়না। বুনো শুয়োর। বাপরে বাপ! কী একেকটা হাত-পায়ের সাইজ। যেন মোটা মোটা লোহার ডাণ্ডা। আর ওগুলো দিয়েই তাকে পেটায় লোকটা। থুঃ! মরবে মরবে, ময়না অভিশাপ দিচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি মরবে ওরা।

ওদিকে মোনালিসার বড় ছবিটা নিয়ে আলাপ শুরু করে দিয়েছে অনুপম মামু, আর লিলি মামী।

'হ্যাঁ গো, তারপর, বলো না কোথায় পেলে ছবিটা? ইস্! কী সুন্দর! এরকমই একটা ছবি কত না খুঁজেছি।'

'আহ্, অত ব্যস্ত হবার কী আছে?' স্ত্রীকে বাধা দিল অনুপম মামু। 'বলছি তো কিনিনি, একজন উপহার দিয়েছে।'

'তাই! কে দিল?'

'তোমার এক বান্ধবী।'

'আমার বান্ধবী! কই, উপহার দেবার মত কারও কথা মনে পড়ছে না তো আমার।'

নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল অনুপম মামু। 'বুঝতে পারছ না তা হলে?' স্ত্রীকে নাজেহাল হতে দেখে মজা পাচ্ছে যেন।

'না,' এদিক-ওদিক মাথা দোলাল মামী।

'তা হলে বরং বলছি, আয়েশা গিফট করেছে তোমাকে। তোমার সেই প্রিয় বান্ধবী।'

শুনে আকাশ থেকে পড়ল লিলি মামী। স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'কী যা তা বলছ, আয়েশা তো রাজশাহী থাকে। ঢাকায় এল কবে?'

'এসেছে, এসেছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এসেছে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই রাস্তায় দেখা হলো ওদের সাথে।'

'রাস্তায়! এতরাতে?'

'হুম। রিক্‌শায় মিরপুর যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই ডাকাডাকি। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে কাছ থেকে দেখেই মনে পড়ল তোমার বান্ধবী।'

'তারপর?'

'কথাবার্তা হলো। ঢাকায় নাকি ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। সেখানেই উঠেছে। ও হ্যাঁ, আগামীকাল ওদের ওখানে পার্টি দিচ্ছে। ঠিকানা দিয়ে বলল, অবশ্যই যেন উপস্থিত থাকি আমরা। যাবে তো?'

'হ্যাঁ, সে যাব। কিন্তু ছবিটা?'

দাঁত বের করে আবার নিঃশব্দে হাসলেন অনুপম মামু। 'তোমার জন্যই কিনেছিল। উপহার। আগামীকাল পার্টির দাওয়াত দিতে বাড়িতে আসত ওরা। তখনই সারপ্রাইজ দিত তোমাকে। কিন্তু রাস্তায় এই বান্দাকে পেয়ে যেতেই এককাজে দু'কাজ সারল এই আর কী।'

সমস্ত রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো লিলি মামীর। আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারা। বান্ধবীর পাঠানো জিনিসটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু একটা কথা ভাবাচ্ছে তাঁকে। লিলি যে এ জিনিস পছন্দ করে তা জানল কী করে আয়েশা? এটা তো জানার কথা নয় কারও। এমন ছবি যে একটা কিনবে তা শুধু মনে মনে খুঁজে ফিরছিল সে। কাউকে বলেনি। তা হলে? কাকতালীয়?

তিন

সকালে ঘুম ভাঙতেই হৈ হুল্লা শুরু করে দিল লিলি মামী। কোথায় লাগানো যায় ছবিটা এই নিয়ে স্বামীর সাথে মৃদু খুনসুটি। অবশেষে মতের মিল হলো। মামু মামী দু'জনেই ঠিক করলেন ড্রইং রুমে লাগানো হবে ছবিটা। ব্যস, আর কে ঠেকায়। আকুল একবার মিনমিনে কণ্ঠে বলেছিল, 'আম্মু, ছবিটা দেখে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। ফেলে দাও।'

এত্ত বড় কথা। মুখ ঝামটি দিয়ে মামী বলেছিলেন, 'সর চোখের সামনে থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গিয়েছিল বেচারা।

কিন্তু ছবিটা দেখে ভয় পাওয়ার ব্যাপারে আকুলের সাথে ময়নাও একমত। মোটা মোটা চোখ, একরাশ কালো চুল, মুখে মৃদু হাসি, দাঁড়িয়ে রয়েছে জনমানবহীন নিস্তব্ধ এক পাহাড়ী এলাকার অন্তরালে। বাপরে, দেখলেই ময়নার গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, এই বুঝি জ্যান্ত হয়ে ফ্রেমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে মেয়েটা। অথবা মৃদু হাস্যরত ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে ধারাল লালচে দাঁত।

একটা ব্যাপার কেমন সন্দেহে ফেলে দিয়েছে ময়নাকে। ও যে দিকেই যাচ্ছে ছবির মেয়েটিও সেদিকেই তাকাচ্ছে। ময়নার মনে হলো, চোখের অশুভ কিছু ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওকে। দুর্বল ঠেকছে। কিন্তু এসব কাউকে বলল না ও।

সেদিন সন্ধে লাগার কিছুক্ষণ আগেই অনুপম মামু অফিস থেকে ফিরে এল। বাসায় মামী আর আকুল তৈরিই ছিল। ময়নাকে সাবধানে থাকতে বলে সাতটা দশে বেরিয়ে পড়ল সবাই। 'আমার ভয় করছে,' বলতে গিয়েও মারের ভয়ে মুখ খুলল না ময়না। এ বাসার বারান্দাটা

বেশ সুন্দর। দু'তিনটে চেয়ার রাখা আছে, আকুলের জন্যে দোলনাও আছে এখানে। দোলনায় চড়ার ভারি শখ ময়নার। কিন্তু সুযোগই হয়ে উঠে না। আকুল থাকলে তো হাতই দিতে দেয় না। আজ অবশ্য সুযোগ পাওয়া গেছে। দোলনায় চড়ে সাধ মিটিয়ে নেয়া যাবে।

কচ্‌কচ্‌ শব্দ করছে দড়ি, দোল খাচ্ছে ময়না। আপন মনেই হাসছে, মজা লাগছে, হাততালি দিচ্ছে। এক সময় ঘুম পেল ওর, কী ব্যাপার এমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে কেন শরীর? চোখের পাতাও ভেঙে আসছে ঘুমে। এমন তো কখনও হয় না। দুপুরে কেন খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে ও। এমন লাগার কথা নয়।

হঠাৎ শীত শীত লাগল ময়নার। দোলনায় বসে চারপাশে তাকাল ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে। কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনেছে। পাশের ঘরে আছে কেউ।

কাঁপতে লাগল ময়না, আতঙ্কে নয়, ঠাণ্ডায়। নেমে পড়ল দোলনা থেকে। আরও কয়েকবার কচ্‌কচ্‌ শব্দ করল দোলনা। ফাঁকা বাড়িতে কেমন যেন ভূতুড়ে শোনাল শব্দটা।

হঠাৎ কে যেন হাত দিল ময়নার পিঠে।

'কে?'

ঝট্‌ করে ঘুরল ময়না। শিরশির করে উঠল শরীর।

কেউ নেই।

দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে খট্‌খট্‌ আওয়াজ হলো দু'বার।

ধীর পায়ে বেডরুমের দিকে এগুলো ময়না। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে কে যেন। থরথর করে কাঁপছে পা। দাঁড়াতে পারছে না।

বেডরুমের পর্দা তুলে ভেতরে উঁকি দিল ময়না।

শূন্য বেডরুম। কেউ নেই।

ঝট্‌ করে পেছনে ঘুরল ময়না। আবার কে যেন পিঠে হাত দিয়েছে। ঠাণ্ডা, হিমশীতল স্পর্শ। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না ও।

ময়নার একবার মনে হলো, প্রাণপণ চিৎকার দেবে, কিন্তু কি

ভেবে তা করল না। ওর সকল ভয় ওই মোনালিসার ছবিটা নিয়ে। আগে ওটা দেখা দরকার।

ভয়ে ভয়ে ড্রইং রুমের দিকে এগুলো ময়না। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতে যাবে এমনই সময় পেছন থেকে কে যেন চেপে ধরল ওর চোখ। আবার সেই ঠাণ্ডা শীতল স্পর্শ। আতঙ্কে চিৎকার দিল ময়না, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না কণ্ঠ দিয়ে।

তবে এরই ফাঁকে যা দেখার দেখে নিয়েছে ময়না। ছবির ফ্রেমে মোনালিসার চিহ্ন নেই। শূন্য ফ্রেম।

হঠাৎ কট্‌কট্‌ শব্দে ঘাড় ভেঙে গেল ময়নার। যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে উঠল ও। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। কেউ হাত চেপে ধরেছে ওর মুখে।

মরে যাচ্ছে ময়না। তবুও জোর করে চোখ মেলল ও। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। দেখল, ওদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মোনালিসা। ময়নার ঘাড় মটকে দিয়েছে সে।

কিছুক্ষণ পর মারা গেল ময়না।

ওদিকে অনুপম মামু, লিলি মামী আর আকুল যখন আয়েশাদের আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছুল তখন তো সবাই অবাক।

আয়েশার মামা লিলি মামীকে চিনতেন। লিলি মামীর মুখে সব কথা শুনে তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এ সব কী বলছ কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আয়েশা আর জাহিদের সঙ্গে তোমার স্বামীর দেখা হয়েছিল?'

'জ্বি।'

'গতরাতে?'

'জ্বি।'

'তা কী করে সম্ভব?' হঠাৎ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে এল আয়েশার মামা আজিজুল হকের। 'ওরা তো গত পরশু রাতে বাসায় ফেরার পথে ট্রাকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট...' বাকি কথাটা আর বলতে পারল না আজিজুল হক।

হাতে করে এক তোড়া রজনীগন্ধা এনেছিল লিলি মামী খসে

পড়ে গেল। হতবাক, বিস্ময়ে তিনি বাকরুদ্ধ। তা হলে গতকাল রাতে কার সাথে দেখা হয়েছিল তার স্বামীর? আর ওই মোনালিসার ছবিটা? অভিশপ্ত?

হঠাৎ করেই লিলি মামীর মনে হলো আকুল আজ বারবার বলেছিল—ছবিটা দেখে ওর ভয় লাগছে।

হায় আল্লাহ্। ঘরে একা ময়নাটাকে রেখে এসেছে। না জানি কী হয়। এখুনি ফেরা দরকার। ওটা আসলে মরা মানুষের দেয়া একটা অভিশপ্ত উপহার। অশুভ, নিশ্চয় অশুভ ওটা।

ওদিকে ময়নার কিছু হলো না তো।

সুস্ময় সুমন

ক্যালগার্থ হলের জীবন্ত খুলি

আজকের লেক উইণ্ডারমেয়ারের কাছে ছোট এক খামার ছিল–সতেরো দশকের প্রথমদিকে। ওটার মালিক ছিল গরীব কৃষক ক্রাস্টার কুক ও তার স্ত্রী ডরোথি। কঠোর পরিশ্রমী ছিল তারা, নিজেদের সম্বল বলতে ছিল ছোট একটা কটেজ ও কয়েক একর জমি। ওগুলো আপন সন্তানের মতই প্রিয় ছিল তাদের। ক্রাস্টারের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ওগুলো।

তাদের চারপাশের সমস্ত জমির মালিক ছিল মাইলস ফিলিপসন। খুবই ধনী, প্রভাবশালী ছিল তার পরিবার। কোন পদবী যদিও ছিল না, কিন্তু মধ্যযুগীয় নাইটদের মত মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল মাইলস। তার স্ত্রী ছিল অল্পবয়সী এবং খুবই সুন্দরী।

একবার তারা ঠিক করল একটা ম্যানর হাউস নির্মাণ করবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কোথায় করবে, তাই নিয়ে। নিজের শ'শ' একর জমির কোথাও ওটাকে মানাবে বলে মনে হলো না মাইলসের। তার এবং তার স্ত্রী, দু'জনেরই মনে হলো প্রতিবেশী কুকের জমিই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা যেখানে ম্যানর হাউস মানাবে ভাল।

কিন্তু বাসনা পূরণ হয় না ফিলিপসনদের, প্রতিবারই তাদের জমি বিক্রি করার প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে ফিরিয়ে দিল কুক ও ডরোথি–কোনমতেই বাপ-দাদার ভিটে বেচবে না তারা। দফায় দফায় জমির দাম বাড়িয়ে তাদের লোভের ফাঁদে ফেলার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেল মাইলস ফিলিপসন, তবু লাভ হলো না। ওরা বেচবে না তো বেচবেই না।

প্রত্যাখ্যাত হতে হতে মেজাজ খিচড়ে গেল প্রভাবশালী ফিলিপসনদের, ত্যক্ত হয়ে উঠল তারা। প্রতিজ্ঞা করল, যে করে হোক ওই জমি থেকে কুক দম্পতিকে দূর করে তবে ছাড়বে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? বুদ্ধিটা দিল মিসেস ফিলিপসন।

কয়েকদিন পর সকালে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রতিবেশী কুকের কটেজে এল মাইলস ফিলিপসন। আন্তরিকতার সাথে হাত মেলাল কুকের সাথে, জানাল তার জমি কেনার ইচ্ছে বাতিল করে দিয়েছে সে। ঠিক করেছে নিজের জমিতেই ম্যানর হাউস বানাবে। সেই সাথে অতীত ভুলে যাওয়ার অনুরোধ করল সে কুককে। বলল, রাগ বা উত্তেজনার মাথায় যদি কখনও কড়া, আপত্তিকর কিছু বলে থাকে সে, কুক যেন তা ক্ষমা করে দেয়।

ক্ষমা করল কুক, কিন্তু তাতে মাইলসের মন ভরে না। কুক ও তার স্ত্রীকে বড়দিনে তার বর্তমান ম্যানর হাউসের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করল সে, আগুপিছু চিন্তা না করে রাজি হয়ে গেল ওরা। বড়দিনের তখন আট-দশদিন বাকি। খুশি মনে ফিরে গেল সে, এদিকে কুক-ডরোথিও খুশি। ধনী, প্রভাবশালী প্রতিবেশীটির মত সত্যিই বদলেছে বুঝতে পেরে। নইলে কি আর ওদের মত গরিবকে নিমন্ত্রণ করত সে?

সব ভুলে পার্টি কতখানি জাঁকজমকপূর্ণ হবে, তাই কল্পনা করতে বসল ওরা। এর আগে প্রতিবছর দূর থেকে পার্টিতে আগতদের দেখেছে কুক ও ডরোথি। কাউন্টিতে যত ধনী আছে, প্রায় সবাই আসে ফিলিপসনের পার্টিতে। সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা থাকে। সিলক্ আর সাটিনে মোড়া পুতুলের মত লাগে তাদের দেখতে। ওসবের সঙ্গে থাকে ফার ও ঝলমলে অলঙ্কার। ঘোড়ায় টানা সুন্দর সুন্দর গাড়িতে আসে সবাই।

তাদের পাশে ওরা একেবারেই বেমানান, কুক দম্পতি জানে, কিন্তু কী আর করা। না গেলে প্রতিবেশীকে অপমান করা হবে। সে ভাববে ওরা তাকে মন থেকে ক্ষমা করেনি। অতএব দিন গুনতে থাকল তারা অস্বস্তির সাথে

বড়দিন এল, নিজেদের সবচেয়ে সেরা ড্রেস পরে পার্টিতে যোগ দিল কুক দম্পতি। কিন্তু তারপরও নিজেদেরকে আমন্ত্রিত ধনী অতিথিদের পাশে বিশ্রীরকম বেমানান লাগল নিজেদের। তারা যাতে কোনভাবে বিব্রত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখল মাইলস ও তার স্ত্রী, ফলে প্রথম পর্বে মোটামুটি ভালই উৎরে গেল দু'জনে।

সমস্যা দেখা দিল ডিনার খেতে বসে। লম্বা ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি ও দু'পাশে বসা ঝলমলে পোশাকের নারী-পুরুষের দল ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিল তাদেরকে। সারাক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল ক্রাস্টার ও ডরোথি। প্লেট থেকে মুখ প্রায় তুললই না লজ্জায়।

ক্রাস্টারের সামনে রাখা ছিল একটা কাঁচের বাউল, ওতে ছিল অনেকগুলো খাঁটি সোনার মোহর। চকচকে ধাতব মুদ্রাগুলোর দিকে বারে বারে তাকাতে লাগল সে। তাই দেখে এক সময় ফিলিপসনের স্ত্রী ঠাট্টা করে বলে উঠল, 'সোনাগুলো তোমার খুব পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে, মিস্টার কুক? তা অবশ্য হওয়ারই কথা, হাজার হোক সোনা তো!'

তার এই মন্তব্যে টেবিলের প্রত্যেকে তাকাল ক্রাস্টার ও বাউলটার দিকে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ক্রাস্টার, বিড়বিড় করে কিছু বলল। এরপর অন্যদিকে মন দিল অতিথিরা, তবে ক্রাস্টার যে একমনে সোনার মুদ্রা দেখছিল, সেটা সবার মনে গাঁথা হয়ে গেল। ডিনার শেষে রীতি অনুযায়ী বেশ কিছুক্ষণ ম্যানর হাউসে থাকল কুক দম্পতি, তারপর গৃহকর্তা ও কর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

পরদিন ভোরে একদল সৈন্য এসে ঘেরাও করল তাদের কটেজ, দুজনকে ধরে পৃথক দুই জেলে ভরে দিল। গ্রেফতারের কারণ বারবার জানতে চাইল তারা, কোন লাভ হলো না। কেউ কিছুই বলল না। এক সপ্তাহ পর বিচারের জন্যে সেল থেকে কোর্টে আনা হলো কৃষক দম্পতিকে, তখনই তারা প্রথম জানল তাদের 'অপরাধ' সম্পর্কে। এক বাউল সোনার মুদ্রা চুরি করেছে তারা ফিলিপসনের ম্যানর হাউস

থেকে—মিসেস ফিলিপসনের সম্পত্তি।

সাক্ষীর বক্সে দাঁড়িয়ে ঘটনা যে সত্যি, গড়গড় করে তা বলে গেল মহিলা—বড়দিনের ফীস্টের সময় সোনার মুদ্রায় ভরা বাউলটা ডাইনিং টেবিলে রাখা ছিল, বলে চলল সে, বন্দীর সামনেই ছিল। ক্রাস্টার এমনভাবে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখে অবাক হয়েছিল সে। পরিষ্কার লোভীর দৃষ্টি ছিল সেটা। কাজেই তার স্থির বিশ্বাস, ওগুলো ক্রাস্টারই চুরি করেছে।

তার তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা সত্যি কি না, বিচারকের এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার লোকের অভাব হলো না। ফিলিপসনদের সেদিনের আমন্ত্রিত অনেকেই একবাক্যে বলল—সত্যি। তার দুই চাকর জানাল, অতিথিরা প্রত্যেকে যখন ডিনার শেষে হলরুমে নাচছে, তখন অভিযুক্তদের ব্যাঙ্কোয়েট হলে দেখেছে তারা। সবশেষে বাউলটা হাজির করা হলো আদালতে। দু'জন সৈন্য শপথ করে বলল, ওটা তারা ক্রাস্টারের কটেজের এক বেডরুমে পেয়েছে সার্চ করার সময়।

এত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মুখে হতভম্ব, ভীত-সন্ত্রস্ত কুক দম্পতির কোন কথাই কানে তুলল না বিচারক, তখনকার আমলের অমানবিক, নিষ্ঠুর আইন মোতাবেক ফাঁসীর আদেশ হলো ক্রাস্টার ও ডরোথির। আদেশ শুনে কেঁপে উঠল তারা, ডকের কাছেই বসা মাইলস্ ফিলিপসনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল ডরোথি।

তীব্র ঘৃণার সাথে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে বলল, 'ঈশ্বর বলে কেউ যদি থেকে থাকে, তা হলে তোমার আমাদের জমি গ্রাস করার ইচ্ছে কোনদিনও পূরণ হবে না, মাইলস ফিলিপসন। তুমি, তোমার স্ত্রী বা তোমাদের বংশধরেরা কেউই শান্তিতে থাকতে পারবে না ওখানে। সব হারাবে তোমরা। আজ যারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিল, নির্মম পরিণতি হবে তাদেরও। মনে রেখো, আমি আর আমার স্বামী তোমাদের পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকব। যেখানেই যাও, মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাবে না তোমরা। সারা জীবনেও না।'

ক'দিন পর এক ক্রসরোডে কুক দম্পতির ফাঁসির আদেশ

কার্যকর হলো। দড়ি কেটে লাশ দুটো নামানোর আগেই তাদের কটেজ ভেঙে ফেলতে লোক লাগিয়ে দিল মাইলস ফিলিপসন। জঞ্জাল সাফ করে কদিনের মধ্যেই তার জায়গায় নতুন ম্যানর হাউস নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। তার নাম রাখা হলো ক্যালগার্থ হল।

প্রায় এক বছর লাগল কাজ শেষ হতে, বড়দিনের কয়েক সপ্তাহ আগে নতুন ম্যানর হাউসে উঠে গেল ফিলিপসন পরিবার। বড়দিনে আগের বারের চেয়ে বহুগুণ জমজমাট পার্টির আয়োজন করল তারা, সিলক্ আর সাটিনে মোড়া অতিথিদের কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল বাড়ি। ঝাড়বাতির আলোয় মেয়েদের দামী অলঙ্কার থেকে থেকে ঝিলিক মারছে। ডরোথির অভিশাপের কথা কারও খেয়ালই নেই।

ডিনারের মাঝামাঝি পর্যায়ে মিসেস ফিলিপসন উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে, ওপরতলার বেড রুম থেকে নতুন এক সেট অলঙ্কার এনে বান্ধবীদের দেখাবে। সে আমলে বিদ্যুৎ তো নয়ই, গ্যাসও ছিল না! শুধু মোমবাতির আলোয় কোনমতে আলো হয়ে আছে হলরুম। প্রশস্ত সিঁড়ির পুরোটা আধো আলো আধো অন্ধকারে ডুবে আছে।

নিজের সৌভাগ্য জাহির করতে ব্যস্ত মহিলার সেদিকে খেয়ালই নেই। একটা মোমবাতি নিয়ে একাই তরতর করে উঠে যেতে লাগল। বেশ কয়েক ধাপ উঠে বাঁক খেয়েছে সিঁড়ি, ঘটনাটা সেখানেই ঘটল। মোমবাতির কাঁপা আলোয় সামনেই কিছু একটা দেখে মুহূর্তে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল মহিলা, ধমনীর চলমান উষ্ণ রক্ত বরফ হয়ে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগল সে, তীব্র আতঙ্কে ঘাম দেখা দিল কপালে।

সিঁড়ির সূক্ষ্ম কারুকাজ করা দামী কাঠের হাতলে পাশাপাশি বসে আছে একজোড়া মাথার খুলি—একটা পুরুষের, অন্যটা নারীর। গাঢ় রঙের দীর্ঘ, ঘন চুল ঝুলছে পরেরটা থেকে। কিছুক্ষণ অনড় থাকল ও দুটো, তারপর ঠোঁট ফাঁক হলো, দু'দিকে প্রশস্ত হতে শুরু করল হাসির ভঙ্গিতে।

তীব্র আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, মোমবাতি ফেলে

কয়েক লাফে সিঁড়ি অতিক্রম করে তীরবেগে ডাইনিং হলের দিকে ছুটল। তার চিৎকারে ততক্ষণে পার্টির আনন্দ উল্লাস থেমে গেছে। অনেকক্ষণ পর একটু সুস্থির হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ঘটনা ব্যাখ্যা করল মহিলা।

পার্টির প্রায় সবাই জড়ো হলো সিঁড়ির গোড়ায়, সাহস করে এক ধাপ দু'ধাপ করে উঠতে লাগল। জায়গামত পৌঁছে সবাই দেখল ঘটনা সত্যি, , তখনও আছে খুলি দুটো। তবে হাতলে নয়, সিঁড়ির ধাপে। অতিথিদের মধ্যে থেকে দুর্দান্ত সাহসী একজন তলোয়ার বাগিয়ে সেদিকে এগোল, খোঁচা লাগাল পুরুষ খুলিটাকে। একটা শব্দ হলো, নড়ে উঠল ওটা।

'এটা ট্রিক্ না হয়েই যায় না!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'নিশ্চয়ই কেউ মজা দেখার জন্যে এনেছে ওগুলো।'

গুঞ্জন শুরু হলো, কে করতে পারে কাজটা, তা নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠল প্রত্যেকে। শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করা হলো এক ছোকরা-চাকরকে। হাত-পা বেঁধে তাকে এক অন্ধকার সেলারে আটকে রাখা হলো—অপরাধ স্বীকার না করা পর্যন্ত মুক্তি নেই। খুলি দুটোকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো কোর্টইয়ার্ডে।

এক সময় পার্টি শেষ হলো। ঘুমিয়ে পড়ল নতুন ম্যানর হাউস। রাত দুটোর দিকে ঘুম ভেঙে গেল ফিলিপসন দম্পতির—চড়া পর্দার তীক্ষ্ণ, টানা চিৎকারে বাড়ির সাথে নিজেরাও কেঁপে উঠল তারা। সে কী ভয়াবহ চিৎকার! যেন অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে এক জোড়া নারী-পুরুষ।

থেকে যাওয়া আমন্ত্রিতদের ঘুমও ভাঙল, রাতের পোশাকেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল তারা। সবাই হতচকিত, ভীত : কয়েকজন এগোল চিৎকার কোত্থেকে আসছে দেখতে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। দেখা গেল কোর্টইয়ার্ডে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া খুলি দুটোই এর উৎস। কী করে যেন বাড়ির ভেতরে চলে এসেছে ওগুলো, সিঁড়িতে বসে আছে।

মানুষের সাড়া পেয়েই চেঁচানো বন্ধ করল ওগুলো. একদম নীরব

হয়ে গেল, কিন্তু অতিথিদের কারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না যে কাজটা কার, বা কীসের। বাকি রাতটুকু আর কোন সমস্যা হলো না—নীরব থাকল খুলি, তবে জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না। কারও সাহস হলো না ও দুটোকে বাইরে ফেলে দিতে। কারণ ততক্ষণে সবাই বুঝে ফেলেছে ক্যালগার্থ হলকে কেন্দ্র করে কী চলছে। ডরোথির অভিশাপের কথা মনে পড়ে গেছে সবার।

খুব ভোরে একে একে কেটে পড়ল অতিথিরা। সাহায্য করার মত কাউকে না পেয়ে মাইলস নিজেই এক পুকুরে ফেলে দিয়ে এল ও দুটোকে। দিনটা কাটল থমথমে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। ভয়ে, আতঙ্কে, সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকল ফিলিপসন দম্পতি। মুখ চুনের মত সাদা।

পরের রাতেও সেই একই কাণ্ড। বেডরুমের মজবুত, বন্ধ দরজার ওপাশে থেকে থেকে সেই কলজে হিম করা চিৎকার চলল ভোর পর্যন্ত। সকালে খুলি দুটোকে যথারীতি আগের জায়গাতেই দেখা গেল।

বেশিরভাগ চাকর ওইদিনই ক্যালগার্থ হল ছেড়ে পালাল, সামান্য যে ক'জন গেল না, তারা জানিয়ে দিল, সন্ধের আগেই হল থেকে চলে যাবে তারা। সকালে ফিরবে আবার। অর্থাৎ রাতে কেউ থাকবে না। ষড়যন্ত্রকারী, লোভী ফিলিপসন পরিবারের জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে।

সামাজিক রীতি অনুযায়ী প্রায়ই যে সমস্ত ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসত, তারা আসা বন্ধ করে দিল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে নিমন্ত্রণ জানালেও আসে না কেউ। সম্পূর্ণ বান্ধবহীন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল তারা।

একই সাথে আরও নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হলো মাইলস ফিলিপসনকে—তার ব্যবসায় লোকসান হতে থাকল ক্রমাগত। মৃত্যুর আগে ছেলেদের জন্যে বলতে গেলে হলটা ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেনি সে। নতুন প্রজন্ম যখন হলের কর্তৃত্ব পেল, তখন আবার নতুন করে আরম্ভ হলো খুলির সেই পুরানো তাণ্ডব।

অবশ্য কাউন্টির ইতিহাস অনুযায়ী আসল দুই শত্রুর মৃত্যুর পর তাদের চেঁচানিতে আগের সেই তেজ ছিল না, এবং বড়দিনকে ঘিরেই শুরু হত ক্রাস্টার ও ডরোথির যত কর্মকাণ্ড, যে দিনকে কেন্দ্র করে বিনা দোষে মৃত্যু হয় তাদের।

জানা যায়, ফিলিপসনের ছেলে বাপের চেয়েও গরীব অবস্থায় মারা যায়। পরের কয়েক প্রজন্মের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সর্বশেষ ফিলিপসন মারা যায় পথের ভিখিরি হয়ে।

ফারহান সিদ্দিক

কার্তিক চাঁদ ফকির

আমার বয়স তখন নয় কিংবা দশ। একদিন সকাল থেকে শুরু হলো মাথা ব্যথা, সেই সাথে জ্বর। রাতের বেলা মাথা ব্যথা আর জ্বর, দু'টোই প্রচণ্ড রূপ নিল। বাবা আমাকে বেশ কয়েক ধরনের অষুধ খাওয়ালেন, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। পরদিন সকালে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে চামড়া ফুঁড়ে উদয় হলো ঘামাচির চাইতে কয়েক গুণ বড় আকারের কিছু পানিভর্তি গুটি। গুটিগুলোকে বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং এর এক পর্যায়ে তাঁর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ভেসে উঠল। পরে অবশ্য বাবার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, গুটিগুলোকে দেখে তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন আমি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছি। কারণ আমার শরীরে তখন যে কয়টি গুটি বেরিয়েছিল সেগুলোর প্রত্যেকটার আকার ছিল জল বসন্তের গুটির চাইতে অনেক ছোট।

সেদিন বিকালে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মোটর সাইকেলে চেপে বসলেন। তাতে আমি কিছুটা অবাক না হয়ে পারলাম না। এই অসুস্থ অবস্থায় বাবা আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? গ্রামীণ-স্নিগ্ধ পরিবেশকে সরগরম করে ছুটে চলেছে মোটর বাইক। তিন গ্রাম পেরিয়ে একটা কাঠের ব্রীজ পার হয়ে বাবার মোটর সাইকেল এসে থামল এক বাড়ির সামনে। বাড়ি মানে একটি মাত্র ঘর। তবে ঘরটির আয়তন বেশ বড়। ঘরের দক্ষিণ দিক জুড়ে রয়েছে লম্বা একটি ঝুলবারান্দা। বেশ কয়েকজন জটাধারী সন্ন্যাসী বসে আছেন বারান্দায়। বাবাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাল। আমি বুঝলাম এঁরা আগে থেকেই বাবাকে চেনেন।

আমার মনের মধ্যে তখন নানা ধরনের প্রশ্ন এসে জমা হতে লাগল। আমি যতটুকু জানি, পীর-ফকির আর সন্ন্যাসীদেরকে বাবা খুব একটা পছন্দ করেন না। তাঁর মতে এদের বেশিরভাগই এক ধরনের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। আবার কেউ কেউ গঞ্জিকায় আসক্ত। কিন্তু আজ তবে কেন তিনি এই অসুস্থ আমাকে নিয়ে সন্ন্যাসীদের আড্ডায় এসে হাজির হয়েছেন? বাবা আমার হাত ধরে সন্ন্যাসীদের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যে পা রাখতেই আমি দেখলাম, সারা ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানো বিরাট একটা চাদরের ঠিক মাঝখানে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর সামনের ছোট্ট একটা কাঠের বেদীতে জ্বলছে প্রায় অর্ধডজন মোম আর আগর বাতি। বৃদ্ধের চুল-দাড়ি কাগজের মত সাদা। তাঁর দাড়িগুলো আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। আজ পর্যন্ত আমি কোন মানুষের মুখে এত শুভ্র, এত ঝাঁকড়া আর এত লম্বা দাড়ি দেখিনি।

বৃদ্ধ দু'চোখ বন্ধ করে কী যেন জপে চলেছিলেন। বাবা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হালকা গলায় কেশে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ মেলে তাকালেন এবং পরক্ষণেই দ্রুত বসা থেকে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এবার অনেক দিন পর গরীবের কুঠিরে পা রাখলেন, ডাক্তার ভাই।'

বাবা বললেন, 'কার্তিক চাঁদ ভাই, আজ আমার মনে পুরনো একটা ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আমার ছেলের শরীরে গুটি বেরিয়েছে, গুটিগুলোর আকার বেশ ছোট আর সেটাই আমার ভয়ের কারণ, আপনি তার গুটিগুলো একটু দেখেন।' বাবা আমার গায়ের শার্ট খুলে ফকিরের সামনে দাঁড় করালেন।

বৃদ্ধ ফকির একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার শরীর পরীক্ষা করে বললেন, 'ডাক্তার ভাই, এগুলো সেই আসল জিনিস নয়। আপনার ছেলের জল বসন্ত হয়েছে। এগুলোকে আমি বলি মামুলি পাইন্যা গোটা; সর্দি-ঠাণ্ডার মত অতি সাধারণ এক অসুখ।' ফকিরের কথা শুনে বাবার মুখ হাসিতে ভরে গেল। এরপর

বাবা তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।

সে রাতে বাড়িতে ফিরবার পর আমার শরীর কাঁপিয়ে প্রচণ্ড জ্বর এল, সেই সাথে বের হতে লাগল একের পর এক জল বসন্তের গুটি। এই রোগ থেকে সুস্থ হতে আমাকে কয়েক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকতে হলো। এত রোগযন্ত্রণার মধ্যেও আমার সমস্ত মনকে ঘিরে রেখেছিল বাবার ফকিরের কাছে যাওয়ার ঘটনা। বাবার প্রতি রীতিমত এক ধরনের অভক্তি এসে জমা হয়েছিল আমার মনে। আমার বাবা এত বড় একজন ডাক্তার, সমগ্র অঞ্চলের মানুষ যাঁকে জীবন্ত কিংবদন্তী হিসাবে জানে, যিনি চেহারা দেখে মানুষের রোগ বলে দিতে পারেন, রোগীর উদ্দেশে দেওয়া যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়; সেই তিনিই কিনা সাধারণ এক রোগ নির্ধারণের জন্য তাঁর ছেলেকে নিয়ে গেলেন এক আধ্যাত্মিক ফকিরের কাছে! তিনি নিয়মিত আমাকে যুক্তিবাদী তত্ত্বের বাণী শোনান; অতিপ্রাকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হা-হা করে হেসে ওঠেন। অথচ কার্তিক চাঁদ নামের এক ফকিরের প্রতি কী ভীষণ দুর্বলতা তাঁর! এই দুর্বলতার সৃষ্টিমূল আমাকে অবশ্যই জানতে হবে, অন্যথায় বাবার প্রতি আমার মনে যে অভক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা কিছুতেই দূর হবে না।

এরপর বেশ কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। বাবা এত বেশি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, বহুবার চেষ্টা করেও আমি আমার মনের প্রশ্নটা তাঁর সামনে উপস্থাপন করতে পারলাম না। তাই বছরের পর বছর তাঁর প্রতি আমার সেই বিশেষ অভক্তির অনুভূতিটা আগের মতই রয়ে গেল।

আমি তখন কৈশোরের উচ্ছলতা ছেড়ে সবেমাত্র যৌবনে পা রেখেছি। বাবা এখন আর মোটর সাইকেল রাইড করেন না। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, বার্ধক্যের কারণে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। ষাটের উপর বয়স হলেও বাবার শরীর-স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট অটুট রয়েছে। বাবার মতে, স্বাস্থ্য অটুট থাকলেও, তাঁর মন এখন আর রাইডিঙের উপযুক্ত নয়। তিনি এখন কোথাও যেতে হলে

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, আমি মোটরবাইক চালাই, বাবা পেছনে বসে থাকেন। এক সকালে কলেজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, এমন সময় বাবা এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে। তাঁর মুখ কেমন যেন এক বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন! তিনি ছোট্ট করে বললেন, 'গতরাতে সাধারচর গ্রামের কার্তিক চাঁদ ফকির মারা গেছেন।' কথাগুলো শুনবার পর ফকিরের মৃত্যু সংবাদকে ছাপিয়ে আমার মনের সেই পুরনো অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আজ ফকিরের বাড়ি থেকে ফিরবার পথেই বাবাকে ধরে বসব।

বাবা প্রায় সারাটা দিনই ফকিরের বাড়িতে কাটালেন। ফকিরকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশে হাজার-হাজার ভক্ত উপস্থিত হয়েছিল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। বিকালের দিকে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ির পথ ধরলাম। মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে আমি বাবাকে পীর-ফকিরদের ভণ্ডামি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। আরও জানতে চাইলাম কার্তিক চাঁদ ফকিরের মধ্যেও এ ধরনের কোন স্বভাব ছিল কিনা। আমার প্রশ্নগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক ধরনের তিরস্কারের সুর। আমি ক্রমাগত বক-বক করে গেলাম, বাবা আমার কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীরব হয়ে বসে রইলেন। এমন কী বাড়িতে ফিরেও তিনি চুপ মেরে রইলেন।

সেই রাতে বাবা কিছুই খেলেন না। গুম মেরে বসে রইলেন বারান্দার ইজি চেয়ারে। রাতের খাবার খেয়ে আমি তখন বিছানায় শুয়ে একটা গল্পের বই-এ চোখ বোলাচ্ছিলাম। ঠিক সে সময় হঠাৎ বাবার গলার ডাক শুনতে পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ইজি চেয়ারের পাশের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। আমি বুঝলাম, আজ বিকাল বেলায় তাঁর উদ্দেশে বলা আমার কথাগুলো বাবার মনে বিশেষ দাগ কেটেছে, হয়তো তাঁর প্রতি আমার এক বিশেষ অভক্তির ব্যাপারটাও এতে তিনি টের পেয়ে গেছেন। তাই তিনি আমাকে ডেকেছেন কিছু বলবার জন্য। কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই তিনি কথা শুরু করলেন। 'আমি পীর ফকিরদের পছন্দ করি না, কথায় কথায় তাদের তিরস্কার করাই

আমার স্বভাব। পীর-ফকিরদের প্রতি এ মনোভাব শুধু আমার একার নয়, যারাই চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রী অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকেই পীর-ফকিরদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। পীর-ফকিরদের সবকিছুর মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিকতাবাদ, আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতাবাদের কোন ঠাঁই নেই। তবে কেন কার্তিক চাঁদ ফকিরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তার মৃত্যুতে বার বার কেন মনে হচ্ছে, আজ আমি আমার এক অতি আপনজনকে হারিয়েছি, এসবের জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কার্তিক চাঁদ ফকিরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। তখন আমি সবেমাত্র এম.বি.বি.এস পাশ করে গ্রামে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। সেই ছোট বেলা থেকে আমার ইচ্ছে ছিল, বড় হয়ে ডাক্তার হব। ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষদের সেবা করব। তাই আমার ডাক্তার বন্ধুদের সবাই নগরকেন্দ্রিক জীবন বেছে নিলেও আমি ফিরে এসেছিলাম আমার গ্রামে। ছোট একটা চেম্বার খুলে ডাক্তারী-জীবন শুরু করেছিলাম। তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষরা সব ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য ছুটে যেত পীর-ফকিরদের কাছে। পীর-ফকিরদের রম-রমা ব্যবসার একমাত্র মূলধন ছিল গ্রামের রোগাক্রান্ত মানুষ। গ্রামে চেম্বার স্থাপনের পর বহু পীর-ফকিরের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলাম আমি। নানা ভাবে তারা আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কারণে গ্রামের মানুষ ঠিকই এক সময় পীর-ফকিরের বদলে আমার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বহু জটিল রোগীকে দ্রুত আরোগ্য করে আমি তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ডাক্তারী-জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই আমি পীর-ফকিরদের একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর সেবা করতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। মেধা-চেষ্টা আর শ্রমের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে আমি গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো ডাক্তারী শাস্ত্রের সুফল বুঝতে পেরে আমাকে তাদের অতি আপনজন করে

নিল। বিপদে-আপদে আমি হয়ে উঠেছিলাম তাদের একমাত্র ভরসা।

'একবার গ্রামের পশ্চিমের শীতলক্ষা নদীর ওপারে গুটি বসন্তের মহামারি দেখা দিল। সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল চাপা আতংক। সে সময়ের এক বিকালে গ্রামের পঞ্চবটি শ্মশানের কাছে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছিল বিপীন নামের এক জেলে। সূর্য তখন ঝুলে পড়েছে অস্তাচলের দিকে। বিলীয়মান সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে, চরাচর জুড়ে নেমে আসতে শুরু করেছে সন্ধ্যার সায়ন্ধকার রূপ। নদীর বুকে জাল ফেলতে গিয়ে হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিপীনের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। টকটকে লাল আকাশকে পেছনে রেখে দীর্ঘাঙ্গ এক মানব-মূর্তি নদীর উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে এ-পারের দিকে। ভয়ার্ত বিপীন নৌকাটাকে দ্রুত নদীপারের লাগোয়া একটা বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে নিয়ে গিয়ে আত্মগোপনরত অবস্থায় সেই মানব মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। এ-পারের দিকে দ্রুত ধাবমান মানব মূর্তির পরিচয় অচিরেই বিপীনের চোখে পরিষ্কার হয়ে এল। দীর্ঘাঙ্গিনী এক নারী জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে, তার পরনে সাদা রঙের শাড়ি, শাড়ির দীর্ঘ আঁচল দেহের পেছনের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত; উন্মাতাল বাতাসের দোলায় আঁচলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চলেছে তার দীর্ঘ এলোকেশ। এ কাকে দেখছে বিপীন? নদীর জলের উপর এভাবে পা ফেলে সাবলীল ভঙ্গীতে হাঁটা কোন মানবীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ কে? এ নিশ্চয় কোন দেবী। হঠাৎ করে বিপীনের মনে পড়ে গেল নদীর ওপারের মহামারির কথা। আর তখনই দ্বিতীয় বারের মত কাঁটা দিয়ে উঠল তার শরীর। নদী পার হয়ে স্বয়ং শীতলাদেবী এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে। এবার আর রক্ষা নেই। বিপীনের সমস্ত দেহ মুহূর্তের মধ্যে পাথর হয়ে গেল। নৌকার গলুই-এ বসা বিপীনের ভয়ার্ত চোখ দেখতে পেল, দেবী আগের মতই এ-পারের দিকে হেঁটে আসছে। এক সময় জলের সীমানা ছাড়িয়ে তার পা পড়ল মাটিতে। গলুই-এর পাশের একটা বটের শেকড় আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল বিপীন। দেবী যদি এদিকে এগিয়ে আসেন তবে নির্ঘাত সে তাঁর সামনে পড়ে যাবে;

এই ভয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু বিপীনের দিকে না এসে দেবী সোজা শ্মশানে উঠে দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরল। বিপীন তৎক্ষণাৎ নৌকা থেকে নেমে গ্রামে এসে অনেককেই ঘটনাটা খুলে বলল। সে রাতে গ্রামের একজনের কাছ থেকে খবরটা আমিও জানতে পারলাম। মনে মনে না হেসে পারলাম না। কারণ ঘটনার ব্যাখ্যা অতি সহজ–হিন্দুদের ধর্মীয় শাস্ত্রে বহু দেব-দেবীর কথা উল্লেখ আছে। গুটি বসন্তের বাহক বা নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে 'শীতলা দেবী' তাদের কাছে এক অতি পরিচিত নাম। শুধু তাই নয়, গ্রামাঞ্চলের অনেক মুসলমানও শীতলা দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বিপীন জানত নদীর ওপারে বসন্তের মহামারি চলছে। আর নদীতে মাছ ধরবার সময় ওপারের দিকে তাকালেই তার মনে ভেসে উঠত মন্বন্তরের ভয়ংকর চিত্র, সেই সাথে তার সমস্ত চেতনাকে নাড়া দিয়ে যেত শীতলা দেবীর চিন্তা। সন্ধ্যার নীরব পরিবেশে শীতলা দেবীর কথা ভাবতে গিয়ে বিপীন যে হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়েছিল তাতে অন্তত আমার কোন সন্দেহ নেই।

'পরদিন সকালে জানা গেল বাড়ুই (হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সব লোক পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে) পাড়ায় বসন্ত দেখা দিয়েছে। খবরটা দাবানলের মত সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে বিপীন শীতলাদেবীকে নদী পার হয়ে যে দিকে ঢুকতে দেখেছে সেদিকেই বাড়ুই পাড়ার অবস্থান। মানুষ এখন যে কোন অসুখে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে আমার কাছে ছুটে আসে। বাড়ুই পাড়ার লোকজনও হয়তো আমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু কী দিয়ে আমি গুটি বসন্তের রোগীদের চিকিৎসা করব! এ এক ভয়ানক ব্যাধি, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত এই রোগের প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক অষুধ তৈরি করতে পারেনি।

পর পর পাঁচ দিন সময় পার হয়ে গেল। বাড়ুই পাড়া থেকে একজন লোকও ছুটে এল না আমার কাছে। এর মানে গ্রামের মানুষও জানে যে অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রে গুটি বসন্তের কোন অষুধ নেই। আমি ভাবলাম গ্রামের মানুষের কাছে এখন আর আমার কোন মূল্য নেই।

এখন পীর-ফকিররাই আবার তাদের ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। লোক মুখে জানতে পারলাম বাড়ুই পাড়ার ঘরে ঘরে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে, ইতিমধ্যে মারা গেছে নয় জন। ছয় দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ডাক্তারী ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম বাড়ুই পাড়ার উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছাতেই দেখলাম সারা পাড়া জুড়ে বিরাজ করছে অদ্ভুত এক থমথমে ভাব। প্রথম বাড়িতে পা রাখতেই দেখলাম দু'জন মাঝবয়সী পুরুষকে ঘরের মেঝেতে কলাপাতা বিছিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাদের সমস্ত শরীর বসন্তের গুটিতে ভরা, গুটিগুলো পেকে দু'জনের শরীরই বেলুনের মত ফুলে উঠেছে, দেহের কিছু কিছু অংশের মাংসে পচন ধরতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের হাত পায়ের আঙুলের মাংস আগলা হয়ে নখগুলো খসে পড়েছে, নখের জায়গায় দেখা যাচ্ছে দগ দগে লাল মাংস। তাদের শরীরের অবস্থা এমন যে কাপড়ের বিছানায় শোয়ালে দেহের চামড়া-মাংস চাদর কিংবা কাঁথার সঙ্গে আটকে যায়, তাই তাদেরকে কলাপাতার বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শরীর ফাটা পুঁজ মিশ্রিত ঘোলাটে রক্ত কলাপাতার পাশ দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। একজনের দু'টো চোখই গলে গেছে, আরেকজনের একটা চোখ এখনও কোনমতে টিকে আছে। তাদের ফুলে উঠা মুখগুলো ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। আমি হাত দিয়ে বা যন্ত্র লাগিয়ে তাদের দেহের কোন অংশ যে পরীক্ষা করব সে উপায় নেই। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের একটা ঘরে গেলাম, দেখলাম এক মা মাথায় হাত দিয়ে ঘরের দুয়ারে বসে আছে। জানতে পারলাম তার দু'সন্তান ইতিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, আরেকজন ঘরের ভিতর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম বারো-তেরো বছরের এক কিশোরী বিছানায় শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীর প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, দেহের প্রায় সমস্ত অংশেই গুটি ফুটে উঠেছে। তবে গুটিগুলোতে এখনও পাক ধরেনি। আমি সেই কিশোরীর পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এর বেশি এখন আর আমার কী-ই বা করবার আছে! সারাদিন বাড়ুই পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুরে সন্ধ্যার দিকে বাড়ির পথ

ধরলাম; বাড়ি মানে চেম্বার সংলগ্ন ছোট একটা দো'চালা টিনের ঘর। পথে হাঁটতে হাঁটতে আমার কানে ভেসে এল শঙ্খের বিরান সুর আর ভয়ার্ত নারীদের গলার উলুধ্বনি। বাড়ুই পাড়ার পার্শ্ববর্তী মন্দিরে শীতলা দেবীর মূর্তি গড়া হয়েছে, সেখানে এখন চলছে অবিরত প্রার্থনাস্রোত। এত প্রার্থনা! এত কান্না আর এত পূজা অর্চনার পরও তারা নিজেদেরকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। নিয়তির এ কী নিষ্ঠুর খেলা।

'পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে গুটি বসন্ত ভয়ংকর মহামারির রূপ নিয়ে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সাথে শীতলা দেবীর অস্তিত্ব ঘন ঘন ধরা পড়তে লাগল মানুষের চোখে। ভূঁইয়া বাড়ি, ব্যাপারী বাড়ি, বিটি পাড়া, টেক পাড়া, জেলে পাড়া, দাস পাড়া, কাজী বাড়ি–এসব বাড়ি ও পাড়া মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার আগে কোন না কোন ভাবে শীতলা দেবী সে সব স্থানের মানুষের চোখে পড়েছে। সারা গ্রাম বসন্তে ছেয়ে যাওয়ার পর প্রায় সব বাড়ির আশপাশে রাতের বেলা দেবীকে দেখা যেতে লাগল। হিন্দু-মুসলিম সবার মুখেই দেবীর কথা। আমার তখন রীতিমত পাগল হওয়ার অবস্থা। গুটি বসন্ত হচ্ছে ভাইরাসজনিত একটা রোগ। স্মল পক্স ভাইরাস নামের এক ধরনের ভাইরাস হচ্ছে এই রোগের বাহক। আমি নিজে বহুবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গুটি বসন্তের জীবাণু দেখেছি। ছাত্র থাকা অবস্থায় কলেজের মেডিকেল জার্নালে এ রোগ সম্পর্কে কয়েকটা প্রবন্ধও লিখেছি। অথচ আজ এই পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করতে এসে এসব কী শুনছি আমি! নিজের মনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হলো আমাকে। আসলে বিপীন নামের জেলে যে ভয়ে আক্রান্ত হয়ে শীতলা দেবীকে দেখতে পেয়েছিল, গ্রামের ভয়ার্ত মানুষগুলোর মনে একই ভয় বাসা বেঁধেছে–এই সত্যই আমাকে মেনে নিতে হলো।

'আমার ধারণা ছিল এতে করে গ্রামের পীর-ফকিরদের নবজাগরণ ঘটবে। কিন্তু আমার এই ধারণা অচিরেই উল্টো প্রমাণিত হলো। গ্রামের পীর-ফকিরদের অবস্থা এখন গ্রামবাসীদের মতই করুণ। কারণ এই ভয়ানক ব্যাধি বা শীতলা দেবীকে মোকাবেলা

করবার কোন তাবিজ-কবচ বা মন্ত্র তাদের জানা নেই। এ অবস্থায় সমস্ত গ্রাম যেন এক বিলাপ আর হাহাকারের বিরানভূমিতে রূপান্তরিত হলো। অসহায় মানুষগুলো মৃত্যুকে তাদের নিত্য সঙ্গী হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হলো। নিয়তির এক নির্মম অভিশাপে সবকিছু যেন এক অমোঘ নিস্তব্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। গ্রামের বাজারগুলো জনশূন্য, খেয়া ঘাট কিংবা ফসলের মাঠেও মানুষের চেহারা দেখা যায় না। সবাই যার যার বাড়িতে গৃহবন্দীর মত অবস্থান করে চলেছে। অন্য কোন গ্রামের মানুষ ভয়ে এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছে। সময়-প্রকৃতি-পরিবেশ সবকিছু কেমন যেন জড়তায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু গোরস্থান আর শ্মশানঘাটে যেন লেগে আছে রাজ্যের ব্যস্ততা। একের পর এক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার লাশ আসছে, কবরের পর কবর তৈরি হচ্ছে, লাগাতার জ্বলে চলেছে চিতার আগুন। যা ছিল সুনসান এক গ্রাম তা যেন পরিণত হয়েছে একখণ্ড নরকে, যেখানে শান্তির কোন চিহ্ন নেই।

'চারদিকে এত মৃত্যু! এত যন্ত্রণা দেখে আমার মন অস্থিরতায় ভরে গেল। একটি রাতও আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারলাম না। আমার ভিতর থেকে প্রতিনিয়ত কেউ যেন বলে চলল, "তুমি তো ডাক্তারী পাশ করে শহরের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এখানে এসেছ গ্রামের মানুষদের রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তোমার এই আসায় তাদের কী লাভ হলো? আজ তোমারই চোখের সামনে শত শত অসহায় মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে, অথচ তুমি কিছুই করতে পারছ না।" প্রতি রাতের এসব ভাবনায় আমার মনে নতুন চিন্তার উদয় হলো। গুটি বসন্তের চিকিৎসা আমার জানা নেই ঠিকই কিন্তু শরীর পচে-গলে যারা এখনও বেঁচে আছে ইচ্ছে করলে আমি তাদের শরীরের ঘা শুকানোর জন্য পেনিসিলিন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে পারি। প্রচণ্ড যন্ত্রণাকাতর রোগীর দেহে যাতনানাশক ইনজেকশন পুশ করে তাদেরকে কিছুটা হলেও প্রশান্তির আস্বাদ দিতে পারি। এতদিন তারা আমাকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে জেনেছে, অথচ আজ তাদের কাছে আমার কোন মূল্য নেই; এটা যে আমার

কাছে কত যাতনার বিষয় ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

'নতুন সিদ্ধান্ত মনে আসবার পর অষুধভর্তি ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে রাত-দিন গ্রামময় ঘুরতে লাগলাম। যেহেতু গ্রামের মানুষ জানে অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রে গুটি বসন্তের কোন চিকিৎসা নেই তাই বেশির ভাগ রোগাক্রান্ত বাড়ির লোকজনই আমার চিকিৎসা নিতে অপারগতা প্রকাশ করল। তারা বুঝে নিয়েছে যে তাদের বাড়িতে আমার এই আগমনের উদ্দেশ্য নিছক সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তবু হাল ছাড়লাম না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আক্রান্ত রোগীদের দেহে অষুধ প্রয়োগ করতে লাগলাম। তাদের জন্য এটুকু করতে পেরে আমি কিছুটা হলেও মানসিক শান্তি পেলাম। কিন্তু মৃত্যুস্রোত রহিত হলো না। সমান তালে মানুষ মরতে লাগল। মহামারি ক্রমেই তীব্র রূপ ধারণ করতে লাগল। অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া গেল একটা কথা-"শীতলা দেবী এবার গ্রামের একটা মানুষকেও জীবিত রেখে যাবে না।" আবার সেই দেবী! ইদানীং অবস্থা এমন হয়েছে যে আমার সামনে কেউ শীতলা দেবী সম্পর্কে আলাপ করলে আমাকে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। কারণ এই মুহূর্তে শীতলা দেবীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তারা আমাকে পাগল বলে তিরস্কার করবে। আমি নিশ্চুপ অবস্থায় থেকে তাদের মুখ থেকে দেবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। মহাকালের সুদূর অতীতের কোন এক সময় শীতলা দেবী স্বর্গের দেবতাদের অভিশাপের ফলে ধরিত্রীর বুকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। শক্তিময়ী সেই দেবীর ক্ষমতার উৎসমূল ছিল তার দু'চোখ। এই নেত্রযুগল দিয়ে সে যে-জিনিসের প্রতি তাকাত তা পুড়ে ছাই হয়ে যেত। শীতলা দেবী বহুকাল ধরে তার অগ্নিদৃষ্টির প্রভাব খাটিয়ে ধরণীর বুকে টিকে থাকতে লাগল। নিজের শক্তি আর ক্ষমতার বিষয়ে দেবী ছিল ভীষণ রকম অহংকারী। সে সর্বদা বিশ্বাস করত তার মত এমন শক্তি আর ক্ষমতা পৃথিবীর আর কারও নেই। সে চোখ তুলে তাকালে মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, পাহাড় ধসে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, খরস্রোতা নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়-এমন তেজ আর কার

আছে! কালক্রমে এক সময় পৃথিবীর বুকে শক্তির প্রতীক হিসাবে হযরত আলী (রাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটল। তাঁর শক্তিমত্তার খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। সেই খবর শীতলা দেবীর কানেও গেল। হিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার বুকে। হযরত আলীর শক্তিমত্তার খ্যাতিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। দেবী তার চোখের আগুন দিয়ে হযরত আলীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে হযরত আলী দেবীর এই মনোবাসনার কথা আগে থেকেই জেনে গেলেন এবং সময় মত দেবীকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার কৌশলও ঠিক করে রাখলেন। এক রাতে শীতলা দেবী চুপি চুপি হযরত আলীর ঘরে এসে হাজির হলো। সে দেখতে পেল বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন হযরত আলী। সে জানতেও পারল না, চাদরের নীচে আলীর বদলে শুইয়ে রাখা হয়েছে এক পাথরের মূর্তিকে। আলী তখন জুলফুকার (বর্শা) হাতে ওত পেতে ছিলেন দরজার আড়ালে। দেবীর সমস্ত রোষদৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই মূর্তি মোড়ানো চাদরের উপর। তার দৃষ্টির প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন অনলবর্ষণে মুহূর্তের মধ্যে চাদরে আগুন ধরে গেল, পাথরের মূর্তি গলে গিয়ে তরল লাভায় রূপান্তরিত হলো। দেবী এবার খিল-খিল করে হেসে উঠল। প্রচণ্ড শক্তিমান আলীকে সে আজ ধ্বংস করতে পেরেছে, এখন আর তার শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত কেউ নেই এই দুনিয়ায়। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দেবী যখন খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত আলী দরজার আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দেবীর চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। দেবী কিছু বুঝে ওঠার আগেই আলীর হাতের জুলফুকারের তীক্ষ্ণ ফলা তার একটি চোখে বিদ্ধ হলো। নষ্ট হয়ে গেল তার অর্ধেক ক্ষমতা। এবার আলী যখন দেবীর দ্বিতীয় চোখে জুলফুকার চালাতে গেলেন ঠিক সে সময়ই সে আলীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বসল এবং একই সঙ্গে চিরকালের জন্য হযরত আলীর বশ্যতা স্বীকারের অঙ্গীকার করল। মহানুভব আলী দেবীকে ক্ষমা করে দিলেন। এরপর থেকে এক চোখ হারা দেবীর ক্ষমতা অনেক কমে গেল। তবে সেই

ক্ষমতা একটা মানুষের দেহকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। অদৃশ্য আর দৃশ্যমান, দুই অবস্থায়ই দেবী পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়। যার উপরই তার চোখের দৃষ্টি পড়ে তার শরীরই পুড়ে যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা পড়ে সারা শরীর আস্তে আস্তে গলে-পচে যেতে থাকে। তবে দেবী সব সময় হযরত আলীর প্রভাবিত মানুষদের এড়িয়ে চলে। মানুষের মুখে শীতলা দেবী ও হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কিত এই উপকথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

'এক কথায় বলতে গেলে গ্রামের মানুষ এখন নিয়তির উপর তাদের জীবন ছেড়ে দিয়েছে। মৃত্যুভয়ের শীতল স্রোত নিয়ত তাদের চোখের তারায় খেলা করে চলেছে। আমি যতটুকু পারি দিনরাত আমার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। রাতের বেলা ডাক্তারী ব্যাগ হাতে আমি যখন গ্রামের পথে হাঁটি তখন প্রায়শই আমার মনে হয়, শীতলা দেবী যে কোন সময় আমার সামনে পড়ে যাবে। নিজের এরকম ভাবনায় নিজেই অবাক হই।

'গ্রামের অর্ধেক মানুষ মরে সাফ হয়ে গেল। বাকিরা প্রস্তুত হয়ে রইল লাশ হওয়ার জন্য। কোন কোন বাড়ির একজন মানুষও আর বেঁচে নেই। কোন বাড়িতে সব আপনজনহারা দু'একজন মানুষ বেঁচে আছে, তাদের কাছে এখন বেঁচে থাকার অনুভূতি মৃত্যুযন্ত্রণার চাইতেও বহুগুণ যন্ত্রণাদায়ক। অবস্থা যখন চরম-নিষ্ঠুর মরণযজ্ঞের দিকে মোড় নিল, ঠিক সে সময় এক ফকিরবেশী যুবক এসে হাজির হলো গ্রামে। তার পরনে অতি সাধারণ লুঙ্গি-পাঞ্জাবী, হাতে একটা বর্শা; বর্শার ফলায় অপূর্ব সুন্দর ক্যালিওগ্রাফির মত অসংখ্য আরবী অক্ষর খোদাই করা। তার মাথার বাবরি চুল যেমন সুন্দর তেমনি সৌন্দর্যে ভরা তার দাড়ি: থুতনী থেকে নাভিমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে যেন এক রাশ কালো মেঘ। সে গ্রামের বাড়ি বাড়ি হেঁটে সবাইকে জানিয়ে দিল, সে হযরত আলী (রাঃ) একজন অনুসারী, শীতলা দেবীকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর উদ্দেশেই সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। সেই প্রদীপ্ত যুবকের কথার মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত ছিল যে নিঃসংশয়ে গ্রামের সবাই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল।

তাকে ঈশ্বর প্রদত্ত ত্রাণকর্তা হিসাবে মেনে নিল। সে যুবক সবাইকে আরও জানাল, শীতলা দেবীকে বধ করার ক্ষমতা তার নেই, তবে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা তার আছে আর এ ক্ষমতা সে অর্জন করেছে "আলীর সাধন" করে। গ্রামে মানুষ তার কাছে নত জানু হয়ে বিলাপের সুরে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল।

'এদিকে আমি ভাবলাম এ ব্যাটা এক ভণ্ড ফকির, গ্রামের চরম বিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সে ফায়দা লুটতে এসেছে। কিন্তু একথা কাউকে খুলে বলার সাহস পেলাম না। কারণ এই মুহূর্তে গ্রামের মানুষ যাকে রক্ষাকর্তা হিসাবে মেনে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তারা সবাই তখন আমার উপর খেপে যাবে। আমি নীরবে আমার কাজ করে যাবার পাশাপাশি সে যুবকের দিকে নজর রেখে চললাম। আমার মতই সে দিন-রাত রোগাক্রান্ত বাড়িগুলোতে ঘুরতে লাগল। সে তার কাঁধের ঝুলি থেকে বের করা বিভিন্ন গাছ গাছড়ার রস দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতে লাগল। এতে করে মানুষ আমার চিকিৎসার প্রতি পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলল। তবু আমি হাল ছাড়লাম না, সুযোগ বুঝে নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গে সে যুবকের দেখা হতে লাগল–কখনও গ্রামের রাস্তায়, কখনও রোগাক্রান্ত বাড়ির আঙিনায়। এক রাতে গ্রামের পথে আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হলো তখন আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলাম না, সোজা তাকে উদ্দেশ্য করে বলে বসলাম, "গ্রামের মানুষদের বোকা বানাতে পারলেও আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না ফকির; ওসব দেবী-ফেবী কিছু নয়, তুমি এসেছ ফায়দা লুটতে।"

'আমার কথা শুনে সে যুবক শীতল গলায় বলল, "আমার চাওয়ার যে কিছু নেই, এ কথার প্রমাণ তুমি খুব শীঘ্রিই পাবে, ডাক্তার। আর দেবী আছে কি নেই তা-ও হয়তো জানতে পারবে, তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করি, এ সময়টাতে রাতের বেলা এভাবে একা একা গ্রামের পথে পথে তোমার না ঘোরাই উচিত।"

'ফকিরের ঔদ্ধত্বপূর্ণ জবাব শুনে আমার গা জ্বালা করে উঠল,

আমি তাকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে সে-সুযোগ না দিয়ে ফকির দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। আমি ভাবলাম, এবার হয়তো ফকির গ্রামের মানুষের কাছে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করবে।

'খর-চৈত্রের লু-হাওয়ায় ভর করে দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল। ফকির কারও কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, এমন খবর আমার কানে এল না। দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে আমরা আগের মতই মুখোমুখি হতে লাগলাম। কিন্তু সেদিনের পর থেকে ফকিরকে আমি আর কিছুই বলি না, ফকিরও বরাবর নীরবে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সারাদিন সে চুপচাপ বাড়ি বাড়ি ঘুরে রোগীদের চিকিৎসা করলেও রাতের বেলা ফকিরের গলার উচ্চকিত প্রার্থনা সঙ্গীতের স্বরে সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে। বসত বাড়ির আশপাশ আর গ্রামীণ রাস্তায় বর্শা-হাতে হাঁটতে হাঁটতে ফকির কখনও গেয়ে চলে, "বালা দূর যাওরে, আলী জুলফুকার, এই গেরামখান রক্ষা কর দোহাই দেই আল্লার।" আবার কখনও গেয়ে ওঠে, "আসমান যাঁর জমিন তাঁর দোহাই দেই সেই আল্লার, আলীবাবা-ও আমার হাতে ভর দিয়া দেবীর চোখে জুলফুকার ফিক্কা মারিও।" গ্রামের তটস্থ মানুষ ঘরের ভিতর শুয়ে ফকিরের এসব মন্ত্রবাণী শুনে মনে সাহস খুঁজে পায়। তারা ভাবে মন্ত্র পড়ে পড়ে ফকির দেবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসলে ফকির আসার পর থেকে গ্রামের মানুষের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন আমার চোখে বার বার ধরা পড়েছে। মহামারির প্রকোপ বাড়ার পর থেকে এতদিন ধরে আমি শত চেষ্টা করেও তাদের মধ্যে যে মনোবলের উদয় ঘটাতে পারিনি, ফকিরের আকস্মিক আবির্ভাবে আজ তারা তা-ই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এদিক দিয়ে আমি মনে মনে ফকিরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। তবে ফকিরের এই কেরামতি কতদিন মানুষের মনে এভাবে বিরাজ করে চলবে তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম আমি। মহামারির প্রকোপ মোটেই কমেনি, এখনও লাগাতার মানুষ মরে চলেছে। ফকির কতদিন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে এই দেবী

তাড়ানো খেলা খেলবে, সেটাই হচ্ছে এখন দেখার বিষয়। মোটকথা ফকিরের পরাজয় দেখার জন্য আমি মনে-প্রাণে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'সেই রাতের কথা জীবনে কোনদিন আমি ভুলতে পারব না। রোগাক্রান্ত কয়েকটা বাড়িতে ঘুরে মাঝ রাতের দিকে চেম্বারে ফিরে আসছিলাম। আকাশে চৈত্রজ্যোৎস্নার আলো ভরা একটা চাঁদ। চাঁদের মায়াবী আলো ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের কেয়াঝোপের দেয়ালঘেরা বাগান আর গ্রামীণ ঝোপ-জঙ্গলগুলোর মাথায় মাথায়। সমস্ত প্রকৃতি যেন এক অদ্ভুত উজ্জ্বল-ধূসর মায়াবী রূপে সেজে উঠেছে। চারদিকে জীবন্ত কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। আমি যেন হেঁটে চলেছি ডাকিনী-যোগিনী আর কুহকিনীদের সৃষ্ট এক রহস্যময় মায়াজালের ভিতর দিয়ে। মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই তো আমি এভাবে বাড়ি ফিরছি। কিন্তু আজ হঠাৎ আমার এমন লাগছে কেন? তবে কি কোন কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তে চলেছি? গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, তাপমাত্রা ঠিকই আছে। সচকিত দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে ভাল করে তাকাতেই দেখলাম, সবকিছুই আমার অতি পরিচিত দৃশ্যপট। এই মুহূর্তে আমি করিম শেখের আনারস বাগানের উত্তর পাশের কেয়াঝোপের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি। এতকিছুর পরও বার বার মনে হতে লাগল, বিশাল কোন এক শক্তি আমার নিজের সত্তাসহ চারদিকের সবকিছুকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে চলেছে। চাঁদের অপূর্ব সুন্দর আলোকে আমার কাছে অন্তিম সূর্যের "কালো আঁধার" বলে মনে হতে লাগল। এবার শরীরে এক ধরনের পরিবর্তন শুরু হলো, টপ-টপ করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল কপালের দু'পাশ দিয়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। হঠাৎ কোথা থেকে যেন আগুনের হল্কার মত গরম বাতাস এসে লাগল আমার গায়ে। এরপর যা দেখলাম তাতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। কেয়া ঝোপের কোল ঘেঁষে সাদা কাপড়-পরা এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আমার দেহের ঠিক সামনে। তার মুখাবয়বে এসে পড়েছে চাঁদের আলো; একটি মাত্র চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

একী দেখছি আমি! এ কী করে সম্ভব! স্বয়ং শীতলা দেবী আমার মুখোমুখি এসে হাজির হয়েছে। তার অগ্নিদৃষ্টির প্রভাব আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমার শরীরে। এসবের মধ্যেই হঠাৎ করে প্রবল বিক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল আমার ডাক্তারী সত্তা। মনে মনে ভাবলাম আমার অবস্থা এখন মোটেই স্বাভাবিক নয়। মহামারির জান্তব বিভীষিকা দেখতে দেখতে আর শীতলা দেবীর নাম শুনতে শুনতে, এমনিতেই সেসবের ছাপ আমার মনে গভীর ভাবে গেঁথে আছে। আর আজকের এই নীরব রাতে সে সবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে আমার সামনে; ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে বলে "আউট বার্স্ট"। এই আউট বার্স্টের মাধ্যমেই আমি এখন হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়েছি। দেবী এখনও আগের মতই এক চোখের আগুনদৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এতে আমি মোটেই ভয় পেলাম না। কারণ হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হলে কীভাবে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয় তা আমার জানা আছে। সে বিদ্যা প্রয়োগ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারব আমি এখন যা দেখছি তা নিছক দৃষ্টিভ্রম নাকি বাস্তব সত্য। দেবী এবার ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমি হ্যালুসিনেশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যখন চোখ বন্ধ করে নিজেকে অটোসাজেশন দেয়ার উদ্দেশে প্রস্তুত হচ্ছিলাম একেবারে সেই মুহূর্তে দেবীর ঠিক পেছন থেকে গর্জনের মত শব্দ করে বর্শা হাতে বেরিয়ে এল সেই ফকির। ফকিরের কণ্ঠ কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবী অপার্থিব এক চিৎকার দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। ফকির তাকে পিছু ধাওয়া করে ছুটে চলল সমান বেগে। আমি বজ্রাহতের মত তাকিয়ে রইলাম তাদের গমন পথের দিকে। তাদের অস্তিত্ব যখন আমার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন আমি আবার বাড়ির পথ ধরলাম। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন যেন এক ধরনের জ্বলুনী শুরু হলো। বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুতেই শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এল। সেই সাথে দেহজুড়ে অনুভূত হলো তীব্র ব্যথা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তা আমার খেয়াল ছিল না। পরে জানতে পেরেছিলাম আমার জ্ঞান ফিরেছিল

দু'দিন পর। জ্ঞান ফেরার পর আমি প্রথম যার মুখ দেখতে পেয়েছিলাম সে হচ্ছে সেই দেবীতাড়ানো ফকির। আমার শরীর তখন বসন্তের গুটিতে ভরা, বিছানা ছেড়ে এক চুল সরবার শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই দেহে। বার বার মনে হলো, আমার সারা শরীরে কেউ যেন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সে-কী অসহ্য যন্ত্রণা! চোখের সামনে ভেসে উঠল বসন্তে আক্রান্ত মানুষদের গলিত দেহগুলোর ছবি। নিজে যে নিজের চিকিৎসার চেষ্টা করব সে উপায়ও নেই। এসময় আমার চোখেও গুটি দেখা দিল, পৃথিবীর আলো হারিয়ে গেল আমার দু'চোখ থেকে। শরীরে পচন শুরু হলো, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

আমি যেরাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, তারপর দিন সকালেই ফকির এসে হাজির হয়েছিল আমার শয্যাপাশে। বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছড়ার তৈরি অষুধ প্রয়োগ করে সে আমাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল। আমার গলিত প্রায় চোখে সে একটু পর পর কী একটা অষুধ ঢেলে দিত; তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠত চোখের ক্ষত। ফকিরের সেই অজানা অষুধের কারণেই আমি অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। ধীরে ধীরে আমার শরীরের ঘা শুকিয়ে এল। আস্তে আস্তে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি। সুস্থ হওয়ার পর ফকিরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। যাকে আমি অবজ্ঞা আর অপমানে বার বার ছোট করতে চেয়েছি সে-ই কিনা যেচে এসে আমার জীবন বাঁচাল। ফকির কেন এত ধৈর্য আর কষ্ট সহ্য করে শত্রুতুল্য একজন মানুষকে সুস্থ করে তুলল? এর পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে! কারণ যে একটা আছে তা অবশ্য একদিন ফকিরের মুখ থেকেই জানতে পেরেছিলাম। আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ফকির আমার বাড়িতেই ছিল। একদিন আমার সুস্থ দেহের দিকে তাকিয়ে ফকির বলল, "আমি কাল সকালে চলে যাব, ডাক্তার ভাই, যাবার আগে আমি আপনাকে কিছু কথা বলে যাব। মূলত এই কথাগুলো বলার জন্যই আমি আপনাকে সুস্থ করতে এত চেষ্টা করেছি; সব কিছুই মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছায়ই আপনি

বেঁচেছেন, আমি আমার কথাগুলো বলার সুযোগ পেয়েছি।"

'ফকির সে রাতে আমার বিছানার পাশে বসে কথা বলতে শুরু করল—"প্রথমে আমি যা বলব তা হচ্ছে শীতলা দেবীকে আমি এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনিই হচ্ছেন এ গ্রামের বসন্তে আক্রান্ত শেষ রোগী। আপনার পরে এ পর্যন্ত নতুন করে আর কেউ বসন্তে আক্রান্ত হয়নি। আপনি এক সময় আমাকে অনেক কটু কথা বলেছেন, তাতে অবশ্য আমার মনে কোন রাগের সৃষ্টি হয়নি। কারণ রোগাক্রান্ত মানুষগুলোর প্রতি আপনার সহানুভূতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। শুধু তা-ই নয়, আমি নিজে দেখেছি দেবী স্ব-ইচ্ছায়, স-শরীরে আপনার সামনে এসে হাজির হয়েছিল। শীতলা দেবী খুব কম সময়ই স-শরীরে কোন মানুষের মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে দেবীর মনে কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ জন্মালে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আর এই ঘটনা থেকে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, আপনি বসন্তে আক্রান্ত মানুষদের বাঁচানোর জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তাতে কোন খাদ নেই। রোগাক্রান্তদের প্রতি আপনার এই নির্ভেজাল ভালবাসাকে দেবী সহ্য করতে পারেনি। আপনার সঙ্গে দেবীর মুখোমুখি হওয়ার সময়টাতে ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত না হলে কী ঘটতে পারত বা কী ঘটত তা আপনিই আমার চেয়ে ভাল অনুমান করতে পারবেন। শীতলা দেবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনও আপনার মনে যদি কোন ধরনের সংশয় থেকে থাকে তবে তাতে আমার বলার কিছু নেই।

"'এবার আমি আমার নিজের জীবনের কিছু কথা আপনাকে বলব। আমার বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। তিন গ্রামের পুবের সাধারচর গ্রাম হচ্ছে আমার জন্মস্থান। আমি যখন খুব ছোট তখন শীতলা দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল গ্রামে। এই গ্রামের যে অবস্থার মধ্যে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম, সাধারচর গ্রামের ঠিক সে রকম অবস্থায় এক আলীভক্ত দরবেশ এসে হাজির হয়েছিলেন গ্রামে। তাঁর হাত দিয়ে গ্রামের মানুষের মৃত্যু রহিত হয়েছিল, শীতলা দেবীকে তাড়িয়ে তিনি গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু

ততদিনে আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে কেড়ে নিয়েছিল মহামারির করাল গ্রাস। সর্বহারা ছোট্ট এক বালককে দেখে সেই দরবেশের মনে মমতার ঢেউ উথলে উঠেছিল। তিনি গ্রামের মানুষের অনুমতি নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে তাঁর দেশ ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত দীক্ষা দিয়ে আমাকে বড় করে তুলেছিলেন। গত বছর আমার সেই দরবেশ বাবা দেহত্যাগ করেছেন। দেহত্যাগের আগে তিনি তাঁর মন্ত্রলব্ধ বর্শাটি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, যেখানেই শীতলা দেবীর আবির্ভাব ঘটে সেখানেই যেন আমি নিঃস্বার্থভাবে জীবনপণ করে রুখে দাঁড়াই। দরবেশ বাবার নির্দেশ অনুযায়ী বাড়ি ফিরে আসছিলাম আমি, পথে ভাওয়াল অঞ্চলে একবার মুখোমুখি হলাম শীতলা দেবীর সঙ্গে। বেশ কিছুদিন সময় ব্যয় করে দেবীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে আবার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম, পথে আপনাদের গ্রামের মহামারি দেখে আমাকে আবার রুখে দাঁড়াতে হলো। দেবীকে সামনা-সামনি পাওয়ার আশায় রাতের পর রাত মন্ত্রলব্ধ জুলফুকার হাতে ঘুরতে লাগলাম। এরপর এক অভাবনীয় ঘটনার মাধ্যমে দেবীর দেখা পেলাম। সারারাত ধরে দেবীকে তাড়া করতে করতে সূর্য উঠার পর গ্রামে ফিরে এসে আপনার খোঁজ করে জানতে পারলাম, অজ্ঞান অবস্থায় আপনি বাড়িতে পড়ে আছেন। এর পরের সব ঘটনা-ই তো আপনার জানা।" ফকিরের কথাগুলো শোনার পর আমার মনের সকল চিন্তা, মুখের সকল কথা স্তব্ধ হয়ে গেল। আসলে এখন নির্বাক থাকা ছাড়া কী-ইবা করার আছে আমার! আমি যে বহুভাবে হেরে বসে আছি তাঁর কাছে।

'পরদিন সকালে ফকিরের বিদায়ের খবর শুনে শত-শত মানুষ ছুটে এল। তারা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল, "আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা, মৃত্যুকে তাড়িয়ে আপনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, আমরা চাই বাকি জীবন আপনি আমাদের মাঝেই থাকবেন। আমরা চিরকাল আপনার পা আমাদের মাথায় তুলে রাখব।" গ্রামের অসংখ্য

নর-নারীর এসব আবেগপ্রবণ বাক্যস্রোতের উত্তরে ফকির শুধু বলল, "আমাকে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তবে আপনারা ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, মাত্র তিন গ্রাম পুবের সাধারচর গ্রামেই আমার বাড়ি, এখন থেকে আমি সেখানেই থাকব।" কথাগুলো বলা শেষ করে ফকির দীর্ঘ পদক্ষেপে পুব দিকে যাত্রা শুরু করলেন। অশ্রুভেজা নয়নে অসংখ্য নর-নারী চেয়ে রইল তাঁর গমন পথের দিকে।

আমার সমস্ত সত্তা নিহিত হয়েছিল বাবার কথার মধ্যে। কখন আমি তাঁর পাশে বসেছি? কতক্ষণ ধরে তিনি কথা বলে চলেছেন এসব কিছুই আমি মনে করতে পারলাম না। শুধু টের পেলাম বাবা হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য খুব বেশিক্ষণ তিনি নীরব থাকলেন না, অনেকটা উপসংহারের সুরে আবার শুরু করলেন, 'এতক্ষণ ধরে তোমাকে আমি যে কাহিনীর বর্ণনা শুনিয়ে গেলাম, নিঃসন্দেহে সে কাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে ওই ফকির; যার নাম কার্তিক চাঁদ। আজ বিকালে তুমি আমাকে পীর-ফকিরদের ভণ্ডামি সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলে, সব শেষে জানতে চেয়েছিলে, কার্তিক চাঁদ ফকিরের মধ্যেও এ ধরনের স্বভাব ছিল কিনা। তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিচ্ছি, কার্তিক চাঁদ ফকির ছিলেন আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ, সত্যিকারের মহাপুরুষ; অনন্য এক কুতুব, তাঁর সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না। কার্তিক চাঁদ ফকির সম্পর্কে তোমার মনে যদি আরও কোন প্রশ্ন জেগে থাকে তবে নিঃসংকোচে এখন তুমি তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

আমার প্রশ্ন শোনার আশায় বাবা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হঠাৎ যেন নিশিথ রাত্রির অমোঘ নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাড়ি সংলগ্ন চেম্বারের দেয়ালে ঝোলানো 'গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক' থেকে ঠং-ঠং-ঠং শব্দ ভেসে এল। রাত তিনটা। বাবা নির্বিকার ভাবে আগের মতই বসে রইলেন। আমার ইচ্ছে করছিল বাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাই। কার্তিক চাঁদ ফকির সম্পর্কে

কটূক্তি করে আমি তাঁর সবচেয়ে দুর্বলতম স্থানে আঘাত করেছি। এদিকে তাঁর মুখ থেকে কার্তিক চাঁদ ফকিরের এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন নিথর হয়ে গেছে। দেহটা যেন চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে আছে, হাত-পাগুলো সঙ্গে আছে কি নেই টের পাচ্ছি না। আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে অনড় ও নির্বাক অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বাবা সহজেই আমার অনুতপ্ত মনের অবস্থা টের পেয়ে গেলেন। তিনি হঠাৎ মৃদু স্বরে হেসে উঠে ইজি চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখলেন। এরপর আদুরে গলায় বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে, ব্যাটা, এবার ঘুমোতে যাও।'

আমি মাথা নিচু করে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। সেরাতে বিছানায় শুতেই আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল কার্তিক চাঁদ ফকিরের সেই সুদীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত অদ্ভুত মুখখানি আর বুকের গভীরে সাইরেনের মত বেজে চলল শেকসপীয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটি—স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝে এমন অনেক কিছু আছে যার অনেক কিছুই আমাদের কল্পনার বাইরে।

সরওয়ার পাঠান

আয়না

জর্ডান ম্যানমাউথ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে। এক তরুণ দম্পতি নতুন খোঁড়া কবরের পাশে বসে একে অপরকে চুমু খাচ্ছে। তাদের পেছনে হালকা বাতাসে ম্যাপল গাছের পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছে। ওদের বয়স বেশি হবে না। ভাবল জর্ডান। ছেলেটা হাত দিয়ে মেয়েটার গায়ের কাপড় খোলার চেষ্টা করছে। এমন সময় মাটি ফুঁড়ে বের হলো হাড্ডিসার একটা হাত। হাতের আঙুলগুলো মেয়েটার হাঁটু খামচে ধরল।

কে তাকে ধরেছে, এটা না দেখেই মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল। তারপর তাকাল হাতটার দিকে। দেখল মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসছে একটা লাশ—আর লাশের একটা হাত তার হাঁটু খামচে ধরেছে। এবার মেয়েটার গলা চিরে বের হলো একটা মরণচিৎকার। ওটার চেহারা অপার্থিব সাদা, অনেকটা শহরের পূর্ণিমার চাঁদের মত। চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ. যেন কেউ ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটেছে তার মুখমণ্ডল। ওটার গাল থেকে খসে পড়ছে পচা চামড়া। মেয়েটার মাংস খাওয়ার জন্য হাঁ করল ওটা। পচা দাঁতগুলো কোনমতে মুখের ভেতর আটকে আছে। মুখ দিয়ে বের হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। মেয়েটা অনেক কষ্টে বমি আটকাল।

ছেলেটা ভয় পেল না। লাথি মারল লাশটার শরীরে। মুক্ত করল মেয়েটাকে। তারপর দু'জনে পালানোর জন্য দৌড় দিল। কাঁপতে কাঁপতে তারা দৌড়াচ্ছে। পেছনে দৌড়াচ্ছে তাদের লম্বা ছায়া। কবরস্থানের গেটের কাছে ওরা থামল। ভয় আর পরিশ্রমে দু'জনের বুক দ্রুতগতিতে ওঠানামা করছে। ঘামছে ওরা। গেটে ঝুলছে একটা

শক্ত তালা। এটা দেখে নতুন দম্পতি যেন হারিয়ে গেল আতঙ্কের অতল গহ্বরে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা লাশ মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে। সবগুলো লাশ অস্বাভাবিকভাবে হেলে-দুলে এগিয়ে আসছে তরুণ দম্পতির দিকে।

তরুণ দম্পতি একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে শক্ত করে। বুঝতে পেরেছে জিন্দালাশের হাত থেকে আজ আর তাদের মুক্তি নেই।

চমৎকার স্পেশাল ইফেক্ট, ভাবল জর্ডান। সত্যিই চমৎকার। এমন সময় সিনেমা হলের ভেতরের লাইট জ্বলে উঠল। দর্শকরা হাততালি দিচ্ছে। হলের ভেতর প্রবেশ করল ডিক কেভেটে। পাবলিসিটি ট্যুর সবসময় অপছন্দ করে জর্ডান। ভক্তদের সাথে হাত মিলানো, অটোগ্রাফ দেয়া, ছবি তোলা—এ সব কিছুই তার কাছে মনে হয় ঝামেলার কাজ।

হাততালি থামতেই ডিক বলল, 'প্রিয় দর্শক, আমাদের সাথে এতক্ষণ বসে ছিলেন বিখ্যাত হরর লেখক জর্ডান ম্যানমাউথ। তাঁর পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁকে একনামে সবাই চেনেন। এখন যে দৃশ্যটা দেখানো হলো, সেটা অনেকের কাছে মনে হতে পারে বিরক্তিকর। আবার অনেকে দৃশ্যটা পছন্দ করেছেন। আপনা[illegible] লাগল দৃশ্যটা?' ডিক তাকাল জর্ডানের দিকে।

জর্ডা[illegible]ন। বলল, 'আমার কাছে দৃশ্যটা খুব ভাল লেগেছে। এ সব দৃশ্য দেখে দর্শকদের তো কোনও না কোনও অনুভূতি হবেই। সিনেমা হলে এসে চুপচাপ বসে থাকলে বরং আমার খারাপ লাগে। হাসি, কান্না এবং ভয়—এর যে-কোনও একটা তো সিনেমায় থাকতেই হবে।'

'তারমানে আপনার সিনেমা দেখে দর্শকদের খারাপ লাগলে আপনার করার কিছুই নেই?' বলল ডিক।

'আপনি ভুলে গেছেন [illegible] ছবিটা আমি বানাইনি[illegible] [illegible] হয়ে বলল জর্ডান। 'গল্পটা [illegible] এটা ঠিক। তবে আমার [illegible] যে সবার পছন্দ হবে, সেটা ভেবে [illegible] লিখি না। [illegible] আ[illegible]

করাটাও বোকামি।'

'আপনার কাহিনির প্রতি সুবিচার করা হয়েছে?'

'ঠিকই আছে,' বলল জর্ডান। এখান থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যেতাম। ভাবল সে।

এরপর শুরু হলো লেখক আর ভক্তদের মিলনপর্ব। সেটা চলল ঘণ্টাখানেক। তারপর জর্ডান মুক্তি পেল।

জর্ডান ম্যানমাউথের বয়স পঁয়ত্রিশ। হালকা-পতলা শরীর। ছয় ফুট লম্বা। সবসময়ে দামী কাপড়-চোপড় পরতে ভালবাসে সে। কথা বলার সময় সবাইকে সে মুগ্ধ করে রাখে। কিছুদিন হলো স্ত্রী-র সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। খবরটা সাংবাদিক মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। তখন লেখক হিসাবে সে বেশ নাম করে ফেলেছে। তা ছাড়া সে সময় জর্ডান একটা সিরিয়াস উপন্যাস লিখছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝামেলা সামাল দেয় তার উকিল। ঘটনাটা তার মনে আঘাত করার সময় পায়নি। তবে মারিয়াকে সে খুব ভালবাসত। আসল কথা হচ্ছে, লেখকের জীবন-যাপনের সাথে মারিয়া কখনও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

তার ধারণা তার গল্প পড়ে পাঠকেরা ভয় পায়। আবার বইয়ের পেছনে তার সুন্দর মায়াবী চেহারাটা দেখে ভয়ের কথা তারা ভুলে যায়। এটা ভেবে, হল থেকে বের হওয়ার সময় হাসল সে।

একটা লিমুজিন তার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রায় লাফ দিয়ে পেছনের সিটে বসল সে। দরজা বন্ধ করল। ড্রাইভার সাথে সাথে গাড়ি চালাল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। ব্যাপারটা শেষ হয়েছে. এখন সে বাড়ি যাচ্ছে।

কয়েক মাইল পার হলো গাড়িটা। কেউ কোনও কথা বলল না। এর কিছুক্ষণ পর তারা একটা আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করল। এখানেই জর্ডানের বাড়ি। নামকরা অভিনেতা আর লেখকরা এখানেই থাকে।

'ছবিটা চমৎকার হয়েছে, সার, বলল ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ,' বলল জর্ডান। আশা করছে, ড্রাইভার আর কথা বাড়াবে না। কারও কথা শোনার মত মানসিক অবস্থা তার বর্তমানে নেই। সে এখন একটা লম্বা ঘুম দিতে চায়।

'গল্পগুলো লেখার সময় আপনার ভয় লাগে না, সার?' প্রশ্ন করল ড্রাইভার। 'আমার কিন্তু দারুণ ভয় লাগে।'

'এসব পড়ে আমার ভয় হয় না,' বলল জর্ডান। 'তবে যতদিন মানুষ ভয় পাবে, ততদিন পর্যন্ত তো লিখে যেতে হবে। আর ঠিক ততদিন আমাকে দুই বেলা ভাতের জন্য চিন্তা করতে হবে না।' হাসল জর্ডান। 'ভূত-প্রেত, দানব এসব মানুষ বিশ্বাস করে না। তবে তারা ভয় পেতে ভালবাসে। আমার কাছে ভয়ের জিনিস হচ্ছে বাস্তব জগৎ। প্রেস, এজেন্ট, পাবলিসিটি ট্যুর, বিলের কাগজ–এগুলোকে আমি ভূত-প্রেতের চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাই।'

এরপর ড্রাইভার আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। অবশেষে গাড়িটা জর্ডানের দামি বাড়িটার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সুইচ টিপতেই খুলে গেল লোহার ভারী গেট।

গাড়ি থেকে নামল জর্ডান। ড্রাইভারের হাতের দিকে এগিয়ে দিল বিশ ডলারের একটা নোট। গাড়িটা তার নিজের নয়। পাবলিসিটি ট্যুর গাড়িটা তাকে দিয়েছিল একদিনের জন্য। এরকম একটা গাড়ি থাকলে মন্দ হত না, ভাবল সে। তবে দাম অনেক বেশি।

ড্রাইভার বিশ ডলার বকশিশ পেয়ে হাসিমুখে বিদায় নিল।

নিজেকে বড় দুর্বল লাগছে তার। বাড়ির দিকে তাকাল সে। এমন সময় ছেলেটাকে দেখে তার মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল।

দরজার সামনে, দরজার একেবারে কাছে ঘুমিয়ে আছে একটা ছেলে। এটা দেখে সে প্রথমে অবাক হলো, পরে বিরক্ত। সারাদিনের ক্লান্তির পর এরকম একটা দৃশ্য তার কল্পনাতেও আসেনি।

ছেলেটার বয়স খুব কম। স্কুলে পড়ে হয়তো। গায়ে নোংরা পোশাক। গাড়ির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হুড়মুড় করে সে উঠে দাঁড়াল। প্রিয় লেখককে সামনে দেখে নার্ভাস বোধ করছে সে। তার হাতে একটা বই আর একটা ম্যানিলা এনভেলাপ। এত ছোট

ছেলে তার বইয়ের ভক্ত? অবাক হলো জর্ডান। এই বয়সে তো ছেলেটার তার বই পড়া উচিত নয়। মেজাজ তার আরও খারাপ হলো।

'এখানে কী করছ ফাজিল ছেলে?' ধমকের সুরে বলল জর্ডান। তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে রাগে।

ছেলেটা কাঁচুমাচু করে কোনওরকমে বলতে লাগল, 'আমি... আমি... দুঃখিত মি. ম্যানমাউথ। আপনার অটোগ্রাফ নিতে এসেছি আমি।' বলে ছেলেটা জর্ডানের লেটেস্ট বইটা এগিয়ে দিল।

'তোমাকে আমি অটোগ্রাফ দিচ্ছি না,' বলল জর্ডান। 'আমার অনুমতি না নিয়ে এখানে এসেছ তুমি। তা ছাড়া এই বয়সে বড়দের বই পড়া তোমার উচিত হয়নি। এখন এখান থেকে চলে গেলে খুশি হব আমি।'

'কিন্তু,' ছেলেটা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'আমি আপনার সবচেয়ে বড় ভক্ত। আপনার সব বই আমার সংগ্রহে আছে। হার্ডকভারের এবং পেপারব্যাক সব। এবং...' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। এতই নার্ভাস যে, তার হাত থেকে এলভেলাপটা পড়ে গেল। ভেতরের কাগজগুলো বের হয়ে পড়েছে।

সে দিকে তাকিয়ে জর্ডান বলল, 'তুমি দেখছি একজন লেখক। তোমার লেখা আমাকে পড়তে দিতে চাও? শোনো ছেলে, বাড়িতে আমি এসব করি না।' অবজ্ঞার চোখে ছেলেটার দিকে তাকাল জর্ডান। ছেলেটার শরীর হালকাভাবে কাঁপছে। 'তবে তোমাকে একটা উপদেশ আমি দিতে পারি। টাইপ করতে শেখো।' বলে জর্ডান ছেলেটার পাণ্ডুলিপি পা দিয়ে চাপা দিল ইচ্ছে করেই। চাবি দিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিল। চরম বিরক্ত সে। ছেলেটার সাথে সে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, এটা তার একবারও খেয়াল হলো না।

বাইরে ছেলেটা খুব যত্নের সাথে পাণ্ডুলিপিটা মাটি থেকে তুলল। প্রিয় লেখকের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে তার কচি মনটা ভেঙে গেছে। চোখে চলে এসেছে পানি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল প্রিয়

লেখকের বাড়িটার দিকে। তারপর নিজের অজান্তে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। এরপর যেভাবে দেয়াল টপকে এসেছিল, সেভাবেই দেয়াল টপকে চলে গেল সে।

আকাশে পূর্ণিমার বিশাল চাঁদ। তবে ওটাকেও কেন জানি হঠাৎ করে বিষণ্ন মনে হলো।

সরাসরি বেডরুমে চলে এল জর্ডান। দ্রুত পোশাক বদলাল। তারপর বাথরুমে প্রবেশ করল সে। বাথরুমের ভেতরটা দেখার মত। বাথরুমটা বিশাল। দেয়ালে ঝুলছে বেশ বড় আকারের আয়না। ডিম্বাকৃতির একটা বাথটাব ফ্লোরের ভেতর ঢুকানো। এখানকার সবকিছু টাইলস দিয়ে ঢাকা। একটা টিউব থেকে জেল ঢালল বাথটাবে। তারপর পানির ট্যাপ ছেড়ে দিল সে। গরম পানি। জেলের সাথে মিশে ফেনা হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। হালকা বাষ্প উপরের দিকে উঠতে লাগল। আয়নার দিকে তাকাল সে। চোখজোড়া লাল হয়ে আছে। মুখের চামড়া কুঁচকে আছে। হাত দিল পেটের উপর। সমতল পেটটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, একজন লেখকের জন্য যথেষ্ট। খুশি হলো সে।

বাথটাব ইতিমধ্যে পানিতে ভরে গেছে। গরম পানি। তার মনের মতো। পানিতে এক পা দিয়েছে, এমন সময় তার কাছে মনে হলো, বাথরুমের ভেতর কিছু একটা নড়ছে। পানি থেকে পা তুলে চারদিক তাকাল সে। না, কিছুই নেই। শান্ত হও, নিজেকে বলল সে। তারপর পানির ভেতর নিজের শরীরটা পুরোপুরি ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ ডুবে থাকল সে। সারাদিনের সব ক্লান্তি এবং দুশ্চিন্তা দূর করতে চাইছে সে। কিছুক্ষণ পর পানি থেকে উঠে দাঁড়াল জর্ডান। শরীরটা এখন বেশ হালকা এবং ঝরঝরে লাগছে।

লম্বা একটা তোয়ালে দিয়ে শরীরের নিম্নাংশ ঢাকল সে, আয়নার সামনে দাঁড়াল। বাষ্পের ফলে আয়নার উপর কুয়াশার প্রলেপ পড়েছে। হাত দিয়ে সেটা পরিষ্কার করল জর্ডান। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকাল। নিজের চেহারা তো আছেই। তা ছাড়া তার

পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চেহারাটা তার পেছনে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোকটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। কারণ আগন্তুক কালো একটা মুখোশ পরে আছে। তবে চোখজোড়া দেখে জর্ডানের পিলে চমকে গেল। নির্দয় এক মানুষের মুখ, যাকে ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সে পরে আছে একটা আলখাল্লা। ভয়ের একটা শীতল স্রোত আর মেরুদণ্ড বেয়ে উপরে চলে এল। ঘুরে দাঁড়াল সে।

অবাক কাণ্ড, বাথরুমে কেউ নেই। সারা শরীর ক্লান্ত হয়ে আছে তার। এর জন্য বোধহয় সে আজেবাজে জিনিস দেখতে শুরু করেছে। আয়নার দিকে আবার তাকাল সে। নিজের চেহারা ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। দাঁত ব্রাশ করতে যাবে, এমন সময় মুখোশ পরা আগন্তুককে আবার দেখতে পেল সে। তার পেছনে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা রশি। তার গলায় সেটা প্যাঁচানোর জন্য আগন্তুক এগিয়ে আসছে।

জর্ডান এবার চেঁচিয়ে উঠল। ঘুরে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এসেছে। তবে কাউকে দেখা গেল না। বাথরুমে সে ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই। তার মেজাজ চড়ে গেল। এর জন্য কাকে দায়ী করবে, সেটা ভেবে পেল না জর্ডান। বাথরুম থেকে বের হয়ে শোবার ঘরে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সেখানেও কাউকে দেখা গেল না। পরিষ্কার আকাশ। বিশাল চাঁদটা ঝুলে আছে সেখানে।

জানালা বন্ধ করল জর্ডান। পর্দা টেনে দিল। দরজা বন্ধ করল ভালমত। শোবার ঘরে যে আয়নাটা আছে সেখানে গিয়ে তাকাল। নিজের বিমর্ষ চেহারার সাথে অপরিচিত লোকটার নিষ্ঠুর কালো অবয়বটা সে দেখতে পেল। সাথে সাথে পেছনে তাকাল সে। কাউকে দেখতে পেল না। রাগে, উত্তেজনায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হলো তার।

এসব কী হচ্ছে? জেগে জেগে সে স্বপ্ন দেখছে নাকি? এ রকম তো আগে হয়নি। দুঃস্বপ্ন সে অনেক দেখেছে। সবাই দেখে। কিন্তু

এরকম কখনও হয়নি। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখা। দরজার দিকে তাকাল সে। মনে হচ্ছে যে-কোন সময় কেউ একজন দরজায় টোকা দেবে অথবা ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করবে। কিন্তু এরকম কিছুই ঘটল না।

নীরব রাত। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে চাইছে সে। অথবা কুকুরের ডাক। যে-কোনও শব্দ হলেই চলবে। কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ হচ্ছে না। সে শুধু শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। সে কি পাগল হতে চলেছে? নাকি সে প্রচণ্ড দুর্বল? এমন সময় ছেলেটার কথা মনে পড়ল। ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে এলে পারত সে। তার সাথে অন্তত কিছুক্ষণ কথা বলা যেত। এতে হয়তো তার কিছুটা উপকার হত।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে হেলেনের নাম্বার ঘুরাল সে। হেলেনের সাথে ঘনিষ্ঠতা সবে শুরু হয়েছে। তাকে কাছে পেলে কিছু প্রশ্ন করা যেত।

'হ্যালো,' অপর পাশ থেকে হেলেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'হেলেন, আমি, জর্ডান বলছি,' বলল সে। 'তুমি শুনতে পাচ্ছ? এখন কি তুমি আমার কাছে আসতে পারবে?'

'হেলেন বলছি,' বলল হেলেনের কণ্ঠস্বর। 'আমি ফোন ধরতে পারছি না। সময় নষ্ট না করে মেসেজ রেখে যান। ধন্যবাদ।' চুপ করল মেশিনটা।

'আমি জর্ডান বলছি, বলল জর্ডান। 'তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। মেসেজ পাওয়ামাত্র আমার এখানে চলে এসো।' রিসিভার রেখে দিল সে।

নিজের মনকে এখন শক্ত রাখা প্রয়োজন, ভাবল সে। কিছুই হয়নি। হয়ে থাকলেও সেটা এখন ঠিক হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল সে। তোয়ালেটা খুলে একটা গাউন পরল সে। তারপর চলে গেল নীচের স্টাডিরুমে, যেখানে অন্যান্য জিনিসের সাথে নানারকম মদও রাখা আছে।

রুমটা বেশ বড়। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। যে-কয়টা বাতি নিভে

ছিল, সেগুলোও জ্বালল সে। ঘরের মাঝখানে একটা মেহগনি কাঠের টেবিল। এর উপর রাখা আছে কম্পিউটার। দেয়াল ঘেঁষে সিলিং পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে দুটো বিশাল সাইজের বুকশেল্ফ। নানারকম বই রাখা আছে সেখানে। একটা শেল্ফের কয়েকটা তাকে রাখা আছে শুধু তার প্রকাশিত সব বই। দেয়ালে লাগানো আছে কয়েকটা হরর ছবির পোস্টার–এগুলো তার বই থেকে বানানো হয়েছে।

চেয়ারে বসল সে। তার হাঁটু কাঁপছে। সেটা থামানোর চেষ্টা করেও পারল না জর্ডান।

উঠে দাঁড়াল সে। চলে এল মিনি বারে। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল সে। তারপর বোতল থেকে এক গ্লাস মদ ঢেলে এক চুমুকেই সাবাড় করে দিল। এরপর আরেক গ্লাস। এতক্ষণ সে আয়নাটা দেখেনি। তার সামনে দেয়ালে ঝুলানো আছে একটা আয়না। সেদিকে তাকাল জর্ডান।

তার চেহারার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কালো আলখাল্লা পরে আছে সে। মুখে কালো মুখোশ। দুই হাতে চামড়ার গ্লাভস পরা। এবং একটা হাতে সে ধরে আছে একটা রশি।

জর্ডান একটা মরণচিৎকার দিল। হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাসটা। ঘুরে তাকাল পেছনে। ভেবেছিল আক্রমণকারীকে দেখতে পাবে। কিন্তু স্টাডিরুমে কাউকে দেখা গেল না। জিনিসপত্র যে রকম ছিল, ঠিক সেরকমই আছে।

আয়নার দিকে আবার তাকাল সে। আগের মতই দেখতে পেল লোকটাকে। কালো আলখাল্লা পরে আছে সে। লোকটা তার খুব কাছে চলে এসেছে, কারণ লোকটার চোখজোড়া সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সেখানে চোখের বদলে দেখতে পেল গহীন কালো অন্ধকার।

রাগে এবং ভয়ে জর্ডান একটা বোতল আয়নার দিকে ছুঁড়ে মারল। ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আয়নাটা ভেঙে অসংখ্য টুকরোয় পরিণত হয়ে ফ্লোরে পড়ল।

ভাঙা টুকরোগুলোতেও জর্ডান দেখতে পেল আগন্তুককে। সবাই

তার দিকে এগিয়ে আসছে তাকে আক্রমণ করার জন্য। পেছনে তাকাল সে—কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

'তুমি যেই হও,' চেঁচিয়ে বলল জর্ডান, 'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে শান্তি দাও।'

স্টাডিরুম থেকে দৌড়ে বের হলো সে। দরজা বন্ধ করল। এরপর একে একে বাড়ির সব দরজা ভালমত বন্ধ করল। জানালাও বন্ধ করল। হেলেনকে আবার ফোন করেও পেল না সে। পুলিশকে ফোন করল। লাইন ব্যস্ত। তাকে পরে ফোন করতে বলল ওরা।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সে। রাত বারোটা বেজে গেছে। তার সারাশরীর ঘামে ভিজে একাকার। এই ঘরটাতে কোনও আয়না নেই। এখানেই সে বিছানার উপর চুপচাপ বসে থাকল। রাত তিনটার দিকে গভীর ঘুম তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল।

*

সকাল নয়টায় তার ঘুম ভাঙল। নিজেকে কেমন জানি বোকা বোকা লাগছে তার। এখনও ক্লান্ত সে। রাতের অভিজ্ঞতায় বিধ্বস্ত। জর্ডান গোসল করল। শেভ করে কাপড় পরল। তারপর জানালাগুলো সব খুলে দিল। রাতের অভিজ্ঞতার কারণ খুঁজছে সে। রাতে সে এত ভয় পেল কীভাবে? কল্পনার এক আগন্তুক কীভাবে তাকে ভয় দেখাল? ভয় দেখানো তো তার কাজ, তা হলে এরকম ভীতিকর অবস্থার মধ্যে সে কীভাবে এবং কেন পড়ল? তবে, ছেলেবেলায় একটা দুঃস্বপ্ন সে ঠিকই দেখত। চেঁচিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ত। সেটা তো অনেক আগের কথা।

রাতের ঘটনাটা মাথা থেকে বের করে দিল সে। আজকের দিনটার কথা ভাবতে লাগল। ভক্তদের কথা মনে পড়লে আগে মনটা খুশিতে ভরে যেত। কিন্তু আজ তাদের কথা মনে হতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। টাকা দিয়ে কেন যে ওরা ভয়ের বই কেনে! আর সে যে কেন এত বিষয় থাকতে হরর লেখাতেই নাম করে ফেলল!

ঘর থেকে বের হলো জর্ডান। বাড়ির বাইরে এল সে। আলোকিত

একটা দিন। চারদিকে নানারকম ফুল ফুটেছে। বাতাসে তাদের গন্ধ ভেসে বেরাচ্ছে। গাড়ি চালিয়ে সেঞ্চুরি সিটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ড্রিমড্রিম ছবির পরিচালকের সাথে তার একটা মিটিং আছে।

গেটহাউসের সামনে গাড়ি থামাল জর্ডান। ভেতরে ঢুকতে হলে টিকিট কিনতে হবে তাকে। টিকিট নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হলো। তবে গাড়ি থেকে নামতে হলো না। একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই অস্থির লাগছে। কোটিপতি হওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে আছে। তার সামনের গাড়িতে বসা লোকটা গার্ডকে কী জানি জিজ্ঞেস করছে। পেছনের গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। সেও যেন অস্থির হয়ে আছে কোনও কারণে। কৌতূহলবশত জর্ডান রিয়ার ভিউ মিররের দিকে একবার তাকাল। হতে পারে গাড়ির ড্রাইভার তার পরিচিত।

কিন্তু আয়নায় যাকে দেখল, সেটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সেই আলখাল্লা পরা লোকটা তার গাড়িতে পেছনের সিটে বসে আছে। তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার হাতে রশি।

জর্ডান চিৎকার করে গাড়ি থেকে বের হলো। সিকিউরিটি গার্ড সাহায্যের জন্য তার দিকে এগিয়ে এল। আরেকজন গার্ডও এগিয়ে এল।

কিন্তু তার আগেই জর্ডান দৌড়ে গার্ডদের কাছে এগিয়ে এল।

'সার,' একজন গার্ড বলল, 'আপনার গাড়ি?'

'সে আমাকে খুন করতে চায়,' তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে বলল জর্ডান। 'রশি দিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে মারতে চায় সে।' জর্ডান একজন গার্ডের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল।

'কী?' বলল একজন গার্ড 'কিন্তু সার, আপনার গাড়ি?'

জর্ডান গার্ডের কাঁধ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল। তার পেছনে যে গাড়িটা থেমে আছে, তার ড্রাইভারকে সে চেনে না। তবে লোকটা হাত উঁচু করে জানতে চাইছে সামনের গাড়িটা কখন সরবে।

একজন গার্ড বলল, 'সার, আপনাকে গাড়িটা সরাতে হবে। গাড়িটা এখানে [illegible] পারবেন না আপনি।'

জর্ডান [illegible] ঝাঁকি দিল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল,

'তোমাদের আমি বলছি কেউ একজন আমাকে খুন করতে চাইছে। আর তোমরা আমার গাড়ির চিন্তায় আছ!'

গার্ড সানগ্লাস পরেছিল। সেদিকে তাকাল জর্ডান। সেখানে দেখতে পেল আলখাল্লা পরা লোকটাকে। রশি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। জর্ডান আবার চিৎকার দিল। গায়ের সব শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি মারল গার্ডের চশমার উপর। গার্ড এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘুসির চোটে পেছনের দিকে হেলে গেল গার্ড। চশমা ছিটকে পড়ল অনেক দূরে।

চশমাটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে দৌড়ে চলে গেল জর্ডান। তারপর জুতো দিয়ে চশমাটাকে পিষতে লাগল। গার্ড দু'জন পিস্তল বের করে এগিয়ে আসছে জর্ডানের দিকে।

জেলের অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। তাই বর্তমান অবস্থাটা তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। ভেতরে আরও অনেকেই আছে। তারা কে কোন অপরাধ করেছে, সেটা জর্ডান আন্দাজ করতে পারছে না। তবে এরা যে সবাই প্রফেশনাল ক্রিমিনাল, এতে তার কোনও সন্দেহ নেই। তাই এদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল। সে পরে আছে অত্যন্ত দামি একটা সুট, ওটাতে যাতে ময়লা না লাগে, সে ব্যাপারে সে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করছে।

বিশাল সাইজের একটা লোক তার কাছে এসে বলল, 'শালা, কিছু টাকা দে।'

আয়নায় দেখা লোকটার সাথে এর কিছুটা মিল খুঁজে পেল জর্ডান। প্রচণ্ড আক্রোশে তার শরীরটা কেঁপে উঠল। তবে লোকটাকে সে টাকা দিল না। বরং লোকটার পাছায় কষে একটা লাথি দিল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমার কাছ থেকে দূরে থাকবি তোরা। মনে থাকে যেন!'

সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে বোধহয় সবাই পাগল ভাবছে। তবে এতে কাজ হয়েছে। এরপর কেউ তাকে বিরক্ত করতে এল না। সেলের কোনায় বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল হেলেনের

জন্য। কিছুক্ষণ পর হেলেন এল। ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে।

হেলেন বলল, 'তোমাকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' খুশি হয়ে বলল জর্ডান। 'অন্তত এখান থেকে বের করো।'

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে জর্ডানকে জেল থেকে বাইরে নিয়ে এল হেলেন।

বাইরে এসে ওরা হেলেনের গাড়িতে উঠল। হেলেন ড্রাইভ করছে। প্রচণ্ড লজ্জায় কুঁকড়ে আছে জর্ডান। নিজেকে বিব্রত মনে হচ্ছে। কিছুটা পাগল পাগল মনে হচ্ছে।

'ব্যাপারটা আমাকে সহজভাবে চিন্তা করতে দাও,' বলল হেলেন। এ নিয়ে কথাটা সে মোট দশবার বলল। 'কেউ একজন তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। একমাত্র তুমিই তাকে দেখতে পাও। তা-ও আবার আয়নায়। অথবা আয়নার মত কিছুতে। তারপর ঘুরে দেখো কেউ নেই। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি,' বলল জর্ডান। 'তুমি যা বললে ঠিক সেরকম। এতে একটুও ভুল নেই।' তবে হেলেনের চেহারা দেখে জর্ডান সহজেই বুঝল যে, হেলেন তার কথা বিশ্বাস করেনি। অবশ্য সে যা বলছে, সেটা সহজে বিশ্বাস করার মত নয়।

'বাড়িতে, নাকি অফিসে?' প্রশ্ন করল হেলেন।

'বাড়িতেই যাওয়া উচিত,' বলল জর্ডান। তবে কণ্ঠস্বরে সে কোনও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেল না।

গৃহপরিচারিকা গ্রেটা কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো পরিষ্কার করছিল। জর্ডান বাড়িতে প্রবেশ করার পর, গ্রেটা তার দিকে সরাসরি এমনভাবে তাকাল যে, জর্ডান বুঝতে পারল গ্রেটা তার উপর দারুণ বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ত হয়েছে, খুব ভাল কথা। পাগল না ভাবলেই হবে। ভাবল জর্ডান।

যেখানে আয়নাটা ছিল সেদিকে তাকিয়ে হেলেন বলল, 'আয়নাটা

ওখানে ছিল?'

জর্ডান সেদিকে না তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তবে আরও আছে।'

হেলেন জর্ডানকে নিয়ে উপরে উঠে এল। বাথরুমে এল ওরা, যেখানে সবকিছুর সূত্রপাত।

'বাচ্চা ছেলের মত করছ কেন, জর্ডান?' হাত ধরে বলল হেলেন। 'তুমি যে কেন ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারছি না। আমি তো ভয় পেতে চাই। কিন্তু কোনকিছুতেই আমার ভয় নেই। এখন আয়নাটা দেখাও তো!'

জর্ডান হেলেনের দিকে তাকাল। তার কাছে চলে এল। সে তাকাল হেলেনের বড় বড় চোখজোড়ার দিকে। তারপর চোখ চলে গেল আয়নার দিকে। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে সে মনোযোগ দিয়ে তাকাল। তখন সে দেখতে পেল তাকে। কালো একটা অবয়ব, হাতে রশি। তার পেছনে, তার গলায় ফাঁস পরানোর জন্য প্রস্তুত।

'ওই তো সে!' চিৎকার করে বলল জর্ডান। আঙুল দিয়ে দিয়ে আয়নার দিকে ইশারা করল সে।

'জর্ডান! এখানে কেউ নেই! কিছুই নেই এখানে!' উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল হেলেন। আয়নার দিকে তাকাল সে। নিজের চেহারা ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখতে পেল না। 'আয়নার ভেতর কেউ নেই। এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই, জর্ডান!'

'আছে! তুমি দেখতে পারছ না!' চোখ বন্ধ করল জর্ডান। বাথরুম থেকে বের হলো সে। চোখ বন্ধ করেই বেডরুমে এল। কপাল ভাল, ভাবল সে। কারণ এখানে কোনও আয়না নেই। থাকলেও সেটা সে নিজের অজান্তে আগেই সরিয়ে ফেলেছে।

হেলেন দৌড়ে বেডরুমে চলে এল।

জর্ডান বালিশের উপর মুখ দিয়ে শুয়ে আছে। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ফোঁপাচ্ছে সে। হেলেন সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসল। হাত বুলাতে লাগল জর্ডানের পিঠে। 'তুমি ঠিক আছ তো, জর্ডান?' জিজ্ঞেস করল হেলেন। 'ভয় নেই। আমি কাছে আছি।'

'আমাকে কি সুস্থ মনে হচ্ছে?' বালিশে মুখ রেখেই বলল জর্ডান।

ফোঁপাচ্ছে সে। 'আমি কি কখনও এ রকম ছিলাম?' এবার রীতিমত কাঁদতে লাগল সে। হেলেন জর্ডানকে কাঁদতে দিল। কাঁদলে মানুষের মন হালকা হয়, ভাবল হেলেন। এরপর জর্ডান বালিশ থেকে মুখ তুলে তাকাল হেলেনের দিকে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আছে। 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি, হেলেন?'

হেলেন মাথা নাড়ল। তার চোখে অবিশ্বাস এবং বিস্ময়। শান্ত ভাবে বলল সে, 'আমি কি কিছু করতে পারি তোমার জন্য? তবে এখন তোমার ঘুমের প্রয়োজন। সকালে উঠে যা করার করা যাবে। ভয় নেই, ডার্লিং। আমি তো আছিই।'

রাতে ঘুম হলো না জর্ডানের।

চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠল কালো মুখোশ পরা নিষ্ঠুর সেই মানুষটাকে। রশি হাতে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কোনও মুহূর্তে তাকে খুন করার জন্য প্রস্তুত সে। কিন্তু কেন? এটা ভাবল সারা রাত। কিন্তু কোনও উত্তর পেল না জর্ডান ম্যানমাউথ।

সকাল বেলায় জর্ডান বলে দিল হেলেনকে কী কী করতে হবে। জর্ডানের কথামতো বাড়ির সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিল হেলেন। সব আয়না ঢেকে দিল বিছানার চাদর দিয়ে। ফ্লোরের চকচকে টাইলসগুলোর উপর বিছিয়ে দেওয়া হলো খবরের কাগজ। দেয়ালে বাঁধানো সব ছবিগুলো উল্টে রাখা হলো। রান্নাঘর ও বাথরুমের চকচকে অংশগুলোতে রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। টিভি উল্টে রাখা হলো। শেষে হেলেন তার সানগ্লাসটা ময়লার বাক্সে ফেলে দিল। ব্যস, বাড়িতে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তাকালে নিজের প্রতিফলন দেখা যাবে। খুশি হয়ে ভাবল হেলেন।

হলরুমের সোফায় বসে আছে জর্ডান। গায়ে কম্বল। তারপরও তার শরীর কাঁপছে। সকালে সে কিছু খায়নি। হেলেন চেষ্টা করেও খাওয়াতে পারেনি জর্ডানকে। কাঁচের তৈরি টেবিলটাও কাগজ দিয়ে ঢাকা হয়েছে। জর্ডান বুঝতে পারছে, হেলেন ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। এবার হয়তো সে ডাক্তারের কথা বলবে। যদি বলে,

তা হলে জর্ডান না করবে না।

'কফি খাবে?' জিজ্ঞেস করল হেলেন।

জর্ডান না করল না। বুঝতে পারছে সে, শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। হেলেন কফি আনতে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ইচ্ছা হলো ডেকে হেলেনকে থামাতে। কারণ একা একা তার ভয় করছে। কফি না খেলেও চলবে, এটা সে বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ডোরবেলটা বেজে উঠল।

হেলেন গিয়ে দরজা খুলল। বলল, 'কাকে চাই?'

এক মহিলা কণ্ঠস্বর বলল, 'আমরা এসেছি জর্ডান ম্যানমাউথের ইন্টারভিউ নিতে। তিনি প্রস্তুত আছেন তো? আসলে, একটু দেরি করে ফেলেছি আমরা। সে জন্য দুঃখিত। তবে এক ঘণ্টার বেশি সময় নেব না আমরা।' মেরি হার্ট হেলেনকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। এরপর ঢুকল সুট পরা এক ভদ্রলোক। সবার শেষে ক্যামেরাম্যান।

'মি. জর্ডান, কেমন আছেন?' বলল মেরি হার্ট। মুখে হাসি লেগেই আছে।

তাদের দেখে জর্ডান যেন হারিয়ে যেতে চাইল সোফার গদির ভেতর।

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলল হেলেন। 'সাক্ষাৎকারের তারিখটা পেছাতে...'

সুট পরা ভদ্রলোক হেলেনের কথা শুনল না। সে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দিলঃ ক্যামেরা রেডি করো। কোনওকিছু যেন বাদ না পড়ে।'

কম্বলের ভেতর থেকে অনেক কষ্টে জর্ডানের হাতটা বের করে হ্যান্ডশেক করতে করতে মেরি হার্ট বলতে লাগল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমি আপনার একজন বড় ভক্ত। ভয়ের গল্প আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমি দুঃখিত,' ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছে হেলেন। 'কিন্তু...'

'দেখুন,' বলল জর্ডান। আজকেই ওদের আসতে বলেছিল সে।

এটা সে ভুলে গেল কীভাবে? 'আসলে আমি... আরেকদিন... এটা ঠিক হচ্ছে না...'

'ঠিক আছে,' বলল মেরি হার্ট। 'আধঘণ্টাই যথেষ্ট হবে।' সে তাকাল প্রযোজকের দিকে।

'ঘরের বাইরে যেতে চাইলেও কোনও সমস্যা নেই,' বলল প্রযোজক।

'না, এখানেই ঠিক আছে,' হাসিমুখে বলল মেরি হার্ট। 'হরর গল্পের লেখক কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে কোনও কারণে তিনি ভয় পেয়েছেন। এই পরিবেশটাই দারুণ হবে।'

'দেখুন,' এবার রেগে গেল হেলেন। হেঁটে চলে এল মেরি হার্টের কাছে। তার হাতটা ধরল। 'আজকের ইন্টারভিউ ক্যান্সেল করতে হবে। আপনাদের লেখক সাহেব অসুস্থ।'

আরেকজন লোক ফ্লাডলাইটগুলো সেট করে জ্বালিয়ে দিল। প্রচণ্ড আলোতে যেন জর্ডানের চোখজোড়া অন্ধ হয়ে গেল সাময়িকভাবে। ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরা জর্ডানের দিকে সেট করে বলল, 'রেডি।'

তার পক্ষে সম্ভব হবে না, ভাবল জর্ডান। মুখে হাসি আনা তার পক্ষে সম্ভব না। যতই চেষ্টা করুক সে, ক্যামেরার দিকে চেয়ে হাসতে পারবে না সে। অন্তত আজকে সেটা অসম্ভব।

সে বলল, 'দেখুন...'

তবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্যামেরার বিশাল একটা চোখ। ক্যামেরার লেন্সের কাঁচে সে দেখতে পেল নিজেকে। আরও একজনকে দেখল সে। তার পেছনে কালো আলখাল্লা পরে তার নীচে শুয়ে আছে। তাকে জড়িয়ে ধরে আছে... মুখে কালো মুখোশ... হাতে রশি... জর্ডানের গলায় ফাঁস পরানোর জন্য প্রস্তুত সে।

জর্ডান চিৎকার দিয়ে ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কা দিল। কম্বলটা ছুঁড়ে দিল আরেকদিকে। তার শরীরের ধাক্কায় সোফাটা উল্টে পড়ল। ফ্লোরে পড়ে গেল সে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। মনে হচ্ছে তার দম আটকে আসছে।

'আপনাদের আগেই বলেছিলাম,' চেঁচিয়ে বলল হেলেন, 'তিনি

অসুস্থ। শুনলেন না আমার কথা। এখন দেখুন। এর জন্য আপনারাই দায়ী। এখনই আপনারা বের হয়ে যান!

ক্যামেরাম্যান এখন স্থির হয়েছে।

'যা ঘটেছে তার সবটুকই তো নেওয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল প্রযোজক।

'সবটুকু,' হাসল ক্যামেরাম্যান। 'কিছুই বাদ যায়নি। দারুণ জিনিস, স্যর!'

'আজ রাতের খবরে যাচ্ছে এটা,' খুশি হয়ে বলল প্রযোজক। 'অনেকদিন হলো দর্শকরা মজার কিছু পায় না। তবে আজ পাবে।'

এরপর ওরা বিদায় হলো।

জর্ডানের চোখজোড়া কাপড় দিয়ে বাঁধল হেলেন। তারপর কোনওরকমে তাকে উপরে বেডরুমে নিয়ে এল। চোখ থেকে কাপড় খুলে নিল হেলেন।

জর্ডানের শরীরটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপছে থরথর করে। তার কারণ তার মাথা এখন আর কাজ করছে না।

'পানি,' বলল জর্ডান।

হেলেন এক গ্লাস পানি আনল। জর্ডানকে বলল চোখ বন্ধ করতে। তারপর তাকে সোজা করে বিছানায় বসাল। পানির গ্লাসটা ধরল মুখের কাছে। অসুস্থ মানুষকে নার্স যেভাবে পানি খাওয়ায়, ঠিক সেইভাবেই হেলেন জর্ডানকে পানি খাওয়াল। পানি খাওয়ার সময় জর্ডান চোখজোড়া বাচ্চা ছেলের মত বন্ধ করে রাখল। গ্লাসের পরিষ্কার টলটলে পানিতে যেন নিজের চেহারা না দেখা যায়।

'ঘুমের ট্যাবলেট,' বলল হেলেন। 'এটা খাও। তারপর শান্তভাবে শুয়ে পড়ো। আমার মনে হয়, আপাতত এটাই সবচেয়ে বড় অষুধ। লম্বা একটা ঘুম দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া আগামীকাল আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।'

হেলেন জর্ডানের ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল নানা কথা। জর্ডানের এরকম অবস্থা হলো কীভাবে? সে-ই তো

মানুষকে ভয় দেখানোর কাজটা করে। নিজের তো ভয় পাবার কথা নয়। পাঠকের চাহিদার কারণে ক্রমাগত লিখতে লিখতে কি তার নার্ভাস ব্রেকডাইন হয়েছে?

'আজ রাতে তুমি আমার সাথে থাকছ তো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জর্ডান। 'তাই না?'

'অবশ্যই,' বলল হেলেন। 'তোমার পাশে, ঠিক এখানে আমি থাকব। ভয় নেই।'

জর্ডান চোখ খুলল। হেলেনের চেহারাটা তার কাছে অসম্ভব সুন্দর মনে হচ্ছে। মায়াভরা চোখ। মুখে সান্ত্বনার হাসি। তার পাশে বসে আছে। তাকে আদর করছে।

'তোমাকে আমি ভালবাসি,' বলল জর্ডান।

'আমিও, ডার্লিং,' হাসিমুখে উত্তর দিল হেলেন।

হেলেনের আরও কাছে চলে এল জর্ডান। বলল, 'এই অবস্থার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'সেটা আমি জানি,' বলল হেলেন। জর্ডানের ঠোঁটে হাত রাখল সে। 'এখন চুপচাপ ঘুমাও তো।' বলে জর্ডানের গালে চুমো খাওয়ার জন্য আরও কাছে চলে এল হেলেন। চুমো খেয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল জর্ডান। উঠে দাঁড়াল হেলেন। গভীরভাবে একটা শ্বাস নিল। জর্ডানকে এখন কিছুটা স্থির মনে হচ্ছে।

'ঘুমাও,' বলল হেলেন। 'ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'আমি জানি,' বলল জর্ডান। চোখ খুলে তাকাল হেলেনের দিকে। হেলেনের চেহারাটা তার খুব কাছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব কাছে। মায়াভরা বড় বড় দুটো চোখ। সেখানে মনোযোগ দিয়ে তাকাল সে। আর দেখতে পেল নিজের চেহারা। সেই সাথে কালো আলখাল্লা পরা আগন্তুক। তাকে মারার জন্য তার পেছনে রশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চেঁচানোর শক্তি পাচ্ছে না সে। গলায় পেঁচিয়ে আছে অদৃশ্য একটা রশি—সেটা দুই হাত দিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে সে, যাতে দম নিতে পারে। কিন্তু রশির টান মারাত্মক।

অপার্থিব কোনও শক্তি যেন রশিটা টানছে। সামনের দিকে ঝোঁকার চেষ্টা করল সে। কিন্তু রশির টানে পেছনে চলে এল। ধাপাস করে বিছানায় পড়ল তার শরীর। যন্ত্রণা আর আতঙ্ক নিয়ে পড়ে আছে সে। মনে হচ্ছে কেউ একজন তাকে মেরে ফেলেছে।

হেলেন হাঁটু গেড়ে জর্ডানের উপর ঝুঁকে আছে। জর্ডানের অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে দিশেহারা। চিৎকার করে বলছে সে, 'জর্ডান। কী হয়েছে? কোনও ভয় নেই। আমি আছি। আমাকে সাহায্য করতে দাও!'

হেলেনের কথা কানে যেতেই গলাতে রশির চাপটা চলে গেল। জর্ডান চোখ খুলল। তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে হেলেন। তার চোখজোড়া এখন আরও কাছে। টলটল করছে অশ্রু। সেখানে ভেসে আছে জর্ডানের চেহারা। তার পেছনে রশি হাতে সেই অশরীরী খুনি।

জর্ডানের মনে হলো, কেউ যেন তার শরীর থেকে চামড়া তুলে নিচ্ছে। তার মুখ চিরে বের হলো এক মরণচিৎকার।

হেলেন আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না। হিস্টিরিয়া রোগীর মত সে-ও চেঁচাতে লাগল।

জর্ডান ম্যান্সমাউথ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল। তারপর দৌড়ে চলে গেল বারান্দায়। রেলিং-এর উপর উঠে দাঁড়াল সে। দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল পাখির ডানার মত।

কোত্থেকে জানি হাসির শব্দ আসছে। অসংখ্য দর্শক হাততালি দিচ্ছে। তার চেহারাটা এখন বীভৎস, কদাকার। মরা মানুষের মত। অনেকটা শহরের আকাশে ওঠা পূর্ণিমার চাঁদের মত। মুখমণ্ডলে অসংখ্য ভাঁজ—যেন কেউ ছুরি দিয়ে তার মুখটাকে ফালা ফালা করে কাটতে চেয়েছে। গাল থেকে খসে পড়ল চামড়ার কিছু অংশ।

শরীরের সব শক্তি এক করল জর্ডান।

তারপর আকাশে ওড়ার জন্য সামনের দিকে, শূন্যে লাফ দিল।

আর দেখতে পেল অসংখ্য দর্শক তার এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে যাচ্ছে।

*

বাড়িটার সীমানার বাইরে, একটা গাছের নীচে বসে আছে ছেলেটা। তার হাতে একটা পাণ্ডুলিপি, যার উপর পা দিয়েছিল তার প্রিয় লেখক। পাণ্ডুলিপিটা নোংরা হয়ে গেছে তারপর থেকে।

ছেলেটা তাকিয়ে আছে প্রিয় লেখকের বাড়িটার দিকে। ছেলেটার চোখজোড়াতে ছড়িয়ে পড়েছে রহস্যময় ছায়া। ওখানে খেলা করছে ছোট ছোট দু'টি ঘূর্ণিঝড়। অশ্রু টলটল করছে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল একফোঁটা অশ্রু।

এমন সময় সে দেখল তার প্রিয় লেখক বারান্দা দিয়ে লাফ দিয়েছে শূন্যে।

উঠে দাঁড়াল সে। হাত দিয়ে চোখের পানি মুছল। মুখে ফুটল সামান্য হাসি।

বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

বাড়ির লোকজন তার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। কারণ সে দুদিন হলো বাড়িতে যায়নি।

এই দু'দিন সে গাছটার নীচে বসে ছিল।

আর তাকিয়ে ছিল তার প্রিয় লেখকের বাড়িটার দিকে।

সরোয়ার হোসেন

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

পোখরাজ

পাইনে ভরা হিমালয়ের ঢালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'দ্য ব্লু দানিয়ুব' শোনাটা কেমন যেন অদ্ভুত। তবু এই পরিবেশে ওয়ালজের সুরই যেন যথাযথ। পাইনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে বাতাস তার অস্ফুট ধ্বনি তুলে, আর শাখাগুলো দুলছে যেন সুরের তালে তালে। আমার রেকর্ড-প্লেয়ারটা নতুন, কিন্তু রেকর্ডগুলো পুরনো, বেশির ভাগই কেনা হয়েছে জাঙ্ক-শপ থেকে।

পাইনগুলোর নিচ থেকেই শুরু হয়েছে ওকগাছের সারি, বিশেষ করে একটা ওক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই ওকটাই সবচেয়ে বড়, দাঁড়িয়ে আছে কটেজের নিচেই ছোট্ট একটা টিলার ওপর মৃদু বাতাসের ক্ষমতা নেই ওকের ভারী ডাল নাড়ানোর, তবু কিছু একটা নড়ছে, কি যেন একটা গাছ থেকে দুলছে ধীরে ধীরে, তাল মেলাচ্ছে ওয়াল্‌জের সুরে সুরে, নাচছে...

গাছ থেকে ঝুলছে একটা দেহ।

একটা রশি দুলছে বাতাসে, ধীরে ধীরে দেহটা ঘুরছে একপাশ থেকে আরেক পাশে, আমি দেখতে পেলাম একটি মেয়ের মুখ, আলগা হয়ে ঝুলছে একরাশ চুল, চোখে কোনও দৃষ্টি নেই, হাত আর পা সম্পূর্ণ অসহায়; ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে, এদিকে বেজে চলেছে ওয়াল্‌জ্।

প্লেয়ার বন্ধ করে আমি দৌড় দিলাম নিচতলায়।

তারপর গাছের ফাঁক দিয়ে সোজা সেই ঘেসো টিলায়, যেখানে মাথা উঁচিয়ে আছে বিশাল সেই ওক।

ভয় পেয়ে ডাল থেকে উড়ে উঠল লেজ-ঝোলা একটা পাখি, সাঁ

করে চলে গেল নিচের গিরিখাত পেরিয়ে। গাছে কেউ নেই, শূন্য। বড় একটা ডাল টিলার আধাআধি পর্যন্ত বিস্তৃত, আমি ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারি ডালটা, কিন্তু কোন মেয়ে গাছে না উঠলে ডালটাকে ছুঁতে পারবে না।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালগুলো দেখছি, এমন সময় কে যেন কথা বলে উঠল পেছন থেকে।

'কি দেখছ?'

পাঁই করে পেছন ফিরলাম। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সতেরো কি আঠারো বছর বয়স; জলজ্যান্ত, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, মুখে পাগল-করা হাসি কী যে চমৎকার মেয়েটি! জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে দেখিনি।

'এমন হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হয়েছ,' বললাম আমি, 'তুমি তো আমাকে চমকিয়ে তুলেছ একেবারে।'

'তুমি কি কিছু দেখেছ—গাছটায়?' জানতে চাইল সে।

'মনে হলো জানালা দিয়ে দেখলাম কাউকে। তাই তো নেমে এসেছি নিচে। তুমি কিছু দেখেছ?'

'না।' মাথা ঝাঁকাল সে, মুহূর্তের জন্যে হাসি মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে। 'কিছু দেখিনি আমি। তবে অন্য মানুষেরা দেখে—কখন কখন।'

'কি দেখে তারা?'

'আমার বোনকে।'

'তোমার বোন?'

'হ্যাঁ। সে এই গাছে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অনেক বছর হয়ে গেল। তবে আজও তাকে সাঁঝেসাঝে এখানে ঝুলতে দেখে অনেকে।'

ভাবলেশহীন স্বরে বলছিল সে, যেন ঘটনাটা তার কাছে খুব দূরের কোন ব্যাপার।

কথা বলতে বলতে গাছটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছিলাম আমরা। টিলার মাথায় অব্যবহারে মলিন একটা

টেনিসকোর্ট এখনও পাহাড়ী এই স্টেশনটার ঔপনিবেশিক অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ধরে আছে। টেনিস-কোর্টের পাশে পাথরের ছোট্ট একটা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চটার ওপর বসল সে, সামান্য ইতস্তত করে আমি বসে পড়লাম তার পাশে।

'কাছেই থাকো তুমি?' জানতে চাইলাম আমি।

'পাহাড়ের ওপরে। বাবার ছোট্ট একটা বেকারি আছে।'

সে আমাকে বলল তার নাম–হামিদা। তার ছোট ছোট দুটো ভাই আছে।

'তোমার বোন মারা যাবার সময় তুমি নিশ্চয় বেশ ছোট ছিলে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার কথা আমার মনে আছে। খুব সুন্দরী ছিল সে।'

'তোমার মত।'

হাসল সে অবিশ্বাসের হাসি। 'কী যে বলো, তার কাছে আমি কিছুই নই। আমার বোনকে দেখলে বুঝতে পারতে।'

'সে আত্মহত্যা করেছিল কেন?'

'বাঁচতে চায়নি বলে। ভাবছ, এটাই একমাত্র কারণ? না। বিয়ের কথা হয়েছিল তার, কিন্তু সে ভালবাসত অন্য একজনকে, যার জাত ছিল ভিন্ন। সেই পুরনো গল্প, যেগুলো সবসময় বিয়োগান্তক, তাই না?'

'সবসময় নয়। কিন্তু সেই ছেলেটার কী হলো–যাকে সে ভালবাসত? সে-ও কি আত্মহত্যা করেছিল?'

'না, চাকুরি নিয়ে সে চলে গিয়েছিল অন্য জায়গায়। চাকুরি পাওয়া সহজ নয়, কি বলো?'

'জানি না। কখনও চাকুরির চেষ্টা করিনি আমি।'

'তাহলে তুমি কি করো?'

'গল্প লিখি।'

'লোকে গল্প কেনে?'

'কিনবে না কেন? তোমার বাবা যদি রুটি বেচতে পারে, তাহলে গল্পও বেচতে পারব আমি।'

'রুটি ছাড়া মানুষ বাঁচবে না। কিন্তু গল্প ছাড়া বাঁচবে।'

'না, হামিদা, তোমার এই ধারণা ভুল। গল্প ছাড়াও মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।'

হামিদা! ওকে ভালবেসে ফেললাম। শুধুই ভালবাসা। ওকে কাছে পাবার তীব্র কোন আকাঙ্ক্ষা জাগল না আমার মনে। ওর দিকে স্রেফ তাকিয়ে থেকেও সুখে ভেতরটা ভরে গেল আমার। বুনো জামের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে আমার কটেজের বাইরে ঘাসের ওপর বসে রইল ও, আর আমি কেবল তাকিয়ে রইলাম। গল্প করল ও নানারকম—ওর বন্ধুবান্ধব, কাপড়-চোপড়, প্রিয় জিনিসপত্র সম্বন্ধে।

'এভাবে প্রত্যেকদিন তুমি এখানে এলে তোমার বাবা-মা কিছু মনে করবে না?' জানতে চাইলাম আমি।

'আমি তাদের বলেছি যে তুমি আমাকে পড়াচ্ছ।'

'কি পড়াচ্ছি তোমাকে?'

'তারা কোন প্রশ্ন করে না। তুমি তো গল্প বলতে পারো আমাকে।'

সুতরাং আমি ওকে গল্প বলতে লাগলাম।

সময়টা ছিল গরমের মাঝামাঝি।

সূর্যের আলো ঝিকমিক করতে লাগল ওর অনামিকায় পরা আংটির ওপর, রূপোয় বসানো একটা সোনালি পোখরাজ।

'আংটিটা খুব সুন্দর,' বললাম আমি।

'তাহলে তুমি এটা পরো,' আঙুল থেকে আংটিটা খুলে ফেলল ও। 'এটা পরলে ভাল ভাল চিন্তা আসবে তোমার মাথায়। তখন আরও ভাল ভাল গল্প লিখতে পারবে তুমি।'

আমার কড়ে আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিল ও।

'আংটিটা কিন্তু আমি মাত্র কয়েক দিন পরব,' বললাম আমি। 'তারপর অবশ্যই ফেরত নিতে হবে তোমাকে।'

একদিন আকাশ থমথম করছে মেঘে, যে-কোন সময় ঝমঝমিয়ে শুরু হবে বৃষ্টি, আমি নেমে গেলাম পাহাড়ের নিচের স্রোতস্বিনীটার কাছে। সেখানে শৈলশিরার পাশে ঘুরে ঘুরে ফার্ন তুলে বেড়াচ্ছে

হামিদা।

'ওগুলো কি করবে?' জানতে চাইলাম আমি।

'এগুলো বিশেষ জাতের ফার্ন। রেঁধে খাওয়া যায়।'

'খেতে সুস্বাদু?'

'না, কিন্তু বাতের পক্ষে উপকারী।'

'তুমি বাতে ভুগছ?'

'না, না। এগুলো আমার দাদীর জন্যে। অনেক বয়স তার।'

'উজানে আরও বেশি ফার্ন আছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু সেগুলো তুলতে হলে পানিতে নামতে হবে।'

জুতো খুলে পানিতে নেমে আমরা যেতে লাগলাম উজানে। যতই এগোলাম, গিরিখাতটা ক্রমেই সরু আর ছায়াসম্পন্ন হয়ে এল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পানির একদম কিনারায় নেমে এসেছে ফার্ন। সেগুলো তোলার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম আমরা, কিন্তু কখন যেন জড়িয়ে ধরলাম দু'জন দু'জনকে, তারপর স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মত ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লাম ফার্নের নরম বিছানায়, মাথার ওপরে মধুর সুরে গান ধরল এক পাখি।

'সময় তো হারায় না,' গানে গানে যেন বলে চলল পাখিটা। 'হারিয়ে যাই কেবল আমি আর তুমি, তুমি আর আমি...'

পরদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করলাম আমি, কিন্তু ও এল না।

কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন, ওর কোনও পাত্তা নেই।

ওর কি অসুখ করেছে? বাড়িতে আটকে রেখেছে ওর বাবা-মা? নাকি ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে অন্য কোথাও? ওর বাড়ি কোথায় তা-ও জানি না আমি, ফলে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আর পারতামও যদি, কী জিজ্ঞেস করার ছিল আমার?

তারপর একদিন একটা ছেলেকে রুটি আর পেস্ট্রি বেচতে দেখলাম রাস্তা থেকে মাইলখানেক দূরের এক চায়ের দোকানে। তার চোখ হামিদার চোখের সঙ্গে অনেকটা যেন মেলে। সে দোকান থেকে বেরতে তাকে অনুসরণ করে উঠতে লাগলাম পাহাড়ে। কাছাকাছি

হতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের নিজের বেকারি আছে?'

খুশিতে মাথা দোলাল সে, 'হ্যাঁ। কি লাগবে আপনার–রুটি, বিস্কুট, কেক? যা চান আমি নিয়ে যাব আপনার বাসায়।'

'অবশ্যই নিয়ে আসবে। কিন্তু তোমার একটা বোন আছে না? হামিদা নাম?'

খুশি খুশি ভাব উধাও হয়ে গেল ছেলেটার মুখ থেকে। এখন সে আর বন্ধুভাবাপন্ন নয়। হতভম্ব হয়ে গেছে সে, কিছুটা সন্দেহও ভর করেছে চেহারায়।

'এ-কথা জানতে চাইছেন কেন?'

'বেশ ক'দিন হলো ওকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমরাও দেখতে পাচ্ছি না তাকে।'

'তার মানে, ও কি চলে গেছে এখান থেকে?'

'আপনি জানেন না? অনেক দিন নিশ্চয় বাইরে ছিলেন। সে মারা গেছে অনেক বছর হলো। আত্মহত্যা করেছিল। আপনি কি এসবের কিছুই জানেন না?'

'সেটা কি ওর বোন নয়–মানে, তোমার আরেক বোন?'

'একটাই মাত্র বোন ছিল আমার– হামিদা–মারা গেছে সে, আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। এটা অনেক পুরনো একটা গল্প, কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।'

ঘুরে দ্রুত পায়ে চলে গেল ছেলেটা, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি রাস্তার মাঝখানে, মাথায় ঘুরতে লাগল অজস্র প্রশ্ন, যেগুলোর কোনওটারই কোনও জবাব নেই।

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হলো সেই রাতে। বাতাসে আমার শোবার ঘরের জানালা দড়াম দড়াম করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। জানালা বন্ধ করার জন্যে ওটার পাশে যেতেই বিদ্যুতের ঝলকানিতে আবার দেখতে পেলাম ওকগাছের ডাল থেকে ঝোলা সেই দেহ; দুলছে, ঘুরছে, ঘুরছে, দুলছে।

চেহারাটা দেখার খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথাটা একেবারে ঝুঁকে আছে, চুল উড়ছে বাতাসে

এতক্ষণ যা বললাম, তার পুরোটাই কি স্বপ্ন?

স্বপ্ন কিনা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এই অন্ধকারেও ঝিকমিক করছে আমার হাতের আঙটির পোখরাজ। আর ওই বনের ভেতর থেকে ফিসফিস করে কে যেন বলছে, 'সময় তো হারায় না, হারিয়ে যাই কেবল আমি আর তুমি...'

মূলঃ রাসকিন বণ্ড

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

প্রেম প্রেতাত্মা

এক

আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরছে রনক।

হাওলাদার বাড়ি হতে প্রাইভেট পড়িয়ে মণ্ডল বাড়ি ফিরছে। আজ হতে বছর দুই আগে জায়গির মাস্টার হিসেবে মণ্ডল বাড়িতে এসেছে সে। নিজের পরিবারের অবস্থা তেমন ভাল নয় তাই অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশুনা করতে হয়। এই শিমুলতলী গ্রামের বশির মণ্ডল খুবই আল্লা অ'লা লোক। গ্রামের সবাই তাঁকে খুব মান্য করে। মণ্ডল গিন্নিও অসাধারণ একজন মহিলা। রনককে খুবই পছন্দ করেন, নিজের ছেলের মত ভালবাসেন।

মণ্ডল সাহেব দেখলেন ছেলেটি গরীব বলে তিনি শুধু তাকে তিনবেলা খাওয়ান, তাই তিনি নিজেই রনককে ডেকে বললেন, 'হুনেন মাস্টর সাব, আগামী মাসের পহেলা থেইক্কা আফনে বিকালবেলায় হাওলাদারের পোলাডারে পড়াইবেন। হেরা মাসে আফনেরে চাই'শ টেহা দিব। হুদা বিয়ান আর রাইতে আমার মানিক হিরারে পরাইবেন।'

বশির মণ্ডলের দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে মুক্তা বেঁচে নেই, পাঁচ ছয় বছর আগে মারা গেছে। একমাত্র ছেলে মানিক মেঝো। সে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ছোট মেয়ে হিরা ক্লাস ফাইভে পড়ে। বাড়ির অবস্থা খারাপ নয়, বছরে যা ফসল ওঠে তা সারা বছর খেয়েও মণ্ডল সাহেব বিক্রি করেন। সংসারে কোন অভাব নেই।

শিমুলতলী গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় মণ্ডল বাড়ি। বশির মণ্ডলের

দাদা নিরিবিলি দেখে এখানেই বাড়ি করেন। তাদের বাড়ির পূর্ব দিকে ছোট একটুকরো ফসলী জমির পরই একটি শ্মশান। শ্মশানের সাথে লাগানো বন জঙ্গলে ঘেরা একটি বহু পুরাতন হিন্দু 'ঠাকুর বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। রাতের বেলাতে তো দূরে থাক, দিনের বেলাও কেউ ভয়ে ওই পথ মাড়ায় না।

যতদূর জানা যায় '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই হিন্দু পরিবারটি ভারতে চলে যায়। আর কখনও ফিরে আসেনি। সেই হতে আজ এত বছর ওই বাড়িতে কেউ থাকে না, ওভাবেই পড়ে আছে।

পড়াচ্ছে রনক। এভাবে দেখতে দেখতে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। হঠাৎ একদিন মণ্ডল সাহেবের নামে ঢাকা হতে একটি টেলিগ্রাম এল। তাঁর বড় শালা খুবই অসুস্থ, অবস্থা তেমন ভাল নয়। তাঁরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা চলে আসেন।

এই সংবাদ পেয়ে মণ্ডল পত্নী বার বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে বশির মণ্ডল রনককে একা বাড়িতে রেখে স্বপরিবারে ঢাকা রওনা হলেন। যাবার সময় তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বল্লেন, মাস্টর সাব, হাসিনার মা দুই বেলা আইসা আফনের রান্না বান্না কইরা দিব। সদাইপাতি সব বাড়িতেই আছে, শুধু আফনে কষ্ট কইরা কাছা বাজারটা করবেন। আমি দুই তিন দিনের মইধ্যে চইলা আমু। আফনের চাচী ভাইটার জন্য বেশি ভাইঙ্গা পরছে, হাজার হোক মার পেটের আপন ছোট ভাইতো। তাই বাইধ্য হইয়া তাগরে লইয়া যাইতাছি। আমি আয়োনের সময় তাগরে লইয়া আমু। আর রাইতে শোয়নের সময় গোয়াল ঘরটার দিকে নজর রাইখেন। আবুল মিয়ারে বলবেন যাতে সময় মত গরুগুলানেরে খড়পানি দেয়।'

রনক সকল কিছু বুঝে নিয়ে মণ্ডল পরিবারকে ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

হাঁটছে। ইতিমধ্যে মাগরিবের আযানের সময় হয়ে
সেই নামাজ আদায় করতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে সে
দিন হয়ে গেল অথচ মণ্ডল চাচার কোন দেখা নেই।
হন দুই তিন দিনের বেশি থাকবেন না। ভাবতে
য় সে বাড়ি পৌছে গেল। বাড়ি ঢুকতেই আবুল মিয়ার
গরু নিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকছে। তাকে দেখে রনক
ল, কাজ কর্ম ঠিক মত হচ্ছো তো?
খাওয়া লাল দাঁত বের করে একটা হাঁসি দিয়ে বলল,
অইতাছে। তয় সাব, এই বাছুরটা বড়ই বজ্জাত।'
' রনক বলল।
হয় আমারে দুই মাইল দোড়াইছে। আমিও
ইরা ইচ্ছা মতন ধোলাই দিছি। বজ্জাত গরু আমার
করো।'
থাগুলো বলল আবুল মিয়া। তারপর গরু ও বাছুর
র বেঁধে খড় পানি দিয়ে দরজায় তালা মেরে এসে সে
াজ শেষ করে জায়নামাজ ভাঁজ করছে, আবুল মিয়া
াব, হাসিনার মায়ে রাইন্দা থুইয়া গেছে, হেয় কইছে
য়া লইতে।...তাইলে আমি এহন যাই। বেয়ানে
গরুর খাওন দিয়া মাডে যাইতো অইবো।
ম।'
য়ার পর বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। রনক
তির আলোতে পড়ছে। আগামীকাল কলেজে পড়া
সে মন দিয়ে পড়ছে। পড়া শেষ করে যখন ঘড়ির
খন রাত দশটা। সে নিজের ঘর হতে বের হয়ে

উঠানে এসে থমকে দাঁড়াল। আহ্ কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে! একেবারে থালার মত গোল। আজ মনে হয় পূর্ণিমা, না হলে এমন চাঁদ আর জোছনা? তার একটা কবিতা মনে পড়ে গেল। 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, এ মরণ হবে স্বর্গ সমান'। বির বির করতে করতে একহাতে বাতি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল রনক রাতের খাবার খেতে। খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে তালা দিয়ে এসে যেইনা নিজের রুমে ঢুকছে, অমনি তার নিঃশ্বাসের বাতাসে কুপি নিভে গেল। মেজাজটা বিগড়ে গেল তার। সারা ঘর হাতিয়ে টেবিল হতে ম্যাচ নিয়ে বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'এমন সুন্দর গ্রাম, স্কুল, কলেজ সহ কোন কিছুর অভাব নেই, অথচ বিদ্যুৎ নেই! দিনে দিনে দেশটার কি হাল হচ্ছে?'

রাত এগারোটার দিকে রনক বাতি নিভিয়ে মশারী টাঙিয়ে শুয়ে পড়ল, বালিশের সাথে মাথা লাগার সাথে সাথে দু'চোখে ঘুম নেমে এলো।

গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চার দিকে চুপচাপ। শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক। দূরে কোথাও শিয়াল ডাক্ছে। এর মধ্যে কার যেন একটি গুনগুন গানের আওয়াজ এগিয়ে-আসছে। কয়েক সেকেন্ড পর রনক বুঝতে পারল, নারী কণ্ঠ। ধীরে ধীরে গুনগুনানিটা বাড়তে লাগল। রনক ভাবল, এত রাতে এই বাড়িতে কে গান গাইবে? সুরটা যেন তার মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে দরজা খুলল। চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে দেখল একটি আঠারো উনিশ বছরের খুবই সুন্দরী একটি মেয়ে পরনে সাদা শাড়ি-উঠানের মাঝ দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পুব পাশের জমির দিকে যাচ্ছে।

ভয়ে রনকের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিজের অজান্তে সে মেয়েটির পিছু নিল।

ফসলের জমি পেরিয়ে মেয়েটি যখন জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে তখন তার গান থেমে গেল। রনক হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কে যেন তাকে মেয়েটির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যখন সে বনের কাছে এসে পৌঁছল সেই সময় বনের ভেতর হতে মেয়েটির 'বাঁচাও! বাঁচাও'

আর্তনাদ তার কানে এল। সে আগ পিছু কিছু না ভেবে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

চারদিকে কাঁটা গাছের ছড়াছড়ি, শত কাঁটা উপেক্ষা করে রনক দৌড়াতে লাগল মেয়েটিকে উদ্ধার করতে।

কিছুদূর যাওয়ার পর সে দেখল একটি বহু পুরাতন বাড়ি, সেই বাড়ির সামনে বিশাল ঝুরি ছড়ানো একটা গাছ। কোথাও কেউ নেই। আবার সে 'বাঁচাও! বাঁচাও!!' শুনতে পেল।

তার মনে হচ্ছে গাছটির পেছন হতে শব্দ আসছে।

রনক দৌড়ে গাছের নিচে আসতেই সব চুপচাপ হয়ে গেল! কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। এমন কি ঝিঁঝি পোকার ডাকও সে শুনতে পাচ্ছে না। চার দিকে শুনশান পিনপতন নীরবতা। দিনের মত চাঁদের আলো। জোছনা যেন গলে গলে পড়ছে। সে দেখল গাছটার নিচে গালিচার মত শুক্‌নো পাতা মাটিকে ঢেকে রেখেছে। এমন সময় সে টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ শব্দ শুনতে পেল।

চারদিকে তাকাল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না কিন্তু শব্দটা হতেই লাগল। কিছুক্ষণ পর রনক আবিষ্কার করল তার পায়ের সামনে শুকনো পাতার উপর কি যেন পড়ছে। উপরে তাকাতেই তার শরীর ভয়ে নিথর হয়ে গেল। একটি ঠাণ্ডা স্রোত যেন তার শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল গাছের ডালে কাকে যেন ফাঁসি দেয়া হয়েছে। কিন্তু লোকটির গায়ে কোন মাংস নেই! একটি কংকাল! তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার মাথাটা সম্পূর্ণ জীবিত মানুষের মত। চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আর সেই চোখ হতে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরে পড়ছে শুকনো পাতার উপর। রনকের সমস্ত শরীর ভয়ে কুঁকড়ে যেতে চাইল। এমন সময় সে বাঁধ ভাঙা অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেল। মনে হচ্ছে হাসির আওয়াজ খুব তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে আসছে। রনক সংবিৎ ফিরে পেল। দৌড়াতে শুরু করল। সে প্রাণপণ দৌড়াতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। কখন যে সে বাড়ির উঠানে এসে গেছে জানে না।

দৌড়ে ঘরে ঢোকার সময় দরজার সাথে ধাক্কা খেয়ে রনক মাটিতে পড়ে গেল।

তিন

রনকের মুখের উপর অনেকগুলো মাথা। তার মাথায় ব্যান্ডেজ। পাশে ডাক্তার বসে আছেন। বশির মণ্ডল তার মাথায় হাত রেখে জানতে চাইলেন, 'এহন কেমুন আছেন মাস্টর সাব?'

রনক চিন্তা করল তার কি হয়েছে? সে এখানে কেন? আস্তে আস্তে তার সকল কিছু মনে পড়ল।

ডাক্তার অভয়বাণী শুনিয়ে চলে গেলেন। মণ্ডল পত্নী খাবার হাতে এসে বললেন, 'উঠেন, বাবা, আমরাতো ভয় পাইয়া গেছিলাম। আফনার কি অইচিলো?'

এমন সময় মণ্ডল তাঁর পত্নীকে বললেন, 'তুমি চুপ করো তো! পাক্কা একদিন একরাইত বেহুঁস থাকার পর পোলাটার হুঁস অইলো, আর তুমি এই সব জিগাইতাছ। পরে জানন্ যাইব। আগে হেয় খাইয়া সুস্থ হোক, তারপর।'

তার ৩ দিন পর হাসপাতাল থেকে রনককে বাড়ি আনা হলো। এখন সে মোটামুটি [illegible] সে কাউকে কিছু বলল না। পরদিন বশির মণ্ডল সকালে বারান্দায় বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। এমন সময় মাস্টারকে ঘর হতে বের হতে দেখে কাছে ডেকে এনে একটি মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বহেন, মাস্টর সাব। ওই দিন এমন কি অইছিল যে, আফনের মাথায় আটটা সিলাই দিতে অইছে!'

রনক বলল, 'মনে হয় দরজার সাথে বাড়ি খেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে হাসপাতালে নিল কে?'

'আমরা ঢাকা [illegible] দিন পর বাড়ি ফিরা আইসা দেখলাম আফনে হাসপাতালে। আবু [illegible] সন্ধ্যায় গরু নিতে আইসা দেখে

আপনে দরজার সামনে পইরা আছেন। চাইরদিকে রক্তে লাপ অইয়া রইছে। তহন সে হাওলাদার মিয়ারে খবর দিয়া আফনেরে থানা হাসপাতালে নিছে।

'একটা কথা কি, মাস্টর সাব, দরজায় আঘাত পাইয়া আফনের মাথা ফাটছে ঠিক, কিন্তু আফনের সারা শরীলে এত আঁচরের দাগ আইলো কইথন? সত্য কইরা কন্‌তো সেই রাইতে কি অইছিলো?'

রনক আর চুপ করে থাক্‌তে পারল না। ওই রাতে যা যা ঘটেছিল সব ঘটনা বশির মণ্ডলকে খুলে বলল।

সব কিছু শুনে মণ্ডল সাহেবের দু'চোখ গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়ল।

রনক বলল, 'আমি তো কাঁদার মত আপনাকে কিছু বলিনি।'

আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে মণ্ডল সাহেব বললেন, 'আফনে যা যা দেখছেন তা সব সত্য।'

বিস্ময়ে রনকের চোখ কপালে উঠে গেল।

বশির মণ্ডল বলতে শুরু করলেন, 'আইজ থেইক্কা ছয় বছর আগে আমার বড় মাইয়া মুক্তার লগে এই গেরামের কাশেম চকিদারের বড় পোলা কফিলের পেরেম আইছিলো। আমি জানতাম না। একদিন মুক্তা যহন কলেজ থেইক্কা আইতেছিলো তহন কফিল হের লগে ছিল। আমি দূর থেইক্কা দেখতে ছিলাম। কিছুদূর যাইবার পর হেরা হাওলাদার বাড়ির বাঁশ ঝারের ভিতর ঢুইক্কা গেল। আমি পিছে পিছে গিয়া দেহি মুক্তার কোলে মাথা রাইখা কফিল্লা শুইয়া শুইয়া কথা কইতাছে। রাগে আমার গা জ্বইল্লা যাইবার আবস্থা। সামান্য চকিদারের পোলার লগে আমার মাইয়া? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। অগরে কিছু কইলাম না। বাড়ি আইসা মুক্তারে ইচ্ছা কইরা একটা মাইর দিলাম। তার দুই দিন পর পাশের গেরামের দুলাল শেখের বিএ পাশ পোলার লগে মুক্তার বিয়ে ঠিক করলাম। বিয়ার বাজার সদাই সব করলাম। তার দুইদিন পর বিয়া...' বলতে বলতে তিনি একটু দম নিলেন। 'সেই দিন রাইত ছিল ভরা পূর্ণিমার রাইত। সেই রাইতেই

মুক্তা কফিল্লার হাত ধইরা পালাইয়া গেল। তার কোন খোঁজ খবর পাইলাম না। চার দিন পর আবুল মিয়া দোরাইতে দোরাইতে আইয়া কইলো ঠাকুর বাড়ির বটগাছে কার জানি লাশ ঝুইল্লা আছে। লোকজন সহ গিয়া দেহি একটা পোলা গলায় দরি দিয়া ঝুইল্লা আছে। কাশেম চকিদার চিক্কুর দিয়া কাইন্দা উইঠা কইলো এইডা তো আমার কফিল। তহন আমার কইলজার নিছে মোছর দিয়া উঠল সবাইরে কইলাম এইডা যদি কফিলের লাশ হয় তাইলে আমার মুক্তা কই ঠিক তহন একজন দোরাইয়া আইসা কইল মণ্ডল চাচা গাছের পিছনে আরেকটা লাশ। আমি বটগাছের পিছনে গিয়া দেহি উলঙ্গ অবস্থায় আমার মাইয়া শুইয়া আছে তার মাথাটা কাটা আর তার পাশে একটা সাদা শাড়ি। সবাই ধারণা করল এই জঙ্গল দিয়া মুক্তা আর কফিল পলাইয়া যাইতে ছিল, কিন্তু পথে হেরা ডাকাইতের হাতে পারে। ডাকাইতরা পোলাটারে মাইরা গাছে ঝুলাইছে আর মাইয়াডারে ঝোপের মইধ্যে নিয়া...এখনও মাঝে মইধ্যে পূর্ণিমার রাইতে এই গেরামের অনেক মাইনসে তাগরে দেখছে, মাইয়াডার চীৎকুর শোনে।' বৃদ্ধ আর বলতে পারল না। চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল। রনকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর পিয়ন এসে রনকের হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা খুলে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। গত মাসে সে যে ইন্টারভিউ দিয়েছিল সেই চাকরিটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ড।

পরদিনই তাকে চাকরিতে জয়েন করতে বলেছে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রনক ঘাটে এসে যখন নৌকাতে উঠল, সন্ধ্যা তখন প্রায় হয় হয় ঘাটে কেউ নেই। নৌকা ছেড়ে দিল। কেন জানি তার শিমুলতলী ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। এমন সময় তার কানে এল সেই গুনগুন করা গানের সুরটি। ঘাটের দিকে চোখ পড়তেই সে দেখল সেই মুক্তা নামের মেয়েটি সাদা শাড়ি পরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবার চোখের পলক পড়তেই রনক দেখল সে নেই। একটি দীর্ঘশ্বাস রনকের বুক চিরে বেরিয়ে এল—হায় প্রেম!

মো. একরামুল হক

প্রেক্ষণ

সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। সন্ধ্যার পর থেকেই উত্তরের আকাশ লাল হয়ে আছে। আবার ঝড়-বৃষ্টি হবে কি না কে জানে। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে। সেজন্যই হয়তো, বৃষ্টি একবার শুরু হলে আর থামার নাম নেয় না। শিমুলতলী গ্রামে গত দুইদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর আজ ভোর রাতে থেমেছে। তবে ভাব দেখে মনে হচ্ছে আবার নামবে। গ্রামের সবাই বলাবলি করছে যে এবারও নাকি বন্যা হবে।

গ্রামের মেঠোপথ ধরে মাওলানা রমিজ উদ্দিন দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছেন। সন্ধ্যার শেষ আলোর রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে একটু আগে। ঠিক এরকম সময়ে নাকি ঘরের বাইরে যেতে নেই। তবে মাওলানা সাহেব কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। তিনি বাজারের রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য কামারপট্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটা দিয়েছেন। এই রাস্তা ধরে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। তা না হলে পুরো গ্রাম ঘুরে বাজারে যেতে হবে। আসলে মাওলানা রমিজ উদ্দিনের বাড়িটা গ্রামের উত্তর দিকের শেষ মাথায়, মসজিদের কাছে। তিনি ওই স্থানীয় মসজিদটির ইমাম। আর গ্রামের একমাত্র বাজারটি হলো গ্রামের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। অর্থাৎ মসজিদের পুরো উল্টোদিকে। সাধারণত বেশিরভাগ গ্রামে বাজারের কাছাকাছি জায়গাতেই মসজিদ স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই গ্রামে ব্যতিক্রম। এখন সমস্যা হয়েছে, রমিজ উদ্দিনকে বাজারে যেতে হলে পুরো গ্রাম ঘুরেই যেতে হয়। একমাত্র সংক্ষেপ রাস্তা বলতে এই কামারপট্টির রাস্তাটি। কিন্তু রাস্তাটি বড়সড় কোনও রাস্তা

নয়। একটি সরু মাটির রাস্তা। আর তা ছাড়া, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হলে গ্রামের পূর্ব দিকের বিশাল জঙ্গল আর তার পাশের প্রাচীন কবরস্থানটির ধার ঘেঁষে যেতে হয়। এইজন্য পারতপক্ষে গ্রামের লোকজন রাতের বেলায় এই রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। কবরস্থানের ঠিক পাশেই অনেক পুরাতন একটা জারুল গাছ। সবাই বলে গাছটার নাকি দোষ আছে। গ্রামের অনেকেই নাকি অনেক কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। এমনকী গ্রামের কোনও লোক ভয়ে ওর পাশের আমগাছের আম পর্যন্ত খায় না। সেসব নীচে পড়ে যেয়ে নষ্ট হয় অথবা বাদুর খায়। মাওলানা অবশ্য এসব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আজ তাঁর মনে হচ্ছে যে এই রাস্তা দিয়ে না এলেই বোধহয় ভাল হত। সেটা অবশ্য ভূতের ভয়ে নয়। প্রথম কারণ হলো, রাস্তাটার অনেক জায়গাই প্যাচপ্যাচে কাদায় ভর্তি হয়ে আছে। সেসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শিমুলতলী গ্রামের ভেতর দিকে এখনও ইলেকট্রিসিটি আসেনি। কেবল বাজার পর্যন্ত এসেছে। গ্রামের চেয়ারম্যান জমির উদ্দিন সরকারের বাড়ি বাজারের খুব কাছে হওয়ায় কেবলমাত্র তাঁর বাড়ি আর বাজারের গুটিকয়েক দোকানেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। এ ছাড়া পুরো গ্রামটাই অন্ধকার। গ্রামের মানুষ তাতেই খুশি। চেয়ারম্যান সাহেব কথা দিয়েছেন, কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের রাস্তার পাশ দিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি বসবে। তখন সবার ঘরেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলবে। গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা সেই আশাতেই আছে।

রমিজ উদ্দিনের হাতে একটি ছোট্ট হারিকেন। সেটা একধরনের ঘোলাটে হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। তাতে অন্ধকার দূর না হয়ে মনে হচ্ছে আরও জমাট বেঁধে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আগুনের শিখাটা দপ্ দপ্ করে লাফিয়ে উঠছে। তেল আছে কি না কে জানে।

কয়েকমাস আগে সরকার সাহেব মাওলানা রমিজ উদ্দিনকে দুই ব্যাটারির একটা টর্চলাইট উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটার ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ায় আপাতত সেটা যত্ন করে ট্রাংকের মধ্যে তুলে রাখা আছে। প্রতিমাসেই ইচ্ছে হয় ব্যাটারি কেনার, কিন্তু প্রয়োজনীয়

টাকার জোগাড় হয়ে ওঠে না। তাই কিনি কিনি করেও আর কেনা হয় না। আজকে রাতে হারিকেন হাতে সরকার বাড়িতে যেতে তাঁর একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছে।

রমিজ উদ্দিন হনহন করে পা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি প্রথমে যাবেন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে। মাওলানা সাহেবের আর্থিক অবস্থা ইদানীং খুব খারাপ যাচ্ছে। ইমামতি করে যে আয় হয়, তা নিতান্তই যৎসামান্য। একটা ধানী জমি থাকায় রক্ষা। না হলে এতদিনে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে নামতে হত।

গত সপ্তাহে চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের আকিকা ছিল। সেই উপলক্ষে সরকার বাড়িতে লোক খাওয়ানো, মিলাদ পড়ানো ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। সেই আকিকার অনুষ্ঠান এবং মিলাদ পড়ানো বাবদ দুইশত টাকা মাওলানা সাহেবের পাওনা রয়েছে। আজ সেই টাকাটা পাওয়া গেলে তাঁর বড় উপকার হয়। কিছু বাজার-সদাই করতে হবে। বাড়িতে চাল আর মুগের ডাল ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকী মশলাপাতিও নেই। যে করেই হোক আজ কিছু টাকার জোগাড় করতেই হবে।

মাওলানা সাহেব নিজের মনে চিন্তা করতে করতে যাচ্ছেন, মাগরিবের নামাজের পর সরকার সাহেব সাধারণত বাড়িতেই থাকেন। আজও নিশ্চয় আছেন। এই ভরসাতেই তিনি যাচ্ছেন। তিনি টাকার চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে গেলেন যে, কখন জঙ্গলের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন তাঁর খেয়ালই থাকল না। হঠাৎ সামনে একজোড়া শেয়ালের দৌড়ে পালানো দেখে তাঁর হুঁশ ফিরল। তিনি সাবধানে পথ চলতে লাগলেন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর শব্দ বলতে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। ওই আওয়াজটুকু বাদ দিলে একরকম নিস্তব্ধই বলা চলে জায়গাটাকে। মাওলানা সাহেব হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। আচমকা জঙ্গলের ভেতর দিক থেকে একঝলক হিমশীতল বাতাস এমনভাবে তাঁর গায়ে লাগল যে, তাঁর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। এটা ভয়ে না ঠাণ্ডায়, তিনি বুঝতে পারলেন না। শুধু বুঝতে

পারলেন, এই বাতাস ঠিক স্বাভাবিক নয়। শ্রাবণ মাসের ভ্যাপসা গরম পড়েছে। এই সময় এরকম ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগার কোনও কারণ নেই। হঠাৎ করেই ওই বাতাসের মতই এক অপার্থিব ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি জীবনে কখনও ভূত-প্রেতের ভয় পাননি। কিন্তু আজ হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই অজানা এক আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল। অজানা ভয়ে তাঁর সারা শরীর শিউরে উঠল। তিনি মনে মনে আয়তুল কুরসি পড়ার চেষ্টা করলেন। তাঁর কাছে মনে হলো, খুব কাছেই অশরীরী কোনও কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করছেন। এই অশরীরী প্রাণীর জন্ম আমাদের চেনাজানা এই পৃথিবীতে নয়। অন্য কোথাও, কোনও অন্ধকার জগতে।

মাওলানা সাহেব একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে হারিকেনের আলোটা আরও বাড়িয়ে দিলেন, তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোও হঠাৎ চুপ করে গেছে। মনে হলো, সমস্ত প্রকৃতি যেন দম বন্ধ করে আছে বিশেষ কোনও একটা ঘটনা ঘটার অপেক্ষায়। দূরে কোথাও কয়েকটা শেয়াল একসাথে ডেকে উঠল। ঠিক এরকম সময়ে শব্দটা তাঁর কানে গেল। মনে হলো, শুকনো পাতার ওপরে উঁচু কোনও জায়গা থেকে পানি ঝরে পড়ছে। তাঁর মেরুদণ্ডের ঠিক মাঝখানে ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। শব্দটা ঠিক তাঁর ডান দিক থেকে আসছে। তাঁর মনে হলো, ডান দিকে তাকালেই তিনি ভয়ঙ্কর কোনও দৃশ্য দেখতে পাবেন। এমন কোনও দৃশ্য, যেটা ব্যাখ্যার অতীত। যেটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যা-ই ঘটুক না কেন, তিনি ডানদিকে তাকাবেন না। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই কৌতূহলের কাছে হার মানলেন। মনে করলেন, দেখাই যাক না কীসের শব্দ। সাধারণ কিছুও তো হতে পারে। ভয় পাওয়ার কী আছে। নিজেই নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। শব্দটা এখন তাঁর খুব কাছেই হচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে ডানদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর হারিকেনটা তুলে ধরলেন মাথার কাছে।

প্রথমে হারিকেনের ঘোলাটে আলোয় সেই আমগাছটা ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে জারুল গাছটাও নজরে পড়ল। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতে আস্তে আস্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে এল। এবার তিনি একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন, জারুল গাছের সবচেয়ে নিচু আর মোটা ডালটায় পিঁড়িতে বসার মত ভঙ্গিতে এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা বসে আছে। তবে মহিলার গায়ে কোনও কাপড় নেই। মহিলাটি ডালের ওপরে বসে থেকে প্রস্রাব করছে। সেই প্রস্রাব গাছের নীচের পাতার ওপরে পড়ে ছড়্-ছড়্ শব্দ হচ্ছে। মহিলাটি মাওলানা রমিজ উদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর হাসতে হাসতেই ডান হাতে ধরা কোনওকিছু সামনে নিয়ে এল। রমিজ উদ্দিন প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে দেখলেন, সেটি আসলে একটি মানুষের কাটা মাথা। মাথাটি পুরুষ মানুষের এবং কাটা জায়গা থেকে তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। মহিলা কাটা মাথাটি হাসতে হাসতে তার নীচে ধরল আর তার প্রস্রাব মাথাটার কাটা জায়গায় পড়ে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগল। মহিলাটি মাওলানা সাহেবের দিকে তাকিয়ে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। যেন এটা বিরাট কোনও রসিকতা। মাওলানা সাহেব সেই অপার্থিব হাসির আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। কাটা মাথাটার চেহারার দিকে ভাল করে লক্ষ করে দেখেন, সেটা আসলে জমির উদ্দিন সরকারের মাথা। যার কাছে তিনি যাচ্ছিলেন। নিদারুণ আতঙ্কে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করল। মনে হলো বুকের ওপর দশমনি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। আর ঠিক সেই সময় একঝলক দমকা বাতাস তাঁর হাতের হারিকেনটা নিভিয়ে দিল। একইসাথে শোনা গেল মহিলার রক্ত জমাট করা খিলখিল হাসি। মাওলানা রমিজ উদ্দিন ভয়ঙ্কর এক চিৎকার দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উল্টোদিকে দৌড় দিলেন। হাতের হারিকেনটা কোথায় পড়ে গেল টেরই পেলেন না, অন্ধের মত অন্ধকার পথ ধরে ছুটতে লাগলেন। বহুবার কাদার মধ্যে আছড়ে পড়লেন। পায়ের স্যান্ডেল কোথায় খুলে চলে গেল। সেসব লক্ষ না করে পড়ে যাওয়ার

পরমুহূর্তেই আবার হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পাগলের মত দৌড়াতে লাগলেন। ভাঙা শামুকের খোলা আর ইঁটের টুকরোয় লেগে দুই-পা কেটে রক্তাক্ত হলো। তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শুধু অন্ধের মত দৌড়ে চললেন। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় দূরে নিজের বাড়ির আলো দেখতে পেলেন। আলো দেখে দ্বিগুণ শক্তিতে দৌড়ানো শুরু করলেন। বাড়ির দরজায় পৌঁছে দড়াম করে আছড়ে পড়ে সাথে সাথেই জ্ঞান হারালেন।

মাওলানা সাহেবের জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। চোখ খুলে দেখতে পেলেন তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষের চিন্তিত এবং কৌতূহলী মুখ। তাঁর নিজের পরিবার ছাড়াও আশপাশের দু-একটা বাড়ি থেকেও লোকজন দেখতে এসেছে। সবাই বুঝতে পেরেছে যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন, সবার চোখে মুখে এখন সেই জিজ্ঞাসারই ছাপ। যদিও তিনি অসুস্থ দেখে সরাসরি কেউ জিজ্ঞাসা করছে না। তাঁর স্ত্রী এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল। এত কিছুর মধ্যেও মাওলানা রমিজ উদ্দিন লক্ষ করলেন, সবাই তাঁকে দেখতে এলেও, তারা নিজেরা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি যাতে শুনতে না পান, এজন্য সবাই ফিসফাস করছে। তবে ব্যাপার যে গুরুতর, এটা সবার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হইছে বউ? কিছু কি ঘটছে?' তাঁর স্ত্রীর জবাব না পেয়ে এবার একটু জোরের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হইল, তুমি কথা কও না ক্যান?'

তাঁর স্ত্রী ইতস্তত করে বললেন, 'আপনে একটু সুস্থ হন। পরে সবই জানতে পারবেন।'

মাওলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার শরীর নিয়া তুমি চিন্তা কইরো না। তুমি যেইটা জানো আমারে বলো।'

এইবার তাঁর ছোট ভাই মুখ খুলল, 'মিয়া ভাই, আমাদের চেয়ারম্যান চাচা গতকাল রাইতে খুন হইছেন।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা রমিজ উদ্দিনের মাথায় একটা চক্কর দিয়ে দিয়ে উঠল।

'ওনার ছোট ছেলে আর বাড়ির কাজের লোক আসছে আপনারে নিতে।' ছোটভাইটা আবার বলে উঠল, 'এই মসজিদেই জানাজা হইব।'

'ওদেরকে ভেতরে নিয়া আসো, আমি কথা বলব,' মাওলানা সাহেব ভাঙা গলায় বলে উঠলেন।

চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট ছেলেটা ঘরে ঢোকার পর থেকেই ক্রমাগত চোখ মুছছে। কাজের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। 'এতবড় একটা ঘটনা ঘটল ক্যামনে?' মাওলানা সাহেব দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'বাবা মাগরিবের নামাজ পইরা চা খাইতে বাজারে গেছিল। বাজারের বটতলার কাছে খুনিরা লুকায় ছিল। ওখানে যাইতেই রাম দা দিয়া চোট দিছে।' ছোট ছেলেটা এটুকু বলতেই গলা আটকে এল। আবার চোখ মুছতে লাগল।

'হুজুররে এমনে চোটাইছে, যে মাথাডা আলাদা হইয়া গেছিল।' কাজের লোকটা কথা বলে উঠল। 'সবাই নিজাম চেয়ারম্যানরে সন্দেহ করতাছে। এইবার ভোটে জেতার লাইগাই কামডা করাইছে...'

মাওলানা সাহেবের কানে আর কিছুই ঢুকছে না। চেয়ারম্যান সাহেবের কাজের লোকটা আরও কী কী যেন বলে যাচ্ছে। কিন্তু মাওলানা সাহেব কিছুই শুনছেন না। তাঁর চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠল। সেইসাথে আবার কালকে রাতের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ভেসে উঠল। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। জ্ঞান হারাবার আগে কোনওমতে উচ্চারণ করলেন, 'ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম...'

তানভীর আহমেদ

ওপার হতে

ছাদে উঠে খারাপ হয়ে থাকা মন ভাল হয়ে গেল। চারদিকের আদুরে সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনের মেঘগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে গেল দূরে। আহা, প্রকৃতির চেয়ে সুন্দর কিছু কি আর আছে! আকাশের নীল যেন আরও গাঢ় এই গভীর দুপুরে। তার বুকে ভেসে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘেরা পায়রার মত। এ বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো সারি সারি সুপারি গাছের পাতারা দোল খায় নীল আকাশের সীমাহীন পটভূমিতে। যেন একটা জীবন্ত ছবি। এরকম মুহূর্তে যাবতীয় জাগতিক দুঃখ ভুলে গিয়ে আকাশের দিকেই চেয়ে থাকি শুধু। সূর্য আমার শরীর ভেদ করে বুকের ভেতরেও উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। আমি সৃষ্টিকর্তার ভাবনায় ডুবে যাই।

একসময় চেয়ে থাকি অল্প দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্ত লক্ষ্মীমেয়ের মত নদীটার দিকে। এই লক্ষ্মীমেয়ে নদীটাই বর্ষায় প্রচণ্ড অলক্ষ্মী হয়ে ওঠে। ভাসিয়ে নেয় গরীব দুঃখীদের ফসলের খেত, ঘর-সংসার। একবার প্রচণ্ড বন্যায় এক কৃষককে দেখেছিলাম, তার ছেলেকে নিয়ে পানির নিচে ডুব দিয়ে দিয়ে ধান তুলে আনছে। জমা করছে পানির উপর ভেসে থাকা নৌকায়–এসব ভাবতে ভাবতে আমার কলেজে যাবার সময় পার হয়ে যায়। আসলে কলেজে যাবার কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। কারণ আমাকে কলেজে পৌঁছিতে হলে রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। এবং একা। আর তারই সুযোগে এপাড়ার কিছু বখাটে ছেলে আমার পিছু নেবে। মন খারাপ করে দেবার মত অনেক কমেন্ট করবে। আমি এসব শুনে শুনে সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। কিছু বলার সাহস নেই, সইতেও পারি না। যদি আমার সঙ্গে যাবার

মত কোন সঙ্গী পেতাম, কোন মেয়ে বন্ধু, তাহলেও হয়তো নিজেকে এতটা অসহায় লাগত না।

কিন্তু কি করব। আমার কোন বন্ধু নেই। ভাই বোন নেই। বাবা সরকারী চাকুরে। ব্যস্ত থাকেন। এতবড় মেয়েকে কে নিয়ে যাবে কলেজে। তাই গ্যাপ দিয়ে দিয়ে ক্লাসে যেতে হয় আমাকে। যেদিন দেখি, বখাটেগুলো রাস্তার মোড়ে নেই, সেদিন তড়িঘড়ি রেডি হয়ে কলেজের পথে পা বাড়াই। মেয়ে হয়ে জন্মে একসময় খুবই গর্ববোধ করলেও পদে পদে বাধার কারণে সেই ধারণার উপর ফাংগাস পড়তে শুরু করেছে আমার।

তাই আমি মনের মেঘ ঝরাতে উঠে আসি আমাদের বাসার এই চমৎকার ছাদে। সময় কাটাই সৃষ্টির অপূর্ব রূপ দেখে।

ছাদ থেকে ঘরে ফিরে আসি। পড়তে হবে, কারণ কাল পরীক্ষা আছে ইতিহাস ক্লাসে। সবেমাত্র পড়তে বসেছি, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে যাই। দরজা খুলে দেখি লম্বা একটা মেয়ে। বোরখা পরা। মিষ্টি হেসে বলল, 'আমি মান্‌তাসা, এশহরে নতুন এসেছি। এখানকার মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তুমিও ওই কলেজেই পড়ো। তাই ভাবলাম, কাল থেকে একসাথেই কলেজে যাই দু'জন।' আমি মান্‌তাসাকে ঘরে এনে বসাই। মনে মনে ভারি খুশি হয়ে উঠি। আমিও তো একজন বন্ধু চাইছিলাম। আমি বলি, 'আমি রূপা। একা কলেজে যেতে আমারও ভাল লাগে না। ভালই হলো।'

মান্‌তাসা বলে, 'আমি থাকি তোমাদের বাসার কাছের ওই নদীর ওপারে। রোজ আমাকে নৌকা পাড়ি দিয়ে এপারে আসতে হবে। তবু ভাল যে, একজন সঙ্গী পাওয়া গেছে।' পরদিন যথাসময়ে এল মান্‌তাসা। আমিও রেডি হয়ে কলেজের পথ ধরি। মান্‌তাসা রিকশা নিতে রাজি হয় না। বলে, 'চলো হেঁটেই যাই। মফস্বলের রাস্তায় হাঁটলেও অ্যাকসিডেন্টের তেমন ভয় নেই। এই চান্সে হাঁটাও হলো, পয়সাও বাঁচল।' স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্লাস অর্থনৈতিক সাশ্রয়। মান্‌তাসার বুদ্ধিটা ভালই লাগল। দু'জনে মিলে গল্প করতে করতে কলেজে

পৌঁছে যাব, টেরও পাব না কখন সময় চলে গেছে। রাস্তায় বের হতেই দেখা মিলল বখাটে ছেলেগুলোর। সবাই পড়াশুনার পাট চুকিয়ে এই পথে এসেছে। কি মজা পায় কে জানে। পৃথিবীতে জীবন একটাই, এই কথা কেন যে বোঝে না।

আমাকে আর মান্‌তাসাকে দেখে দূর থেকেই কিছু বলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে ছেলেগুলো। ওরা আমাকে ইদানীং 'লিলিপুট আপা' ডাকা শুরু করেছে। কোনদিক থেকেই সুবিধা করতে না পেরে এই নতুন সম্বোধন। কারণ আমার সৌন্দর্যের তুলনায় দৈহিক উচ্চতা খানিকটা কমই বলা যায়। অবশ্য আমার সৌন্দর্যকে আমি কখনোই প্রকটভাবে প্রকাশ করিনি, করাটা পছন্দও করি না। আমি খুবই সাদামাঠা এবং নিজেকে যথাসম্ভব ঢেকেঢুকে রাখতেই ভালবাসি। তবু ওরা কেন এমন করে, কে জানে।

আমরা যখন গলির মোড়ে চলে আসি, তখন লীডার ধরনের এক ছেলে চোখ গোল গোল করে গেয়ে ওঠে, 'তোরা দেখ্‌রে চাহিয়া, লিলিপুটের সঙ্গী হইলো গালিভার মিয়া।'

ওদের এই নয়া সঙ্গীত প্রতিভায় আমার খানিকটা হাসি পায়। আড়ে আড়ে মান্‌তাসার দিকে তাকাই। আজকেই প্রথম মান্‌তাসাকে নিয়ে বের হয়েছি, আর আজই এই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করতে বাধ্য হলাম। আর মনে মনে বললাম, 'তোরা মানুষের বাহ্যিক উচ্চতাটাই দেখলি, মনের উচ্চতার তোরা কি বুঝবি রে, পামরের দল।'

তবে মান্‌তাসার চেহারা স্বাভাবিক। ও আমাকে সান্ত্বনার সুরে বলতে থাকে, 'বাদ দাও ওদের কথা। একদিন নিজেরাই বুঝবে, অযথা সময় নষ্ট করার কুফল কি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই এরা হাজতে ঢুকবে।' এর কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, পাড়ার অনেকগুলো বখাটে ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিস। মান্‌তাসার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়ায় বেশ খুশি হয়ে উঠি আমি। এরপর বেশ নির্বিঘ্নেই কিছুদিন কলেজে যাওয়া-আসা করি। সঙ্গে মান্‌তাসা। বেঁচে যাওয়া রিক্‌শাভাড়ার টাকা দিয়ে আমরা ঝালমুড়ি, চানাচুর খাই। অপেক্ষাকৃত নীরব রাস্তা ধরে আমরা চলাচল করি। নিঝুম রাস্তার

ধারে গোছা-গোছা ফুটে থাকা বনফুল তুলে নেই মুঠি ভরে। কোকিলের কুহু কুহু গান শুনি উদাস দুপুরে, আরও কত কি যে গল্প করি! একদিন মান্‌তাসা বলল আমাকে, 'রূপা, তুমি ভীষণ ভাল আর পবিত্র একটা মেয়ে। তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।' আমি হেসে ফেলি। 'কি যে বলো! কেমন করে বুঝলে যে আমি খুব ভাল?' মান্‌তাসা বলে, 'আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে মনের ভেতরটা দেখতে পাই।'

এরকমই একদিন হাঁটতে হাঁটতে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে মান্‌তাসা, 'জানো আমি কখনোই আয়নায় নিজের চেহারা দেখিনি। আমি জানি না, আমার চেহারা কেমন। শুধু অনুভব করতে পারি।'

আমি তো অবাক। 'বলো কি! পানিতেও তো মানুষ নিজের চেহারা দেখে। অন্তত ছায়া তো দেখে।'

মান্‌তাসা বিষণ্ন হাসে। আমিও অন্য প্রসঙ্গ ধরি। আমি মান্‌তাসার দিকে তাকিয়ে বলি, 'এই যে তুমি এত লম্বা, আর আমি খাটো, এর কোন মানে বুঝি না। তোমার উচ্চতা থেকে খানিকটা আমার কাছে চলে এলেই তো আমার চলত। দু'জনেই মানানসই লম্বা হতে পারতাম।' মান্‌তাসা এবার খিলখিল করে হাসে। কেন জানি আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর হাসি শুনে। ও বলে, 'যাহ্, এভাবে বলে নাকি। তুমি খাটো নাকি? তোমার চেয়েও কত খাটো মেয়ে আছে, পুরুষও আছে। তাতে কি। সবই তো আল্লাহর ইচ্ছা। তোমার বর লম্বা হবে, দেখো।'

আর একদিন কলেজ থেকে ফিরছি, আমি বললাম, 'মান্‌তাসা, আজ তোমাদের বাসায় যাব। আমাকে নিয়ে চলো। কোনদিন তো সাধলেও না।'

মান্‌তাসা চমকে ওঠে খানিকটা। 'আজ নয়, অন্য একদিন যেও।' আমি সামান্য আহত বোধ করি। এভাবে মুখের ওপর নিষেধ করতে পারে কেউ! মান্‌তাসা পারল এভাবে বলতে! আমি হলে কখনও পারতাম না। আমার অভিমান আয়তনে বাড়তে থাকে দিনকে দিন। মান্‌তাসা, তুমি কেমন বন্ধু!

সেদিনই বিকেলে বাবা অফিস থেকে ফিরলেন মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে। ঢাকায় পোস্টিং হয়ে গেছে। পরদিন থেকেই আমাদের জিনিসপত্রের গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। এই মফস্বলের কলেজে আর যেতে হবে না। ঢাকায় গিয়ে নামকরা কোন কলেজে ভর্তি হব। খুশিতে ছেয়ে গেল আমার মন।

কিন্তু পরদিন মান্‌তাসা এল না আমাদের বাসায়। ও তো জানে না, যে আমরা ঢাকায় চলে যাচ্ছি। এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওকে না জানিয়ে কেমন করে যাই! ওর বাসাও তো চিনি না। তবু বিকেলে বাসার কাজের মেয়েকে নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন নৌকা নেই পারাপার করার জন্যে। একটু পরে পাশে এসে দাঁড়ায় একজন বুড়ো মানুষ। দাড়িঅলা। পাঞ্জাবী পরা। শান্ত, পবিত্র চেহারা। আমার দিকে চেয়ে বলেন, 'কিছু খুঁজছ, মা?'

আমি বললাম, 'চাচা, নদী পার হব। ওপাড়ে আমার বান্ধবীর বাড়ি।'

বুড়ো ভদ্রলোককে আগেও দেখেছি আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে। শহর থেকে বাজার করে নিয়ে যান ওপাড়ের বাড়িতে। বুড়ো কেমন করে জানি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'মা, বাসায় চলে যাও। যেই মেয়েটা তোমাকে নিয়ে কলেজে যাওয়া-আসা করত, ওর তো কোন ছায়া ছিল না!'

নিমেষে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে। মান্‌তাসা সবসময় রোদ এড়িয়ে হাঁটত। ঘোর লাগা চেতনা নিয়ে আমি বাসার পথে হাঁটি। পাশে কাজের মেয়ে বেবী। বেবী আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে বলে, 'আফা, পিছে চায়া দেখছি, বুড়াডারও ছায়া নাই।' আমি দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করি। আমাকে, এই রূপাকে কিছুদিনের জন্যে বখাটেদের উৎপাত থেকে বাঁচাতে ছায়া দিয়ে রেখেছিল ছায়াহীন বন্ধু মান্‌তাসা! মান্‌তাসা, আমি ভয় পেলেও তোমার অতুলনীয় বন্ধুত্বের কাছে কৃতজ্ঞ!

রেশমা রেজিনা ঊর্মি

পাথর

এক

'পছন্দ হয়েছে?'

'অমন দারুণ নেকলেস পছন্দ না হয়ে পারে!'

'আচ্ছা, তা হলে ফাইনাল ওটাই?

'আর বলতে হয়!'

'হ্যালো, ওটা কত রাখা যায়?' কালো, ইন করা প্যান্টের পকেটে হাত দিতে দিতে বলল রাহুল। লোকটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, ভাবান্তর নেই। 'শুনছেন, কত রাখা যায়?' রাহুল আবার বলল।

'দুইশ,' ক্ষীণ ও ঠাণ্ডা শোনাল স্বরটা।

নীলা বেশ অবাক হলো, রাহুলও। দরাদরি না করে দাম চুকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো রাহুল। নীলার ভাবান্তর না দেখে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। ঘাড় ফেরাবার আগে নীলা কেমন অস্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু কেন কিছুই ধরতে পারল না। নেকলেসটা রাহুল গলায় পরিয়ে দেয়ার সময় লোকটার চোখে ওর চোখ পড়েছিল।

দুই

'নেকলেসটা দারুণ রে!' উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে অহনার কণ্ঠে, নীলার বান্ধবী।

'হুঁ'।

'বিশেষ করে লকেটের ওই পাথরটা।'

'বোধহয়।'

'আচ্ছা, নীলা, ব্যাপার কী বল তো? সেই কখন থেকে লক্ষ করছি তুই যেন অন্য কোন দুনিয়ায় আছিস। সামথিং রং?'

'আরে দূর! কিছুই না, একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম। বাদ দে ওসব, এবার বল্ তোর খবর কী।'

তিন

কিছুই ঢুকছে না ইন্দ্রিয়ে। পায়চারী করছে নীলা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে অজানা ব্যাপারটা ওর ওপর জাঁকিয়ে বসেছে। তা না হলে অহনার মত রাহুলও বার বার জিজ্ঞেস করত না—'ব্যাপার কী, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

চার

সংশয়টা গেল না! মাথাটা আর চলতে চাইছে না, এক ফোঁটা বিশ্রাম নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। চোখটাও বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। চোখ বন্ধ করার আগে নীলার মনে হলো সংশয়টা ওর ধারে-কাছেই রয়েছে। ওকে যেন অনুসরণ করছে।

পাঁচ

স্বপ্ন দেখছে ভাবনা থামে। অস্ফুট স্বরটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। শ্রবণইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল। ষষ্ঠইন্দ্রিয় স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, ওটা স্বপ্ন নয়। স্বরটা অদ্ভুত, মনে হচ্ছে কেউ যেন ফিসফিস করছে! ভয়ের একটা স্রোতধারা নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। চোখ খুলবে কি না দ্বিধাগ্রস্ত। ফিসফিস স্বরটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। সাহস সঞ্চয় করে নীলা, চোখ মেলল আস্তে আস্তে। হাঁ হয়ে গেল মুখ! ঢোক গিলতে ভুলে গেছে নীলা। একটা চোখ-ভোখের মত অবয়ব, মাথার ঠিক ওপরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চেয়ে আছে ওর দিকে।' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ও মূর্তির মত শুয়ে রইল। অবয়বটা ঝাপসা হচ্ছে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। [illegible] কতক্ষণ ছিল খেয়াল নেই, হুঁশ ফিরতে হাতড়ে বাতির সুইচ অন করল। নেই! কোথাও কিছু নেই

অথচ তখনও স্পষ্ট ভাসছে ওর চোখে, চোখের মত অবয়ব, রক্তবর্ণ, ওটা ও কোথায় যেন দেখেছে!

ছয়

ওকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা। রাহুল ও অহনাকে বার বার বলতে যেয়েও ব্যাপারটা বলতে পারেনি। যদি ওরা কিছু মনে করে। ও জানে, ওরা অতিপ্রাকৃত কিছু কখনোই বিশ্বাস করে না বা করবে না। নিজেও করে না ও, কিন্তু গতরাতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সাত

পরের রাতে চোখ ধাঁধানো আলোকরশ্মিতে তন্দ্রা ছুটে গেল ওর। ভাবল লাইট জ্বালিয়ে শুয়েছিল, সেটার আলোই বোধহয়। কিন্তু ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল চোখ খুলতেই। রুমের চারদিক অন্ধকার। একটা আলোক গোলক, ঠিক চোখের অবয়ব, নেকলেসের লকেটে ওর গলার নীচে– স্থির। সরে যেতে চাইল, শুনতে পেল অদ্ভুত স্বরটা, খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক।

আলোর গোলকটা নেকলেস থেকে ছুটে গেল উপরে, ওর চোখের সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল, ভেসে এল খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক!! আঁতকে উঠে খাট থেকে লাফ দিল নীলা। ওটা এগিয়ে আসছে। অগ্নিবর্ণ! ও পিছু হটতে লাগল। পিঠে কিছু একটার স্পর্শের অনুভূতি, বুঝতে পারল খাটের শেষে পৌঁছেছে, পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে। অস্ফুট, ক্ষীণ চিৎকারে দু'হাতে চোখ-মুখ চেপে ধরল ও। এগিয়ে আসছে ওটা, বদলে যাচ্ছে স্বর, সাপের মত হিস্ হিস্ হিস্ করছে!

আট

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

'হ্যালো, রাহুল বলছি...কী!... নী-লা...!'

মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল রিসিভার। রাহুল কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই, সংবিৎ ফিরতেই ছুটল নীলার বাসায়। ভিড় ঠেলে

ঢুকল নীলার রুমে। এগিয়ে গেল ওর দিকে। পড়ে আছে নীলা, নিশ্বর! কণ্ঠনালীতে একটা ছিদ্র। পাশেই পড়ে আছে ওর দেয়া নেকলেসটা। লকেটের পাথরটা নেই!

নয়

মাথিউরা প্লাজা, ইনার মেইন রোড।

ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক ক্যানভাসার। হাতে কিছু মেয়েলী অলংকার। বাম চোখটা রক্তবর্ণ, শেয়ালের মত ধূর্ত। একজোড়া কপোত-কপোতী এগিয়ে এল ওর দিকে। মেয়েটার পছন্দ হলো আংটিটা, পাথর বসানো! দুশো টাকায় কিনল ও ওটা চলে যেতে উদ্যত হয়ে মেয়েটার হাত ধরে টান দিল ওর সঙ্গী। ঘাড় ফেরাবার আগে, কোথাও কী যেন অদ্ভুত মনে হলো মেয়েটার। লোকটার চোখে চোখ পড়েছিল!

খালেদ আহমদ শিমুল

রাতের সঙ্গী

এক

খালেদ আমার বন্ধু। দীর্ঘদেহী যুবক। বয়েস বাইশের কাছাকাছি। চেহারা সুন্দর। লম্বা, একহারা। আমরা দুজন একই বয়েসী। আমরা একদিন পরিকল্পনা করলাম যে মাছ ধরব। আমাদের বাসা থেকে দুই-তিন কিলোমিটার দূরে একটা বিশাল দীঘি আছে। আমরা সেখানে মাছ ধরব বলে ঠিক করলাম। খালেদ মাছ ধরায় বেশ পটু। আমিও কম নই।

দিন তারিখ ঠিক করা হলো। রাত একটার সময় যাব। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। দীঘির মালিক খুবই রগচটা আর বদমেজাজী টাইপের। দিনের বেলায় কাউকেই দীঘির ধারে ঘেঁষতে দেয় না। সেই জন্যই রাতে মাছ ধরতে হবে।

দুই

আমি রাত একটার দিকে কাপড়-চোপড় পরে ছিপ আর মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে খালেদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম। আমার বাসা থেকে একটু দূরেই খালেদের বাসা। হেঁটেই যাওয়া যায়।

প্রায় দু'টোর দিকে খালেদ এল। ও একটা ছিপ এনেছে। ওর চেহারাটা কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। বার বার বলছিল, 'চল্, চল্'।

দেরি না করে দুজনে রওনা দিলাম। চাঁদটা তখন একফালি মেঘে ঢাকা পড়েছে। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেট ধরানো দেখে খালেদ চট করে একটু দূরে সরে গেল। ওকে

বললাম, 'সিগারেটে দু'টান দিবি?'

'না,' ও সাফ জানাল। 'আজ ভাল লাগছে না। মাথা ঘুরছে।'

সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে লাগলাম, আশ্চর্য! যে খালেদ সিগারেট ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না, সে-ই আজকে এই কথা বলল?

নিঃশব্দে হাঁটছে খালেদ। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলাম। ওর পায়ের দিকে তাকালাম। অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। গা শিউরে উঠল আমার।

তিন

খালেদের পা কই! খালি একজোড়া খুর দেখতে পাচ্ছি আমি। মাটি থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে হাঁটছে খুরওয়ালা খালেদ!

দূর! কী সব যা-তা ভাবছি। নিশ্চয়ই চোখের ভুল। তা না হলে কেন ওই খুর দেখব? অন্ধকারে অনেকেই ভুল দেখে। খেয়াল করলাম সিগারেটটা ফেলে দিতেই ও আমার পাশে এসে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দীঘিতে এসে পৌঁছলাম তা খেয়াল নেই।

দীঘির পানি কুচকুচে কালো। চারদিক কেমন ভুতুড়ে পরিবেশ। দীঘির একপাশে একটা নৌকা বাঁধা ছিল। আমরা দুজন ওই নৌকা নিয়ে দীঘির মাঝখানে এলাম।

দুজন দুজনের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো হয়ে বসলাম। নৌকাটা এতই ছোট যে দুজন ছাড়া তিনজন বসা যাবে না।

চার

মাছ ধরবার চেষ্টায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে। আমি মাছ ধরে ধরে একটা পলিথিন ব্যাগে রাখছি। অনেকক্ষণ ধরেই একটা আওয়াজ শুনছিলাম আমি। কেমন যেন বিকট শব্দ! কাঁচা শসা কামড়ালে যেমন

শব্দ হয়। হঠাৎ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক বিরাজ করছে নিঝুম নীরবতা।

হঠাৎ নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগল। মনে হলো আমি একা। নৌকাটাও আমার ভারে একদিকে কাত হয়ে গেছে। খালেদের দিকে তাকালাম।

আরে! খালেদ কই! ওখানেই তো বসে ছিল!

নাকে একটা বোটকা গন্ধ এল। চারদিকে তাকালাম। একটা বিড়ালও চোখে পড়ল না।

খালেদ দীঘিতে নেমেছে? নাহ্, প্রশ্নই আসে না। দীঘির পানি যে ঠাণ্ডা, হাত দিলেই যেন বরফ হয়ে যাবে। তা ছাড়া পানিতে নামলে শব্দ হবে। সেটাও পাইনি। হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিল আমার। নৌকা নিয়ে পাড়ে চলে এলাম। ঠিক করলাম মাছ নিয়ে বাড়ি চলে যাব। কথাটা ভাবতে ভাবতে পলিথিনের দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেলাম। একটা মাছও নেই! সব একদম হাওয়া! হঠাৎ এক পৈশাচিক হাসি শুনতে পেলাম। রক্ত হিম করা হাসি! হাসিটা কেমন যেন খনখনে, নাঁকি নাঁকি।

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

পাঁচ

পরদিন দুপুরে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলাম। নিজের বিছানায়। পরে জানতে পারলাম সেদিন রাতে খালেদ আমার সাথে মাছ ধরতে যায়নি। ও ঘুমিয়ে ছিল নিজের বাসায়। তা হলে...আমি কার সাথে গিয়েছিলাম ওই দীঘিতে!

আলী ফারহান (দিগন্ত)

সেই ভয়ঙ্কর রাত

রাত সোয়া দশটার দিকে হার্ব টুকল্যাণ্ডার দোকান বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাবছে এমন সময় ফেন্সি ওভারকোট গায়ে, রক্তশূন্য মুখের এক লোক দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল টুকি'স বার-এ। বারটি ফলমাউথের উত্তর প্রান্তে। সেদিন দশ জানুয়ারি, নিউ ইয়ারের ছুটির আমেজে তখনও বিভোর মানুষজন, আর এ সময়টিতেই কিনা উত্তর-পুব থেকে বইতে শুরু করল ঝড়ো হাওয়া। সাঁঝের আঁধার ঘনাবার আগেই রাস্তা ডুবে গেল ছয় ইঞ্চি গভীর তুষারে। তারপর থেকে সময় যত গড়াচ্ছে, তুষার বৃষ্টির পরিমাণ ততই বেড়ে চলছে। বিলি লারিবীকে দু'বার দেখলাম প্লাউ নিয়ে রাস্তার তুষার সরাতে গেছে। বিলি ফিরে এসে জানাল মেইন রোডে এখনও তুষার পরিষ্কারের চেষ্টা চলছে তবে সাইড রোডগুলো বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সকাল পর্যন্ত ওই রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়েই থাকবে। পোর্টল্যাণ্ড রেডিও ঘোষণা করল আরও হাতখানেক বরফে ঢেকে গেছে রাস্তা এবং ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে প্রবাহিত বাতাস তুষারের স্তূপ তৈরি করছে।

বার-এ আছি শুধু আমি আর টুকি। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে বাতাসের হুংকার, অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে উদ্বাহু নৃত্য করছে প্রবল ঝাপটা নিয়ে। টুকি আমার জন্য একটা গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। নিজের জন্য নিল আরেকটা। এমন সময় শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল লোকটা, কাঁধে এবং চুলে জমে আছে সাদা বরফ, যেন কনফেকশনারীর চিনির মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। আগন্তুকের পেছন পেছন ধেয়ে এল বালুর মিহিদানার মত বরফের চাদর।

'দরজা বন্ধ করুন!' লোকটার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল টুকি।

'আপনার মাথায় ঘিলু নেই নাকি?'

আমি জীবনেও কোনও মানুষের এমন ভয়ার্ত চেহারা দেখিনি। টুকির দিকে ফিরল সে। 'আমার স্ত্রী–আমার মেয়ে–' বলেই ধপাশ করে পড়ে গেল মেঝেতে। অজ্ঞান।

'খাইছে।' গুঙিয়ে উঠল টুকি। 'বুথ, দরজাটা দয়া করে বন্ধ করে দাও'।

আমি টুল ছেড়ে সিধে হলাম, এক লাফে পৌঁছে গেলাম দরজায়। উন্মত্ত বাতাস ঠেলে কপাট বন্ধ করতে একটু বেগ পেতে হলো। এদিকে টুকি এক হাঁটু ভাঁজ করে আগন্তুকের পাশে বসে তার মাথাটা তুলে নিয়েছে নিজের কোলে। গালে চাপড় মারছে। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার মুখ টকটকে লাল, এখানে-ওখানে ধূসর বুটি বুটি দাগ। মেইনে বহু শীতকাল কেটেছে আমার। ধূসর দাগগুলো দেখেই বুঝতে পারলাম এ ফ্রস্টবাইটের চিহ্ন।

'অজ্ঞান হয়ে গেছে,' বলল টুকি। 'একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে এসো, বুথ।'

বার-এর পেছন থেকে ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে এলাম। টুকি লোকটার গায়ের কোট খুলে ফেলেছে। লোকটাকে আগের চেয়ে সামান্য সুস্থির লাগল। চোখ জোড়া আধবোজা, বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

'এক কাপ ব্রাণ্ডি দাও,' বলল টুকি।

'শুধু এককাপ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আরে এ জিনিস ডিনামাইট,' বলল টুকি। 'বেহুদা কতগুলো ব্রাণ্ডি গিলিয়ে লাভ নেই।'

আমি এক কাপ ব্রাণ্ডি ঢাললাম। তাকালাম টুকির দিকে। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওর মুখে ঢেলে দাও।'

ব্রাণ্ডি ঢেলে দিলাম আগন্তুকের মুখে। তারপর একটা দৃশ্য দেখা গেল। হঠাৎ সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটার। কাশছে। মুখের চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল, চোখের আধবোজা পাপড়িগুলো সটান দাঁড়িয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে গেলাম আমি। তবে টুকির চেহারায় কোনও ভাবান্তর ঘটল না। সে আগন্তুককে

বুড়ো খোকার মত ধরে রেখে পিঠে চাপড় মারতে লাগল।

বমি শুরু করে দিল লোকটা, টুকি চাপড় দিয়েই চলল।

'বমি করতে থাকুন,' বলল সে। 'শরীর ভাল লাগবে।'

লোকটা আবার কাশল তবে কাশির বেগটা আগের মত জোরাল নয়। আমি এবার ভাল করে তাকালাম লোকটার দিকে। দেখেই বোঝা যায় শহুরে বাবু। বোস্টনের দক্ষিণ থেকে এসেছে বোধহয়। হাতের মোজা জোড়া পাতলা তবে দামী। হাতের যেটুকু অংশ মোজায় ঢাকা পড়েনি সেখানটাতে ধূসর-সাদা ছোপ ছোপ দাগ। ফ্রস্টবাইটের হামলার চিহ্ন। হাতের দু'একটা আঙুল যদি হারাতে না হয় তা হলে লোকটাকে ভাগ্যবান বলতেই হবে। কোটটা বেশ ঝলমলে, কমপক্ষে তিনশ' ডলার তো হবেই। ছোট বুট পরেছে পায়ে, গোড়ালিও পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি তাতে। লোকটার পায়ের আঙুলগুলো আছে না গেছে ভাবছি আমি।

'এখন একটু ভাল্লাগছে,' বলল আগন্তুক।

'বেশ,' বলল টুকি। 'আগুনের ধারে চলুন।'

'আমার বউ আর মেয়ে,' বলল লোকটা। 'ওরা বাইরে... ঝড়ের মধ্যে।'

'আপনি যে চেহারা নিয়ে ঢুকেছেন তাতে আমার মনে করার কোনও কারণ নেই যে তারা বাড়িতে বসে টিভি দেখছে,' বলল টুকি। 'আগুনের পাশে বসবেন চলুন, ওখানে আরাম লাগবে। বুথ, একটু ধরো তো।'

লোকটা হাচড়ে পাচড়ে সিধে হলো, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি, চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে ব্যথায়। লোকটার পায়ের আঙুলের দশার কথা ভেবে আবার সন্দিহান হলাম আমি। ভেবে অবাক লাগল এ কেমন লোক যে এমন প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে মেইন শহরে মরতে এসেছে। এ লোকের বউ এবং মেয়ের গায়ে এর চেয়ে ভারী জামা আছে কিনা ভেবে সন্দেহ জাগছে।

লোকটাকে দু'জনে মিলে ধরে ধরে ফায়ারপ্লেসের সামনে নিয়ে এলাম। বসিয়ে দিলাম একটি দোলনা চেয়ারে। '৭৪-এ মৃত্যুর আগ

পর্যন্ত এ চেয়ারটি দখলে ছিল মিসেস টুকির। মিসেস টুকিই আসলে এ বারটি তৈরি করে গেছেন। তাঁর কথা লেখা হয়েছে ডাউন ইস্ট, সানডে টেলিগ্রাম এমনকী বোস্টন গ্লোব-এর রবিবাসরীয় পাতাতেও। এটাকে আসলে বার-এর চেয়ে পাবলিক হাউস বললেই বেশি মানায়। ঘরের বিরাট মেঝেটি সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি, বার ম্যাপল কাঠের, গোলাবাড়ির মত ছাদ এবং পাথরের প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেস। মিসেস টুকি বারটির নাম দিতে চেয়েছিলেন টুকি'র সরাইখানা কিংবা টুকি'র বিশ্রামাগার। তবে আমি সহজ সরল নামটি বাছাই করে দিই–টুকি'স বার। গরমের সময় খদ্দেরে গমগম করে বার। তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যুরিস্ট আসে। কিন্তু শীতের সময় ভিন্ন দৃশ্য। তখন আমি আর টুকিই খদ্দের। আমরা দু'জনে একাকী সময় কাটিয়ে দিই স্কচ, পানি এবং বিয়ার পান করে। আমার বউ ভিক্টোরিয়া মারা গেছে '৭৩ সালে। টুকি ছাড়া আমার যাবার কোনও জায়গা নেই। তাই টুকি'র বার-এ অধিকাংশ সময় কেটে যায় আমার।

লোকটা আগুনের সামনে বসে কাঁপছে। দুই হাঁটু জড়ো করে রাখল সে, দাঁতে দাঁত লেগে খটাখট শব্দ উঠল। নাকের ফুটো দিয়ে গড়িয়ে নামল কয়েক ফোঁটা তরল সর্দি। আমার ধারণা লোকটা বুঝতে পেরেছে আর মিনিট পনেরো বাইরে থাকলেই তার দফা রফা হয়ে যেত। বরফ নয়, বরফ শীতল বাতাস শুষে নেয় শরীরের সমস্ত তাপ।

'আপনি কোথায় গাড়ি রেখে এসেছেন?' জানতে চাইল টুকি।

'এ-এখান থেকে ছ'-ছ' মাইল দ-দক্ষিণে,' জবাব দিল সে।

টুকি এবং আমি দৃষ্টি বিনিময় করলাম। আমার শরীর শিরশির করে উঠল। হঠাৎ হিম হয়ে গেছে গা।

'আপনি কী বলছেন?' বলল টুকি। 'ছয় মাইল রাস্তা বরফ ঠেঙিয়ে এসেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল সে, 'জ্বী। শহর দিয়ে আসার সময় ওডোমিটার চেক করেছি। আমি আমার শ- শালীকে দেখতে যাচ্ছিলাম... কামবারল্যান্ডে [illegible] এদিকে আগে কখনও আসিনি... আমরা নিউজার্সি থাকি...

'ছয় মাইল। আপনি ঠিক জানেন?' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল টুকি।

'জ্বী, জানি। রাস্তার বাঁকটা দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু বরফে ঢাকা ছিল ওটা...'

টুকি আগন্তুকের বাহু খামচে ধরল। আগুনের আঁচে তার মুখটা বিবর্ণ এবং ক্লান্ত লাগল। বাষট্টি বছরের তুলনায় অনেক বুড়ো দেখাল টুকিকে। 'আপনি ডানে মোড় নিয়েছিলেন?'

'ডানে মোড়, জ্বী। আমার স্ত্রী–'

'কোনও সাইনবোর্ড চোখে পড়েনি?'

'সাইনবোর্ড?' লোকটা শূন্য চোখে তাকাল টুকির দিকে, হাতের চেটো দিয়ে মুছল নাক। 'দেখেছি তো! ম্যাপের মধ্যে রাস্তার ডিরেকশন লেখা ছিল। আমি তো ওই ডিরেকশন অনুযায়ী গাড়ি চালিয়েছি। লেখা ছিল জয়েন্টার এভিন্যু দিয়ে জেরুসালেম'স লট হয়ে ২৯৫ এণ্ট্রান্স র‍্যাম্পে যেতে হবে।' টুকির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর আবার নজর ফেরাল টুকির দিকে। বাইরে শিস দিল বাতাস, হুংকার ছাড়ল, গোঙানির শব্দ নিয়ে ঢুকে পড়ল দরজার ফাঁক দিয়ে। 'ঠিক রাস্তায় আমি যাইনি, মিস্টার?'

'সালেম'স লট,' এমন আস্তে শব্দটা উচ্চারণ করল টুকি, প্রায় শোনাই গেল না। 'ওহ্, মাই গড।'

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। তার কণ্ঠ ক্রমে উঁচু লয়ে উঠছে। 'ওটা সঠিক রাস্তা ছিল না? রাস্তাটা বরফে ঢাকা ছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম...যদি ওদিকে কোনও শহর থেকে থাকে, প্লাউ হয়তো পাওয়া যাবে এবং...। আর আমি তখন...'

গলার স্বর ডুবে এল লোকটার।

'বুথ,' নিচু গলায় আমাকে বলল টুকি। 'শেরিফকে ফোন করো।'

'হ্যাঁ,' বলল নিউজার্সির গর্দভটা, 'তাই করুন। আসলে আপনাদের হয়েছেটা কী বলুন তো? এমন করছেন যেন ভূত দেখেছেন।'

টুকি বলল, 'সালেম'স লটে ভূত নেই, মিস্টার। আপনি কি আপনার পরিবারকে গাড়িতে বসে থাকতে বলেছেন?'

'অবশ্যই,' মিনমিনে গলা লোকটার, 'আমি তো আর পাগল না যে বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে বলব।'

'আপনার নাম কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'শেরিফকে বলতে হবে।'

'লুমলি,' জানাল সে। 'জেরার্ড লুমলি।'

সে টুকির সঙ্গে কথা বলছে, আমি ফোনে পা বাড়ালাম। তুললাম রিসিভার। মৃত্যুশীতল নৈঃশব্দ্য। বেশ কয়েকবার বোতাম টিপেও লাভ হলো না কোনও। সাড়া নেই।

ওদের কাছে ফিরে এলাম আমি। টুকি জেরার্ড লুমলিকে আরেক কাপ ব্রাণ্ডি ঢেলে দিয়েছে। তরলটা পেটে যেতে তাকে যেন আরেকটু সতেজ লাগল।

'শেরিফকে পাওনি?' জানতে চাইল টুকি।

'ফোন ডেড।'

'যাশ্‌শালা,' বলল টুকি। পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমরা। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপির বিরাম নেই, আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জানালার কাচে।

লুমলি টুকির দিক থেকে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'আপনাদের কারও গাড়ি নেই?' প্রশ্ন করল সে। কণ্ঠে ফিরে এসেছে উদ্বেগ। 'হিটার অন করতে হলে ওদেরকে ইঞ্জিন চালাতে হবে। গাড়িতে সিকি ভাগ গ্যাস আছে। আর আমার এখানে আসতে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে...আরি, আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন?' সিধে হলো সে, খামচে ধরল টুকির শার্ট।

'মিস্টার,' বলল টুকি, 'আপনার মগজটা দেখছি মাথা থেকে হাতে সরে এসেছে। শার্ট ছাড়ুন।'

নিজের হাতের দিকে তাকাল লুমলি। তারপর টুকির দিকে। ছেড়ে দিল শার্ট। 'মেইন,' হিসিয়ে উঠল সে। যেন কাউকে গালি দিল। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'সবচেয়ে কাছের গ্যাস স্টেশনটা কোথায়? ওদের কাছে নিশ্চয় টো ট্রাক থাকবে—'

'সবচেয়ে কাছের গ্যাস স্টেশন ফলমাউথ সেন্টারে,' বললাম

আমি। 'এখান থেকে তিন মাইল দূরে।'

'ধন্যবাদ,' যেন ব্যঙ্গ করল সে, কোটের বোতাম আটকাতে আটকাতে পা বাড়াল দরজায়।

'খোলা পাবেন না,' বললাম আমি।

ধীরগতিতে ফিরে এল সে, তাকাল আমাদের দিকে।

'কী বলতে চাইছেন, ওল্ড ম্যান?'

'বলতে চাইছে সেন্টারের গ্যাস স্টেশনের মালিক বিলি লারিবী এবং সে প্লাউ নিয়ে বেরিয়ে গেছে,' ধৈর্য নিয়ে বলল টুকি। 'এখানে এসে বসুন।'

ভীত এবং বিভ্রান্ত দেখাল লুমলিকে। 'আপনারা কি বলতে চাইছেন যে আপনারা পারবেন না...ওখানে...'

'আমি আপনাকে কিছুই বলতে চাইছি না,' বলল টুকি।

'যা কথা বলার আপনিই বকে যাচ্ছেন। একটুক্ষণ মুখটা বন্ধ রাখলে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারি।'

'এটা কীরকম শহর, এই জেরুসালেম'স লট?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওখানে কোনও আলো নেই কেন?'

আমি বললাম, 'জেরুসালেম'স লট বছর দুই আগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'শহরটার পুনঃসংস্কার করা হয়নি?' চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটল লুমলির।

'না,' জবাব দিলাম আমি। তাকালাম টুকির দিকে। 'ওদের নিয়ে কী করি বলো তো?'

'ওদেরকে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না,' বলল টুকি।

আমি টুকির দিকে এগিয়ে গেলাম। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লুমলি। বরফ ঝরা রাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'ওরা যদি ওদের খপ্পরে পড়ে যায়?' ফিসফিস করলাম আমি।

'পড়তেও পারে।' বলল টুকি। 'কিন্তু ওখানে না গিয়ে বুঝব কী করে? আমি শেলফ থেকে বাইবেলটা নিয়ে নিচ্ছি। তোমার গলায় পোপের মেডেলটা আছে না?'

আমি শার্টের আড়াল থেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিটি বের করে টুকিকে দেখালাম। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কংগ্রেগেশনাল হিসেবে। তবে লটের আশপাশে যারা বাস করে তারা ক্রুশজাতীয় কিছু একটা জিনিস সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখে। সেটা হতে পারে সেন্ট ক্রিস্টোফারের মেডেল কিংবা জপমালা। বছর দুই আগে, অক্টোবরের এক নিশুতি রাতে একটি ঘটনা ঘটেছিল সালেম'স লটে। সেদিন শেষ রাতে, টুকির বার-এ নিয়মিত খদ্দেরদের যে কয়েকজন ফায়ারপ্লেসে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, তারা ওই ঘটনাটির কথা জানে, ও নিয়ে ভয়ে ভয়ে গল্প করে। ওই রাতে হঠাৎ করেই লট-এর বেশ কয়েকজন বাসিন্দা অদৃশ্য হয়ে যায়। ওটাই ছিল শুরু। প্রথমে অল্প ক'জন, পরে আরও কয়েকজন, তারপর হঠাৎ করে গোটা শহরের মানুষজন নেই হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল। শহরটা প্রায় বছরখানেক জনশূন্য ছিল। তারপর বাইরে থেকে কিছু লোক এসে শহরে আস্তানা গাড়তে থাকে। কারণ জমির অস্বাভাবিক কম দাম। তবে তারা বেশিদিন ওখানে থাকতে পারেনি। শহরে আসার এক/দুই মাস পরেই অনেকেই চলে গেছে। তবে বাকিরা... অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর একদিন আগুনে পুড়ে যায় শহর। লম্বা, শুকনো এক গ্রীষ্মের শেষের দিকের ঘটনা ছিল ওটা। জয়েন্টার এভিন্যুর দিকে মুখ ফেরানো, পাহাড়ের ওপরের মারস্টেন হাউস থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে কেউ জানে না কীভাবে ওই বাড়ি গ্রাস করেছিল আগুন। পুরো তিনটি দিন দাউ-দাউ অগ্নিশিখা গিলে খেয়েছে শহরটাকে। প্রচণ্ড উত্তাপে কেউ ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি। অগ্নিকাণ্ডের পরে কিছুদিন শহরে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার কথা শোনা যায়নি। তারপর আবার ভৌতিক সব গল্প ছড়িয়ে পড়ে শহরটি ঘিরে।

তবে আমি মাত্র একবারই 'ভ্যাম্পায়ার' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছি। রিচি মেসিনা নামে মোটকু ট্রাক ড্রাইভারটি আসছিল ফ্রীপোর্ট থেকে। রাস্তায় টুকি'র বার-এ থেমেছিল গলা ভেজাতে। আকণ্ঠ মদ গিলে বিশালদেহী লোকটা ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বলছিল, 'যীশাস ক্রাইস্ট! শব্দটা উচ্চারণ করতে আপনাদের এত ডর লাগে কেন?

বললেই হয় ওগুলো ভ্যাম্পায়ার। আপনারা দেখছি সিনেমার ভূতের ডরে জড়োসড়ো বাচ্চাদের মতো সিঁটিয়ে আছেন। আপনারা জানেন সালেম'স লটে কী আছে? বলব আমি? শুনতে চান?'

'বলো, রিচি,' বলেছিল টুকি। বার-এ নেমে এসেছিল থমথমে নীরবতা। ঘরে শুধু ফায়ারপ্লেসে কাঠ পোড়ার চড়চড় শব্দ আর বাইরে নভেম্বরের বৃষ্টির ছন্দ। 'আমরা শুনতে চাই।'

'আপনারা কেবল জুজু বুড়ির কল্পনা করছেন,' বলেছিল রিচি। 'ভূতের গল্প শুনতে ভালবাসেন তাই এসব গল্প বানাচ্ছেন ওই শহর নিয়ে। যে ভূতুড়ে বাড়িটি নিয়ে আপনাদের এত জল্পনা-কল্পনা, আমাকে আশিটি ডলার দিন, আমি এক রাত কাটিয়ে আসব ওই বাড়িতে। কারও বাজি ধরার সাহস আছে?'

কেউ বাজি ধরতে এগিয়ে যায়নি। রিচিকে সবাই জানত বাক্যবাগীশ হিসেবে, বড় বড় কথা বলে। আর প্রায়ই পাঁড় মাতাল হয়ে থাকে। রিচির জন্য কারও সমবেদনা বা মায়া ছিল না তবে আমরা চাইনি সন্ধ্যার পরে সে সালেম'স লটে যাক।

'আপনারা সবাই একেকটা ভীতুর ডিম,' নাক সিঁটকিয়েছে রিচি। 'আমার গাড়িতে শটগান আছে। ফলমাউথ, কামবারল্যাণ্ড কিংবা জেরুসালেম'স লটের কাউকেই আমি পরোয়া করি না। কারণ ওই অস্ত্রের সামনে ভূত-প্রেত কিছুই দাঁড়াবার সাহস করবে না। এবং আমি সালেম'স লটেই যাচ্ছি।'

দড়াম করে পেছনে দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছিল রিচি। আমরা কেউ একটা কথাও বলিনি। নীরবতা ভঙ্গ করে ল্যামন্ট হেনরী বলে উঠেছিল, 'তোমরা আর ইহজীবনে রিচি মেসিনাকে দেখতে পাবে না।' তারপর সে সভয়ে বুকে ক্রুশ এঁকেছে।

'ওর মাথাটা ঠিক হয়ে গেলেই মত বদলাবে,' অনিশ্চিত গলায় মন্তব্য করেছিল টুকি। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ও। বলবে আসলে ঠাট্টা করছিল।'

কিন্তু ল্যামন্টের কথাই ফলেছে। রিচির চেহারাও আর কখনও কেউ দেখেনি। ওর বউ রাজ্য পুলিশকে বলেছিল তার ধারণা রিচি ফ্লোরিডা

গেছে পাওনা টাকা আদায় করতে। তবে রিচির বউয়ের চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সত্য কোন্‌টি—চোখে ফুটে ছিল স্পষ্ট ভীতি। কিছুদিন পরে মহিলা রোড আইল্যাণ্ডে চলে যায়। হয়তো আশংকা করেছে রিচি কোনও এক অন্ধকার রাতে ফিরে আসবে তার কাছে।

টুকি এখন্‌ আমার দিকে তাকাচ্ছে আর আমি তাকাচ্ছি টুকির দিকে। জামার মধ্যে ক্রুশটা আবার পাচার করে দিয়েছি আমি। জীবনেও এত ভয় লাগেনি আমার, টুকি কথাটা পুনরাবৃত্তি করল, 'আমরা ওদেরকে বাইরে ফেলে রাখতে পারি না, বুথ।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি।'

অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম দু'জনে, তারপর হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করল টুকি। 'তুমি একজন ভাল মানুষ, বুথ।' আমাকে খুশি বা উজ্জীবিত করে তুলতে এ কথাটিই যথেষ্ট। সাধারণত সত্তর পার হওয়া বুড়োদেরকে কেউ মানুষ বলেই গণ্য করে না।

টুকি লুমলির কাছে গিয়ে বলল, 'আমার একটি ফোর-হুইল-ড্রাইভ স্কাউট আছে। ওটা বের করছি।'

'ফর গডস সেক ম্যান, এ কথা আগে বলেননি কেন?' জানালার সামনে চরকির মত ঘুরল লোকটা, ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল টুকির দিকে। 'খামোকা এতক্ষণ সময় নষ্ট করলেন কেন?'

টুকি অত্যন্ত নরম গলায় বলল, 'মিস্টার, মুখটাকে বন্ধ রাখুন। মুখটা খোলার আগে চিন্তা করে দেখুন এমন ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মধ্যে কে ওই বিশ্রী রাস্তায় মোড় নিয়ে গাড়ি ফেলে রেখে এসেছে।'

লুমলি কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। তার গালে যেন জমাট বাঁধল রক্ত। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করার জন্য বেরিয়ে গেল টুকি। আমি ক্রোম ফ্লাস্কে ব্রাণ্ডি ভরলাম। যে রাতটা সামনে পড়ে আছে, এ জিনিসের খুব দরকার হবে আমাদের।

মেইনে এমন তুষারপাত হতে কখনও দেখিনি আমি। ঘন হয়ে উড়ে আসছে তুষার, জমাট বাঁধছে গাড়ির ওপর। হেডলাইট পুরোপুরি

জ্বেলে গাড়ি চালানোর জো নেই। বরফে আলোর প্রতিফলন ধাঁধিয়ে দেবে চোখ এবং আপনি দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাবেন না। আর হেডলাইটের আলো কমিয়ে গাড়ি চালালে পনেরো হাতের বেশি যাবে না নজর। তবে তুষার এবং বরফ নিয়ে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। সহ্য করতে পারি না বাতাসটা। হাওয়ার বেগ যখন বেড়ে যায়, ছাড়তে থাকে হুঙ্কার, উড়ন্ত বরফ শতশত অদ্ভুত আকার ধারণ করে, আওয়াজ করে; দেখলেই উড়ে যায় আত্মা। তুষার ঝড়ের বাতাসে আছে মৃত্যু, সাদা মৃত্যু—এবং হয়তোবা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। এমন ঝড়ের মধ্যে বাড়ির দরজা জানালা আটকে শুয়ে থাকলে আপনি কোনও শব্দ শুনতে পাবেন না। কিন্তু গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরুলে যে কত ঝক্কি পোহাতে হয় তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। আর আমরা কিনা এমন ঝড়ের রাতে সালেম'স লটে চলেছি!

'একটু জলদি করা যায় না?' তাড়া দিল লুমলি।

আমি বললাম, 'আপনি তো আধমরা হয়ে এসেছেন। আবার পায়ে হেঁটে যাত্রা করার শখ হয়েছে?'

লুমলি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে, ক্ষুব্ধ চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল, বলল না কিছু। আমরা ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে হাইওয়ে দিয়ে ছুটছি। রাস্তার অবস্থা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন বিলি ল্যারিবী মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে এদিকের বরফ পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। অন্তত দু'ইঞ্চি পুরু বরফ ঢেকে ফেলেছে হাইওয়ে এবং ঝির ঝির তুষার পতনে কোনও বিরতি নেই। প্রবল বেগে দমকা হাওয়া হামলে পড়ছে আমাদের গাড়িতে। সামনে, হেডলাইটের আলোয় ঘূর্ণায়মান সাদা ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। রাস্তায় এখন পর্যন্ত অন্য কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি।

মিনিট দশেক পরে হঠাৎ আঁতকে উঠল লুমলি, 'আরি? ওটা কী?'

আমাদের গাড়ির পাশে হাত তুলে দেখাল সে; আমি সটান সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মাথা ঘোরালাম। একটা ছায়া শুধু দেখতে পেলাম এক পলকের জন্য। সাঁৎ করে সরে গেল গাড়ির পাশ দিয়ে। তবে চোখে ভুলও দেখতে পারি।

'কী ওটা? হরিণ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হতে পারে,' কাঁপা গলায় বলল লুমলি। 'কিন্তু ওটার চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল লাল আভার মত।' আমার দিকে তাকাল। 'আঁধারে হরিণের চোখ ওরকম লাগে নাকি?' আকুতির ভঙ্গিতে যেন কথাটা বলল সে।

'অন্ধকারে কত কিছুই তো মনে হতে পারে,' বললাম আমি। রাতের বেলা গাড়ির আলোয় বহু হরিণ চোখে পড়েছে আমার। কারও চোখ লাল আভা নিয়ে জ্বলজ্বল করেনি।

টুকি কোনও মন্তব্য করল না।

মিনিট পনেরো বাদে আমরা যেখানে চলে এলাম, রাস্তার এদিকটাতে বরফ পাহাড় হয়ে জমাট বাঁধার সুযোগ পায়নি এদিক দিয়ে সম্ভবত প্লাউ গেছে বরফ কেটে।

'এদিকটাতেই বোধহয় আমরা বাঁক নিয়েছিলাম,' অনিশ্চয়তার সুরে বলল লুমলি। 'তবে সাইনবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছি না–'

'এটা সে জায়গায়ই,' বলল টুকি। গলার স্বর অচেনা শোনাল। 'আপনি শুধু সাইড পোস্টের মাথা দেখেছেন।'

'ওহ্, আচ্ছা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যেন লুমলি। 'আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে–'

'এখনই ধন্যবাদ দিতে হবে না,' বলল টুকি। 'আগে আপনার স্ত্রী-কন্যাকে গাড়িতে তুলে নিই তারপর ধন্যবাদ দিয়েন।' স্কাউটকে ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল ও। ঢুকল জয়েন্টার এভিন্যুতে। এটা লট হয়ে মিশেছে রুট ২৯৫-এ। মাডগার্ডের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে তুষার। বারবার পিছলে যেতে চাইছে চাকা। তবে টুকি অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভার। সে গাড়ির সঙ্গে কথা বলে, বাহনটাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, ধমকায়, তোষামোদ করে। স্কাউটের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল টুকি। হেডলাইটের আলোয় মাঝে মাঝে ঝিলিক দিল বরফের গায়ে অপর গাড়ির টায়ারের চিহ্ন। লুমলির গাড়ির চাকার দাগ। আবার হাওয়া হয়ে গেল চিহ্নগুলো। সামনে ঝুঁকে আছে লুমলি, নিজের গাড়ির সন্ধান করছে। হঠাৎ টুকি বলে উঠল, 'মি. লুমলি '

'কী?' টুকির দিকে ঘুরল লুমলি।

'এখানকার লোকদের সালেম'স লট নিয়ে নানান কুসংস্কার রয়েছে,' বলল টুকি, গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে–তবে আমি দেখতে পাচ্ছি ওর গাল দুটো কুঁচকে গেছে, চোখ জোড়া অস্থির গতিতে ডানে-বামে ঘুরছে। 'আপনার বউ-বাচ্চা যদি এখনও গাড়িতে বসে থাকে তো বহুৎ আচ্ছা। আমরা তাদেরকে গাড়িতে তুলে নেব, ফিরে যাব ঘরে এবং কাল, ঝড় থেমে গেলে বিলি স্নোব্যাংক থেকে আপনার গাড়িটি সানন্দচিত্তে তুলে আনবে। তবে ওরা যদি গাড়িতে না থাকে–'

'গাড়িতে না থাকে মানে?' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল লুমলি। 'ওরা গাড়িতে থাকবে না কেন?'

'ওরা যদি গাড়িতে না থাকে,' জবাব না দিয়ে বলে চলল টুকি, 'আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাব ফলমাউথ সেন্টারে এবং শেরিফকে খবর দেব। এমন ঝড়ের রাতে বেহুদা খুঁজে মরে লাভ আছে কোনও, আপনিই বলুন?'

'ওরা গাড়িতেই থাকবে। এ ছাড়া কোথায় যাবে?'

আমি বললাম, 'আরেকটা কথা, মি. লুমলি। আমাদের সঙ্গে যদি কারও দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে কথা বলব না। এমনকী সে যদি সেধে এসে কথা বলতে চায় তবু আমরা এড়িয়ে যাব। বুঝতে পেরেছেন?'

খুব ধীর গতিতে প্রশ্ন করল লুমলি, 'কুসংস্কারগুলো কী নিয়ে শুনি?'

আমি মুখ খোলার আগে–ঈশ্বর জানেন আমি আসলে কী জবাব দিতাম–বলে উঠল টুকি, 'চলে এসেছি।'

বড় একটি মার্সিডিসের পেছনের অংশটা দেখতে পেলাম সামনে। গাড়ির হুডের পুরোটাই কবর হয়ে গেছে বরফের চাদরের নীচে। গাড়ির বাম দিকের সম্পূর্ণটাও গ্রাস করে ফেলেছে বরফ। তবে টেইল লাইট জোড়া জ্বলছে। টেইল পাইপ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

'গাড়ির গ্যাস এখনও ফুরিয়ে যায়নি,' বলল লুমলি।

টুকি স্কাউটের ইমার্জেন্সি ব্রেক চেপে ধরল। 'বুথ আপনাকে কী বলেছে মনে আছে তো, লুমলি?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' তবে লুমলির ভাবনায় এখন তার স্ত্রী এবং কন্যা ছাড়া অন্য কেউ বা কিছু নেই। অবশ্য এজন্য তাকে দোষ দেয়াও যায় না।

'রেডি, বুথ?' টুকি জিজ্ঞেস করল আমাকে। ওর চোখ আমার চোখে, ড্যাশবোর্ডের আলোয় কঠিন এবং ধূসর দেখাল। 'হুঁ,' জবাব দিলাম আমি।

আমরা সবাই নেমে এলাম গাড়ি থেকে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল বাতাস, মুখে ছুঁড়ে দিল বরফ। লুমলি আমাদের সবার আগে, বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচতে সামনের দিকে নুয়ে গেল, তার দামী টপকোট শরীরের পেছনে পালের মত পতপত করে উড়ছে। টুকির গাড়ির হেডলাইটের আলো মাটিতে তার ছায়া ফেলেছে, অপর আরেকটি ছায়ার সৃষ্টি করেছে তার নিজের গাড়ির টেইল লাইট। আমি লুমলির পেছনে, আমার এক হাত পশ্চাতে টুকি। মার্সিডিসের ট্রাংকের সামনে চলে এসেছি, টুকি খামচে ধরল আমার হাত।

'ও আগে যাক,' বলল সে।

'জেনি! ফ্রান্সি!' চেঁচাল লুমলি। 'সব ঠিক আছে তো?' ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে উঁকি দিল। 'সব—'

বরফের মূর্তি হয়ে গেল লুমলি। জমে গেছে নিজের জায়গায়। দমকা হাওয়া দরজাটা তার হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে ছুটিয়ে নিল। খুলে গেল হাট হয়ে।

'হলি গড, বুথ,' বলল টুকি, বাতাস ছাপিয়ে শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠ। 'আবার ঘটেছে সেই ঘটনা।'

লুমলি ফিরল আমাদের দিকে। চেহারায় ভয় এবং বিহ্বল ভাব, চোখ জোড়া বিস্ফারিত। হঠাৎ প্রচণ্ড এক লাফ মারল সে আমাদেরকে লক্ষ্য করে। আমি যেন বাতাসে তৈরি পলকা কিছু, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল আমাকে, চেপে ধরল টুকির জামার কলার।

'তুমি জানলে কী করে?' গর্জন ছাড়ল লুমলি। 'ওরা কোথায়? এখানে হচ্ছেটা কী?'

টুকি ঝাঁকি দিয়ে লুমলির মুঠোর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিল

নিজেকে, সরিয়ে দিল ধাক্কা মেরে। আমি এবং টুকি একসঙ্গে তাকালাম মার্সিডিসের ভেতরে। ভেতরটা বেশ গরম। তবে বেশিক্ষণ এ উষ্ণতা থাকবে না। লাল রঙের ফুয়েল লাইট জানান দিচ্ছে জ্বালানির আয়ু প্রায় শেষ। বিশাল গাড়িটি শূন্য। প্যাসেঞ্জার সীটের মেঝেতে পড়ে আছে বাচ্চাদের বার্বি ডল। সীটের ওপর কুঁচকে আছে বাচ্চাদের একটি স্কি পার্কা।

টুকি হাত দিয়ে মুখ ঢাকল...তারপর আর ও নেই। লুমলি ধাক্কা মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। তার মুখটা ফ্যাকাসে, চোখে বুনো দৃষ্টি। সে গাড়ির মধ্যে উঁকি দিল, খামচে ধরল পার্কা।

'ফ্রান্সির কোট?' ফিসফিস করল লুমলি, তারপর গুঙিয়ে উঠল আহত জন্তুর মত: 'ফ্রান্সির কোট!' পাঁই করে ঘুরল, সামনে মেলে ধরল কোটটি। তাকাল আমার দিকে, ফাঁকা এবং অবিশ্বাসের চাউনি চোখে। 'কোট ছাড়া ওর বাইরে যাবার প্রশ্নই নেই, মি. বুথ। কেন...কেন... ও তো ঠাণ্ডায় জমেই মরে যাবে।'

'মি. লুমলি–'

অন্ধের মত আমাকে পাশ কাটাল সে, হাতে এখনও পার্কা, চিৎকার করছে: 'ফ্রান্সি? জেনি! তোমরা কোথায়? কোথায় তোমরা আ–আ–?'

টুকিকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুললাম মাটি থেকে।

'তুমি ঠিক আছ–'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' বলল সে। 'ওকে ধরো।'

আমরা যত দ্রুত সম্ভব লুমলির পেছন পেছন ছুটলাম। তবে কোথাও কোথাও কোমর সমান ডুবে থাকা নরম তুষারের বাধা পেরিয়ে কাজটা করা সহজ হলো না। হঠাৎ থেমে গেল লুমলি। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

'মি. লুমলি–' বলতে গেল টুকি, একটা হাত রাখল লোকটার কাঁধে।

'এই পথে,' বাধা দিল লুমলি। 'ওরা এই রাস্তা দিয়ে গেছে। দেখুন!'

আমরা দেখলাম। ঢালের মত একটা জায়গায় চলে এসেছি

আমরা। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে হু-হু করে বয়ে চলেছে বাতাস। দু'জোড়া পায়ের ছাপ লক্ষ করলাম মাটিতে। একটি বড়, অপরটি ছোট। বরফে মাত্র ঢেকে যেতে শুরু করেছে চিহ্নগুলো। আর পাঁচ মিনিট পরে এলে পায়ের ছাপগুলো দেখতেই পেতাম না।

মাথা নিচু করে হাঁটা দিল লুমলি। টুকি তার পিঠের কাছটা খামচে ধরল, 'না! না! লুমলি!'

ঘুরল লুমলি, বুনো দৃষ্টিটা আবার ফিরে এসেছে চোখে। মুঠো পাকাল সে। তবে নামিয়ে নিল ঘুসি...টুকির চেহারায় এমন কিছু ফুটে উঠেছিল, আঘাত হানতে সাহস পায়নি। আমার দিকে তাকাল লুমলি তারপর আবার চাইল টুকির দিকে।

'ও জমে বরফ হয়ে যাবে,' বোকা বোকা গলায় বলল সে। 'আপনারা বুঝতে পারছেন না? ও জ্যাকেট পরে যায়নি। ওর বয়স মাত্র সাত বছর-'

'ওরা যে কোনও জায়গায় যেতে পারে,' বলল টুকি। 'পায়ের ছাপ দেখে ওদের খোঁজ করতে পারবেন না। ছাপগুলো ঢেকে দেবে বরফের চাদর।'

'তা হলে কী করব?' চেঁচাল লুমলি, কণ্ঠ উঁচু এবং মৃগীরোগীর মত। 'আমরা পুলিশে খবর দিতে দিতে ওরা ঠাণ্ডায় মরে যাবে! ফ্রান্সি এবং আমার বউ!'

'এতক্ষণে ঠাণ্ডায় হয়তো জমেও গেছে,' বলল টুকি। লুমলির চোখে চোখ রাখল। 'কিংবা তারচেয়েও খারাপ কিছু হয়তো ঘটেছে।'

'মানে?' ফিসফিস করল লুমলি। 'যা বলার সরাসরি বলুন! বলুন বলছি!'

'মি. লুমলি,' বলল টুকি, 'লটে ভয়ঙ্কর কিছু জিনিস আছে-'

চূড়ান্ত কথাটা বললাম আমি, কোনওদিন কল্পনাও করিনি এসব কথা বলতে হবে। 'ভ্যাম্পায়ার, মি. লুমলি। জেরুসালেম'স লটে অসংখ্য ভ্যাম্পায়ার বাস করে। কথাটা হজম করতে হয়তো আপনার কষ্ট হবে-'

লুমলি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল যেন আমি সবুজ

মানুষ হয়ে গেছি। 'পাগল,' ফিসফিস করল সে। 'আপনারা আসলে পাগল হয়ে গেছেন।' ঘুরল সে, মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে হাহাকার করে উঠল, 'ফ্রান্সি! জেনি!' বরফে আবার হোঁচট খেতে খেতে এগোল সে। তার ফেন্সি কোটের মুড়ি ছুঁয়েছে বরফ।

টুকির দিকে তাকালাম আমি, 'এখন কী করব?'

'ওর পিছু নাও,' বলল টুকি। তুষারে মাখামাখি হয়ে গেছে চুল। সত্যি সত্যি পাগলের মত লাগছে। 'ওকে এখানে এভাবে একা ফেলে রেখে আমরা চলে যেতে পারি না, বুথ। যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

'না,' বললাম আমি। 'মোটেই উচিত হবে না।'

আমরা বরফে কদম ফেলে লুমলির পেছন পেছন এগোতে লাগলাম। কিন্তু লুমলির গতি আমাদের চেয়ে ক্ষিপ্রতর। ক্রমে আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সে। অবশ্য ওর বয়স কম, গায়ে শক্তি বেশি, কাজেই ছুটতেও পারে দ্রুত। বরফের মধ্যে ষাঁড়ের মত ছুটছে। আমার বাতের ব্যথাটা হঠাৎ চাগিয়ে উঠল ভয়ানক। পায়ের দিকে তাকিয়ে মিনতি করলাম মনে মনে: 'আরেকটু, আর অল্প একটু। চলতে থাকো, কদম ফেলে চলতে থাকো...'

সরাসরি টুকির গায়ে ধাক্কা খেলাম মাটির দিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে। বরফের মধ্যে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। মাথাটা ঝুলে আছে সামনে, দু'হাতে চেপে ধরেছে বুক।

'টুকি,' বললাম আমি, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি,' বুক থেকে হাত নামাল টুকি। 'চলো, বুথ। লোকটা পরিশ্রান্ত হয়ে একসময় থামবে। তখন ওকে মজা বোঝাব।'

একটা ঢালের মাথায় উঠে এলাম আমরা। ঢালের নীচে দেখতে পেলাম লুমলিকে। মরিয়া হয়ে পায়ের ছাপ খুঁজছে। বেচারা! পায়ের ছাপ খুঁজে পাবার কোনই চান্স নেই। ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছাপ খুঁজছে, বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে। কোনও ছাপ থাকলেও তিন মিনিটেই তা মুছে যাবে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায়।

মাথা তুলল লুমলি, রাতের আঁধার চিরে ভেসে এল ওর আর্তনাদ, 'ফ্রান্সি! জেনি! কোথায় তোমরা?' তার গলায় হাহাকার, আকুতি এবং

আতঙ্ক। জবাবে শুধু হুঙ্কার ছাড়ল বাতাস। যেন হো-হো করে হাসছে লোকটার দুর্দশায়।

'লুমলি!' বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল টুকি। 'শুনুন, আপনি ভ্যাম্পায়ার কিংবা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন না তো ঠিক আছে। কিন্তু খামোকাই ওদেরকে খুঁজছেন। আমরা–'

এমন সময় সাড়া দিল একজন, ভেসে এল একটা কণ্ঠ, যেন টুংটাং শব্দে বাজল রুপোর ঘণ্টা, আমার কলজের মধ্যে কেউ ঠেসে ধরল এক মুঠো বরফ।

'জেরী...জেরী, তুমি?'

শব্দের উৎসের দিকে পাঁই করে ঘুরল লুমলি। এমন সময় সে এল, কতগুলো গাছের আড়াল থেকে, ছায়ার মাঝ থেকে বেরুল ভূতের মত। দেখেই বোঝা যায় শহুরে রমণী। এমন সুন্দরী নারী জীবনে দেখিনি আমি। মনটা উচাটন হয়ে উঠল তার কাছে যাওয়ার জন্য, ইচ্ছে করল গিয়ে বলি তাকে সুস্থ শরীরে দেখতে পেয়ে কত খুশি হয়েছি। মহিলার পরনে সবুজ, ভারী পুলওভারের মত একটা পোশাক। শহুরে মানুষরা বলে পনচো। তার সারা শরীরের চারপাশে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ওটা, তার রেশমী কালো চুল হু হু হাওয়ায় উড়ছে, যেন দীঘির জল।

বোধহয় মহিলার দিকে এক কদম এগিয়ে ছিলাম আমি, কারণ কাঁধে টুকির হাতের স্পর্শ পেলাম, শক্ত এবং উষ্ণ। বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমি?–আমার মন ভীষণ টানছিল মহিলার কাছে যেতে। সবুজ পনচো তার শরীরের পাশে বাতাসে উড়ছে, তাঁকে এত সুন্দর লাগছিল দেখতে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এমন অভিজাত এবং রমণীয়, যেন ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের কবিতার কোনও অনিন্দ্য সুন্দরী। 'জেনি!' কাতরে উঠল লুমলি। 'জেনি!' বরফে হোঁচট খেতে খেতে মহিলার উদ্দেশে পা বাড়াল সে, দু'হাত সামনে প্রসারিত।

'না!' চেঁচাল টুকি। 'না, লুমলি!'

লুমলি তাকাল না পর্যন্ত...তবে মহিলা তাকাল। আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইল এবং মুচকি হাসল। মহিলার প্রতি আমার আকর্ষণ এবং উন্মাদনার আগুনে যেন বরফ জল ঢেলে দিল কেউ, তীব্র ভয়ে কেঁপে

উঠলাম আমি। এতদূর থেকেও তার দুই চোখে লাল আভা দেখতে পেলাম পরিষ্কার। নেকড়ের চাউনিও এর চেয়ে কম ভীতিকর। যখন হাসিটা চওড়া হলো তার, দুই ঠোঁটের কোনা দিয়ে বেরিয়ে এল দু'টি লম্বা, সরু দাঁত। ও যে মানুষ নয় তা দিব্যি বুঝতে পারছি। ও মরে গিয়েছিল। যেভাবেই হোক কুৎসিত এই ঝড়ের রাতে আবার ফিরে পেয়েছে জীবন।

টুকি পিশাচীর দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পিছু হঠল সে...আবার সেই ভয়াবহ হাসিটা হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমরা মহিলার কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে দু'জনেরই।

'ওকে থামাও!' ফিসফিস করলাম আমি। 'ওকে থামানো যাবে না?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুথ।' গম্ভীর গলা টুকির।

লুমলি মহিলার সামনে চলে এল। ওকেও লাগছে একটা ভূতের মত। সারা শরীরে বরফ। মহিলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লুমলি... এবং গলা চিরে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত আর্তনাদ। গোঁ-গোঁ করে চিৎকার করছে লুমলি, ওই চিৎকারের কথা জীবনেও ভুলব না আমি, স্বপ্নে সারাজীবন তাড়া করে ফিরবে। দুঃস্বপ্ন দেখা শিশুর মত চিৎকার করে চলেছে লুমলি। ও মহিলার সামনে থেকে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু লম্বা, নগ্ন, বরফ সাদা এক জোড়া হাত দিয়ে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল পিশাচী ওকে, টেনে নিল নিজের কাছে। ঝট করে মাথাটা সামনে বাড়িয়ে দিল সে, মুখটা নামিয়ে আনল লুমলির ঘাড়ে–'বুথ!' কর্কশ গলায় বলল টুকি। 'জলদি ভাগো।'

ছুটলাম আমরা। প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুরের মত। হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ওভাবেই ছুটেছি আমরা। আপনারা তো আর ওই রাতে ওখানে ছিলেন না তা হলে বুঝতে পারতেন ভয় কাকে বলে। আমরা দৌড়াতে গিয়ে বার কয়েক আছাড় খেলাম রাস্তায়, সিধে হয়ে আবার দে ছুট। বারবার পেছন ফিরে দেখলাম মহিলা আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে কিনা, হাসছে সেই ভয়াল হাসি, আমাদেরকে লক্ষ করছে সেই

ভয়ঙ্কর লাল চোখ দিয়ে।

ছুটতে ছুটতে আমাদের গাড়ির কাছে চলে এলাম। টুকি উল্টে পড়ে গেল, হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বুক।

'টুকি!' ভয়ে দিশেহারা হয়ে চেঁচালাম আমি। 'কী–'

'টিকার,' বলল টুকি। 'গত পাঁচ বছর ধরে খুব ভোগাচ্ছে বুকের অসুখটা। আমাকে একটু শটগান সীটে বসিয়ে দাও, বুথ। তারপর এখান থেকে জলদি কাটো।'

আমি টুকির বগলের নীচে একটা হাত সেঁধিয়ে দিলাম, তারপর টেনে তুললাম মাটি থেকে। ওকে গাড়ির সীটে বসিয়ে দিতে রীতিমত কসরত করতে হলো। চোখ বুজে মাথাটা আসনে হেলান দিয়ে রাখল টুকি। ওর গায়ের ত্বক মোমের মত, হলদেটে।

আমি এক ছুটে গাড়ির হুডের কাছে এসেছি, অল্পের জন্য বাড়ি খেলাম না ছোট মেয়েটির সঙ্গে। ড্রাইভারের সীটের পাশের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা, গায়ে হলদে একটা ড্রেস ছাড়া কিছু নেই।

'মিস্টার,' ভোরের কুয়াশার মত মিষ্টি এবং পরিষ্কার গলায় ডাকল সে। 'আমার মাকে একটু খুঁজে দেবেন? মা চলে গেছে। আমি ঠাণ্ডায় জমে গেলাম–'

'সোনা,' বললাম আমি, 'তুমি বরং গাড়িতে গিয়ে বসো। তোমার মা–'

আমার মুখের কথা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় মূর্ছা যাবার দশা হলো। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ বরফে তার পায়ের কোনও ছাপ নেই।

এমন সময় আমার দিকে তাকাল সে, লুমলির মেয়ে ফ্রান্সি। বড়জোর বছর সাতেক হবে বয়স। কিন্তু ওর বয়স অনন্তকাল ধরে, এই রাতের বেলা সাত বছরেই থেমে থাকবে। তার ছোট্ট মুখখানা ভূতুড়ে সাদা, চোখের মণি লাল। চোয়ালের নীচে পিনের ডগার মত দুটো ছোট্ট ফুটো, ফুটো দিয়ে তীক্ষ্ণ, ধারাল সাদা দাঁতের আভাস দেখা যাচ্ছে।

আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসল সে। 'আমাকে কোলে নাও, মিস্টার,' নরম গলা তার। 'তোমাকে একটা চুমু দেব। তারপর তুমি আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।'

আমি ওকে চুমু খেতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। আমি সামনে এগোলাম, দু'হাত বাড়ানো। মেয়েটি হাঁ করেছে মুখ, দেখতে পেলাম গোলাপি ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একজোড়া শ্বদন্ত। তার চিবুক গড়িয়ে কী যেন পড়ল, চকচকে, রুপোলি। গায়ের সব ক'টা রোম খাড়া হয়ে গেল জিনিসটা কী বুঝতে পেরে। ওর গাল বেয়ে লোল পড়ছে!

ছোট হাত দুটো দিয়ে সে আমার ঘাড় জড়িয়ে ধরল। আমি ভাবছিলামঃ আশা করি ব্যাপারটা খুব যন্ত্রণাদায়ক হবে না। এমন সময় গাড়ির মধ্যে থেকে কালো একটা জিনিস উড়ে এসে দড়াম করে বাড়ি খেল মেয়েটির বুকে। ধোঁয়ার অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলাম, এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল কী যেন একটা, মেয়েটা হিসহিস করতে করতে পিছিয়ে গেল। ক্রোধ, ঘৃণা এবং যন্ত্রণার মুখোশে পরিণত হলো মুখটা। বিকৃত দেখাল। পাশ ফিরল সে এবং তারপর...তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এক সেকেণ্ড আগেও সে এখানে ছিল, পরের সেকেণ্ডে নেই হয়ে গেল! দমকা একটা বাতাস আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে হাঁ-হাঁ করতে করতে ছুটে গেল মাঠের দিকে।

'বুথ!' ফিসফিস করল টুকি, 'জলদি গাড়িতে উঠে এসো!'

আমি গাড়িতে উঠলাম। তবে অর আগে ছোট্ট মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দেয়া টুকির কালো রঙের বাইবেলটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে ভুললাম না।

এ ঘটনার পরে বেশ অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। আমার বয়স আরেকটু বেড়েছে। হার্ব টুকল্যাণ্ডার মারা গেছে বছর দুই হলো। ঘুমের মধ্যে শান্তিময় মৃত্যু ঘটেছে তার। বারটি এখনও আছে। ওয়াটারভিল থেকে এক লোক এসে ওটা কিনে নিয়েছে। ওরা দু'জন। স্বামী-স্ত্রী। বেশ ভাল মানুষ। বার-এর চেহারা সুরৎ বদলায়নি, রেখেছে আগের

মতই। তবে ওখানে আর তেমন যাওয়া হয় না আমার। টুকির মৃত্যুর পরে সবকিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

সালেম'স লটের অবস্থা আগের মতই আছে। শেরিফ পরদিন ওখানে গিয়ে লুমলির গাড়িটি উদ্ধার করেছে। ওটাতে গ্যাস ছিল না, ব্যাটারির চার্জও ফুরিয়েছে। কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমি কিংবা টুকি কেউই মুখ খুলিনি। বলেই বা কী লাভ হত? ওই শহরে এখনও মাঝে মাঝে দু'একজন হিচ-হাইকার অদৃশ্য হয়ে যায়। রাস্তায় পড়ে পাওয়া যায় হতভাগ্যের প্যাকস্যাক কিংবা বৃষ্টি অথবা তুষারে ভিজে ঢোল হওয়া কোনও পেপারব্যাক। তবে মানুষটির সন্ধান কখনও মেলে না।

সেই ভয়ঙ্কর রাতের স্মৃতি এখনও দুঃস্বপ্নে তাড়া করে ফেরে আমাকে। তবে মহিলার চেয়ে মেয়েটিকেই স্বপ্নে দেখি বেশি। দেখি দু'হাত বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে, কোলে চড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাকে কোলে নিলে সে আমাকে চুমু খাবে।

ছুটিছাটায় মেইনের দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে আসতে পারেন আপনি। এদিকের নিসর্গ বেশ মনোহর। টুকি'র বার-এ যাত্রা বিরতি দিতে পারেন গলা ভেজানোর জন্য। জায়গাটা সুন্দর। বার-এর নামটাও ওরা বদলায়নি। তো ড্রিংক খেয়ে, আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো সোজা উত্তর অভিমুখে যাত্রা করবেন। ভুলেও জেরুসালেম'স লট-এর রাস্তায় যাবেন না।

বিশেষ করে রাতের বেলা।

ওখানে ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। আমার ধারণা সে এখনও তার শুভরাত্রির চুম্বন দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

মূল: স্টিফেন কিং

রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

***